সাহিত্য পত্রিকা

এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ

ফাল্গুন-আষাঢ়, ১৪১৫-১৬ / জুলাই-ডিসেম্বর, ২০০৯

সম্পাদক

ড. রিটা আশরাফ

এশিয়ান ইউনিভার্সিটি প্রেস

সম্পাদক

ড. রিটা আশরাফ

সম্পাদনা পরিষদ

মুহাম্মদ মতিউর রহমান

এস. এম. গাজিউর রহমান

ড. সৈয়দা মোতাহেরা বানু

খন্দকার আবদুল মোমেন

ড. রিটা আশরাফ

প্রকাশক

এশিয়ান ইউনিভার্সিটি প্রেস

এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ

বাড়ী ১৪, সড়ক ২৮, সেক্টর ৭, উত্তরা মডেল টাউন, ঢাকা-১২৩০।

ফোন ঃ ৮৯৫০৭৩২-৩৫; ৮৯১৬১১৬, ৮৯১২৩৬৬, ৮৯২২৯৯২-১১২ ফ্যাক্স ঃ ৮৯৫৮৬০৩

মোবাইল-০১৫৫৬৩৪২৭৭০, ০১৯১১৩২৮৯০২

প্রচ্ছদ

ফরিদী নুমান

মুদ্রক

মেভিস প্রিন্টার্স

১৪৫, আরামবাগ, ঢাকা

মূল্য-পঞ্চাশ টাকা/ টঝ৳-৫

বিঃ দ্রঃ সাহিত্য পত্রিকায় প্রকাশিত লেখার মতামত লেখকের নিজস্ব।

ঝযধযরঃঃড় চধঃৎরশধ, ধ নর-ধহহঁধষ ষরঃবৎধৎু সধমধুরহব ড়ভ অংরধহ টহরাবৎংরঃু ড়ভ
ইধহমষধফবংয, বফরঃবফ নু উৎ. জরঃধ অংযৎধভ ধহফ ঢ়ঁনষরংযবফ নু অংরধহ টহরাবৎংরঃু
চৎবংং, ঐড়ঁংব-১৪, জড়ধফ-২৮, ঝবপঃড়ৎ-৭, টঃঃধৎধ গড়ফবষ ঞড়হি, উযধশধ-১২৩০.
চযড়হব: ৮৯৫০৭৩২-৩৫; ৮৯১৬১১৬, ৮৯১২৩৬৬, ৮৯২২৯৯২-১১২ ঋধী: ৮৯৫৮৬০৩
গড়নরষব-০১৫৫৬৩৪২৭৭০, ০১৯১১৩২৮৯০২
উ-সধরষ : ংযধযরঃঃড়ঢ়ধঃৎরশধ@ধঁন-নফ.ড়ৎম
ডবনংরঃব: িি.ধঁন-নফ.ড়ৎম/ংযধযরঃঃড়ঢ়ধঃৎরশধ./যঃসষ

প্রধান উপদেষ্টা ও পৃষ্ঠপোষক

প্রফেসর ড. আবুল হাসান মুহাম্মদ সাদেক

উপদেষ্টা পরিষদ

কবীর চৌধুরী

ড. আলাউদ্দিন আল আজাদ

ড. আশরাফ সিদ্দিকী

আল মাহমুদ

ড. বিশ্বজিৎ ঘোষ

শুভেচ্ছা বাণী

আমাদের মন, মনন ও মানসিকতা বিকশিত হয় সাহিত্যে। সাধারণতভাবে আমরা যা দেখি, সে দেখা সব দেখা নয়। আমরা সাধারণ দৃষ্টিতে যা দেখি কবি-সাহিত্যকগণ তা দেখেন অন্যভাবে, অন্য দৃষ্টি দিয়ে। তাঁরা গভীরে চলে যান। বিজ্ঞ ডুবরীর মতো মুক্তো কুঁড়িয়ে তাঁরা মালা গাঁথেন, আর জগতসভায় তা সুন্দরভাবে পরিবেশন করেন সৃজনীর মাধ্যমে। সাহিত্যের মাধ্যমে। এভাবে তাঁরা তুলে ধরেন সমকালীন সমাজের জীবন, সংস্কৃতি, ধ্যান-ধারণা ও দর্শনকে। এ হিসেবে সাহিত্য সমকালীন মানব সমাজের মুখপত্র হিসেবেও কাজ করে। সাহিত্য পত্রিকা মানুষকে নিয়ে যায় যুগ থেকে যুগান্তরে আর প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে। হয়ে থাকে শত সহস্রাব্দের সেতু বন্ধন।
সাহিত্য সৃষ্টিতে সাহিত্য পত্রিকার অবদান অপরিসীম। সাহিত্য পত্রিকার কাজ হলো অংকুরিত ফুলকে প্রস্ফূটিত করে মালা গাঁথা, আর সুপ্ত সম্ভাবনাকে ফুটিয়ে তোলা।

বাংলা আমাদের মায়ের ভাষা। আমরা বাংলাকে ভালবাসি, যেমন ভালবাসি মাকে। কাজেই এ বিশ্ববিদ্যালয়ের শুভলগ্ন থেকেই এখানে আছে বাংলা বিভাগ। সাহিত্য পত্রিকার স্বপ্নও তখন থেকেই। আজ তা বাস্তবে রূপ নিতে যাচ্ছে দেখে কতো ভাল লাগছে তা বুঝাতে পারবো না। ড. রিটা আশরাফ ও তাঁর সহযোগীগণকে অশেষ ধন্যবাদ। আশা করি এর মাধ্যমে সৃষ্টি হবে অনেক সৃজনশীল কবি-সাহিত্যিক। যে ফুলটি আজ অংকুরিত হলো, আশা করি তার রেনু থাকবে অমর হয়ে, আর কবরে বসে এ সুগন্ধিতে হবো মুগ্ধ অনাগত কালে। এবং সুভাসিত ও আলোকিত হবে আমার দেশ ও জাতি।

ড. আবুল হাসান মুহাম্মদ সাদেক
ভাইস-চ্যান্সেলর
এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ।

শুভেচ্ছা বাণী

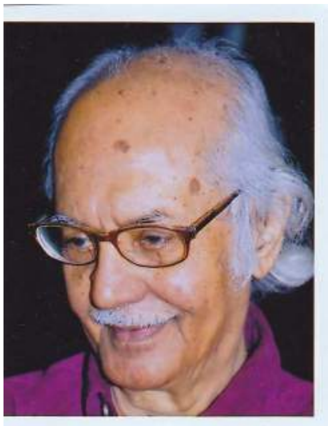

আমার জানামতে কোন বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এ পর্যন্ত সাহিত্য বিষয়ক কোন মুখপত্র নিয়মিত প্রকাশিত হয় নি। অথচ এমন উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে একটি সাহিত্য বিষয়ক মুখপত্র নিয়মিত প্রকাশ হওয়া বাঞ্ছনীয় বলে আমি মনে করি। একটি দেশের সাহিত্য যত সমৃদ্ধ হবে, সে দেশের ইতিহাসও তত সমৃদ্ধ হবে। একটি উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষার পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের ভেতর থেকে সাহিত্য প্রতিভা বের করে আনতে সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশ করা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রমেরই একটি অংশ বলে আমি মনে করি। এমন লক্ষ্য নিয়ে এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত ও গর্বিত। আরও গর্বিত এই জেনে যে, বাংলাদেশের বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের মাঝে একমাত্র এখানেই রয়েছে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উপর অনার্স মাস্টার্সসহ পূর্ণাঙ্গ কোর্স। গত একযুগ ধরে নিয়মিতভাবে সম্পন্ন হচ্ছে এসব কোর্স।

বিশ্বে একমাত্র আমরাই ভাষার জন্য যুদ্ধ করেছি। আমাদের প্রিয় সে বাংলা ভাষার দিবস আজ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। এটি আমাদের বড়ই গর্বের বিষয়।

এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ বাংলাভাষা ও সাহিত্য নিয়ে কাজ করছে — এ জন্যে তাদেরকে আমি স্বাগত জানাই। তাদের এ মহতী উদ্যোগ—সাহিত্য পত্রিকারও দীর্ঘায়ু কামনা করছি।

(কবীর চৌধুরী)

সম্পাদকীয়

অবশেষে মঙ্গলগ্রহে পৌঁছুলাম আমরা। গ্রীষ্মের মাটিফাটা রোদ, বর্ষার বুকভাঙ্গা স্রোত, শরতের শিউলির সুবাস, হেমন্তের নবান্নের গন্ধ, শীতের বরফশীতল দুর্বোধ্যতা এবং বসন্তের মন উদাস করা হাওয়ায় ভর করে আমরা সত্যি মঙ্গলগ্রহে পৌঁছুলাম।

"এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ"এর সাহিত্য বিষয়ক মুখপত্র "সাহিত্য পত্রিকা"টির প্রথম সংখ্যা প্রকাশের সাথে সাথে মঙ্গলগ্রহে পৌঁছুবার মতো আনন্দই অনুভব করছি আমি। এ আনন্দের সবটুকু বলে কিংবা লিখে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। আমি মনে করি, মানুষ মাত্রই কমবেশি প্রতিভা নিয়ে জন্মায়। প্রাথমিক অবস্থায় সে প্রতিভার প্রকাশ কিংবা বিকাশের সামর্থ এবং পথ সবার থাকে না। কাজেই সে প্রতিভাকে প্রকাশ্যে বের করে আনার জন্য উদ্যোগ নিতে হয় কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে।

সাহিত্য একটি সৃষ্টিশীল এবং সৃজনশীল মাধ্যম। যে মাধ্যমে ভর করে দেশ-কাল-সমাজ-সভ্যতা বয়ে চলে যুগ-যুগান্তরে। নতুন নতুন প্রজন্মকে জানিয়ে দেয় তার পূর্ব প্রজন্মের পরিচিতি। একজন সাহিত্যিক সেদিক থেকে সমাজের বিবেক। আর এই বিবেককে যথোপযুক্তভাবে লালন করা সমাজেরই দায়িত্ব।

পত্রিকাটি প্রকাশের প্রস্তুতিলগ্নেই একজন বলেছিলেন "লেখা পাবো কোথায়?" এশিয়ান ইউনিভার্সিটির পনের হাজারেরও অধিক শিক্ষার্থীর কারো ভেতর কোন লেখক সত্বা নেই, এটা আমি ভাবতেই পারিনি। তাই মনে মনে হেসেছিলাম শুধু। আমি যখন লেখা আহবান করলাম তখন আমি বিস্মিত! এই জন্য যে, শুধু শিক্ষার্থী নয়, এখানকার সম্মানিত শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারীরাও স্বতঃস্ফুর্ত অংশগ্রহণ করেছে তাদের সুপ্ত প্রতিভাকে উন্মোচন করে। আমি পুলকিত! তাঁদের প্রতিভা প্রকাশের আগ্রহ দেখে। আমি গর্বিত! এই জন্য যে, একজন লেখক কখনো তৈরি করা সম্ভব নয়। কিন্তু লেখক সত্ত্বাকে বের করে আনা সম্ভব। সেই কাজটি আমি করতে পেরেছি। আমি আশা রাখছি, পত্রিকাটির পরবর্তী সংখ্যাগুলোতে এশিয়ান ইউনিভার্সিটির ভেতর ঘুমিয়ে থাকা আরো অনেকেরই সাহিত্য প্রতিভার উম্মোচন ঘটবে এখানে এবং একমাত্র একটি সাহিত্য পত্রিকার মাধ্যমেই এই কাজটি করা সম্ভব।

পত্রিকাটির প্রতি সংখ্যায় আমরা কয়েকজন খ্যাতনামা অতিথি লেখকের লেখা প্রকাশের পরিকল্পনা করেছি। এই জন্য যে, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ লেখকগণ তাদের লেখার পাশাপাশি খ্যাতনামা লেখকগণের লেখা পড়ে নিজেদের লেখার ভুল ত্রুটিগুলো সংশোধন করতে পারবে।

বলা প্রয়োজন, আমি মনে করি একজন সাহিত্যিকের রচিত সাহিত্য কখনো বাম কিংবা ডান রাজনীতি বা মানসিকতায় সম্পৃক্ত নয়। পাঠকবৃন্দও সকল লেখাকে সেভাবেই গ্রহণ করবেন। এই পত্রিকা সবার। সব মানসিকতা সম্পন্নদের জন্য উন্মুক্ত। এটি সাহিত্য পত্রিকা। নিটোল সাহিত্য পত্রিকা।

একটি বিশেষ প্রত্যয় নিয়ে আজ যে যাত্রা শুরু হলো এশিয়ান ইউনিভার্সিটির সাহিত্য পত্রিকাটির, সেই প্রত্যয়ের ধারাবাহিকতায় পত্রিকাটি প্রতি ছয়মাস পরপর প্রকাশের পরিকল্পনা রয়েছে আমাদের। প্রতি সংখ্যাতেই গদ্যসাহিত্য ও পদ্যসাহিত্য দু'টি বিভাগ থেকে দু'জনকে পুরস্কৃত করারও প্রতিশ্রুতি রইল। বিশেষভাবে বলতে চাই, যেসব লেখকের লেখা এ সংখ্যায় প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি তাদের লেখা পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশের প্রতিশ্রুতি রইল।

পত্রিকাটি প্রকাশ করতে গিয়ে অনেকেরই আন্তরিক সহযোগিতা আমি পেয়েছি। তাদের সকলকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ। তবে অনেকের মধ্যে একজনের নাম না বললেই নয়, বাংলা বিভাগের ছাত্র মোঃ জহিরুল ইসলাম জুয়েল। শ্রম দিয়ে ঘাম দিয়ে যে আমাকে সহযোগিতা করেছে এবং পত্রিকাটি প্রকাশ করার ব্যাপারে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে।

সবশেষে বলতে চাই, পত্রিকাটির প্রতিটি সংকলন নির্ভুলভাবে উপস্থাপন করার প্রাণান্তকর চেষ্টা করা হয়েছে। তারপরও ভুলভ্রান্তির উর্ধে আমরা নই। ভুলভ্রান্তিসহ পত্রিকার পরবর্তী সংখ্যার জন্য প্রয়োজনীয় উপদেশ এবং মতামত আমাদের দপ্তরে পাঠাবার জন্য সকল পাঠকের কাছে বিনীত অনুরোধ রইল।

ড. রিটা আশরাফ
সম্পাদক
সাহিত্য পত্রিকা
এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ।

প্রথম সংখ্যার অতিথি লেখক

ড. আশরাফ সিদ্দিকী

ড. আলাউদ্দিন আল আজাদ

সেলিনা হোসেন

ড. তপন বাগচী

প্রত্যয় জসীম

নূরহাসনা লতিফ

সূচিপত্র

প্রবন্ধ

ড. আশ্‌রাফ সিদ্দিকী ❖ বাংলার মুখ ♦
প্রফেসর মতিউর রহমান ❖ পাঠাগারের গুরুত্ব ♦
ড. তপন বাগচী ❖ মোতাহার হোসেনের নজরুল চর্চা ♦
ড. মুহাম্মদ মহসিন উদ্দীন ❖ মুরগী ও ডিমের বিস্ময়কর রহস্য
প্রফেসর এস এম গাজীউর রহমান ❖ ক্লাসিসিজম বনাম রোমান্টিসিজম ♦
ড. সৈয়দা মোতাহেরা বানু ❖ বিশ শতকের প্রথম চার দশকের বাংলা শিশু সাহিত্য ♦
শাহাদত হোসেন ❖ লেখক ও সমাজ ♦
আবদুল মোমেন ❖ গৃহ পরিবেশ ঃ শিশুর ভবিষ্যৎ নির্মাণের অনিবার্য অনুসঙ্গ ♦

কবিতা

আলাউদ্দিন আল আজাদ ❖ লাইট হাউজ ♦
আবুল হাসান মুহাম্মদ সাদেক ❖ হে ফেব্রুয়ারি তুমি ফাল্গুন হও ♦
প্রত্যয় জসীম ❖ সালাম আমাদের ভাষামানব ♦
সামসুজ্জোহা ❖ স্বরূপা চন্দ্রমুখী ♦
জাহানারা খান ❖ মায়ের কথা ♦
মাসুমা আকতার ❖ শূন্যতা সংজ্ঞাহীন ♦
মোঃ ফিরোজ হোসেন রিতু ❖ অনির্বাণ (সনেট) ♦
মুহাম্মদ জুবায়ের রহমান চৌধুরী ❖ ধরণী ♦
মোঃ জিয়ারুল ইসলাম ❖ সংশোধন ♦
মোঃ নজরুল ইসলাম ❖ কর্মের বেদনা ♦
মোঃ কামরুজ্জামান ❖ তুমি যদি চাইতে ♦
শাহিদা খানম ❖ হে মহামানব ♦
এম নাজেম উদ্দীন ছানবী ❖ প্রত্যয়ী হবো ♦
এস এম ত্বাহা ❖ ভালবাসার কবিতা ♦
জামসেদ ওয়াজেদ ❖ ভালো আছি অসহ্য রকম ♦
রবিউল আলম ফিরোজ ❖ সুচিত্রাকে সন্ত্রাসী প্রেমিক ♦
প্রেমাংশু শংকর মালো ❖ জীবনের চেতনা ♦
মোঃ শহীদ দাদ খান ❖ জামাই আদরে পাটশাক ♦
আসমা আক্তার ❖ তোমায় নিয়ে ♦
মোঃ আবুল কালাম আজাদ ❖ মা ♦
মোঃ জহিরুল ইসলাম জুয়েল ❖ শ্রাবণের খরস্রোতা নদী ♦
মোহাম্মদ আবুল কালাম ❖ দু'টি বোন ♦
মোঃ শহিদুল ইসলাম রনি ❖ ভোলা মন ♦
শ্যামল কুমার বিশ্বাস ❖ কবে পাবো তোমাকে? ♦

গল্প

সেলিনা হোসেন ❖ ধারণা ♦
নূরহাসনা লতিফ ❖ রোদেলা জীবন ♦
জে আলী ❖ আগন্তুক ♦
রিটা আশরাফ ❖ তূর্যকে লেখা মায়ের চিঠি ♦
মোঃ শহিদুল ইসলাম ❖ কনসার্ট ♦
হিরন্ময় হিমাংশু ❖ সেদিন আকাশ মেঘলা ছিল ♦
মোঃ আকতারুজ্জামান ❖ হে যুবক সাবধান ♦

অনুবাদ গল্প

কাজী মহাম্মদ আশরাফ ❖ আমার পা ♦

নাটক

এম সাইদুর রহমান তসলিম ❖ হগো পগো ♦

সাক্ষাৎকার

ভাষা সৈনিক আবদুল গফুর ❖ সাক্ষাৎকার গ্রহণ-নাসীমুল বারী ♦

ফিচার

এম আর সুমন ❖ আমাদের এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ ♦

গ্রন্থালোচনা ♦

প্রবন্ধ

ডঃ আশ্‌রাফ সিদ্দিকী*

বাংলার মুখ

জীবনানন্দ কবি লিখেছেন ঃ "বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি/ তাই আমি পৃথিবীর রূপ খুঁজিতে যাই না আর/... যেইখানে একদিন শঙ্খমালা চন্দ্রমালা মানিকমালার/ কাঁকন বাজিত, আহা কোনদিন বাজিবে আর..." বিগত ৯ ও ১০ই মে 'বাংলাদেশ বাউল সংগীত সংরক্ষণ ও উন্নয়ন পরিষদ' মানিকগঞ্জের সৌজন্যে শহরের সরকারী উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে (আউটার ষ্টেডিয়ামে) বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল মহতী বাউল সম্মেলন-২০০১। যাতে দেশের সব অঞ্চল থেকেই প্রখ্যাত বাউল শিল্পীগণ এসেছিলেন। এ উপলক্ষ্যে দেশের পাঁচজন গুণী বাউল শিল্পীকে সম্বর্ধনা এবং স্বর্ণপদক (২০০১) দেয়া হয় এবং জানানো হ'ল যা এখন থেকে প্রতি বৎসরই চলতে থাকবে।

এই মহতী সম্মেলন উপলক্ষ্যে মানিকগঞ্জ পৌরসভার জনপ্রিয় সভাপতি (যিনি দেশের সব পৌরফোরাম কমিটির সরকার মনোনীত সভাপতি) এবং এই মহতী বাউল সংগীত সংরক্ষণ ও উন্নয়ন পরিষদেরও সভাপতি জনাব মোঃ রমজান আলী প্রখ্যাত লোকসংগীত শিল্পী মমতাজ বেগমকে নিয়ে আমার ধানমণ্ডির বাড়িতে এসে বেশ পূর্বেই দু'বার আমন্ত্রণ জানিয়ে গেলেন। বললেন, যেতে হবেই। যত ব্যস্ততাই থাকুক না কেন।

যথারীতি ৯ই মে সকাল বেলাতেই রওনা হওয়া গেল। মানিকগঞ্জ শহরের প্রধান পথে পথে এই মেলা উপলক্ষ্যে সুদৃশ্য অভ্যর্থনা ফটক হয়েই আসবেন মাননীয় সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের,সাহিত্যিক জনাব রাহাত খান এবং অন্যান্য দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠানে। সার্বিক সহযোগিতায় আছেন প্রখ্যাত লোকগীতিশিল্পী মমতাজ বেগম এবং এডভোকেট এ টি এম শাহজাহান ও অন্যান্য জেলা প্রশাসনের কর্মীবৃন্দ।

পৌঁছা গেল সার্কিট হাউজে। দোতলার পূর্বকোণ থেকে ভেসে আসছে পল্লীগীতির সুললিত সুর। মমতাজ তার দলবল নিয়ে গানের রিহার্সেল করছেন। এই গুণী শিল্পীর জন্ম ১৯৭৬ সনে মানিকগঞ্জের জয়মন্ত গ্রামে। বাবা ছিলেন অঞ্চলেরই প্রখ্যাত লোকশিল্পী মধু বয়াতী। গান গাওয়া শুরু মাত্র আট বৎসর বয়সে বাবারই

* বিশিষ্ট গবেষক ও প্রাক্তন মহাপরিচালক, বাংলা একাডেমী।

উৎসাহে। এই ২০০১ পর্যন্ত তার ৬০০ এর বেশি ক্যাসেট বাজারে বের হয়েছে এবং গ্রাম বাংলার সব অঞ্চলেই তার নিয়মিত ডাক পড়ে। অনুষ্ঠানমালাও হচ্ছে। গাইছেন বেতার এবং টিভিতে বিচার, বাউল, বিচ্ছেদী এবং আঞ্চলিক পল্লীগীতি । আমন্ত্রিত হয়ে ভ্রমন করেছেন লন্ডন, অষ্ট্রেলিয়া, সিঙ্গাপুর, ভারত সহ আরো বিভিন্ন দেশ। বিশেষ করে মানিকগঞ্জ অঞ্চলের দীনভবানন্দ, কালুশাহ ফকির এদের গান তার প্রিয়। আমরা অনুরোধ জানাতেই দলবল নিয়ে বেশ কিছু জনপ্রিয় গান আমাদের শুনিয়ে দিলেন। শুধু তাই নয়, জনকণ্ঠে লিখি বলে এই পত্রিকায় শুভেচ্ছাও পাঠালেন।

মানিকগঞ্জে যতবারই এসেছি (ক'মাস পূর্বে সস্ত্রীক প্রখ্যাত কবি শামসুর রাহমানসহ বকজুড়ি গ্রামে একটি সম্বর্ধনায়ও এসেছিলাম এবং ইতিপূর্বেও কবি শামসুর রাহমানসহ) এদের আদর আপ্যায়নের তুলনা হয না। এবারও মানিকগঞ্জ ধলেশ্বরী নদীর বিরাট মৎস এবং দৈ-মিষ্টি-বিভিন্ন উপচারে অতিথিদের আপ্যায়নের কিছুমাত্র ক্রুটি হ'লনা।

বিকেল চারটায় অনুষ্ঠান স্থলে গিয়ে দেখি জনতার সমুদ্র। স্থানাভাবে বহুলোক দাঁড়িয়েও আছেন। কেউবা বসে বৃক্ষের উপরে। ষ্টেজে প্রায় অর্ধ-শতাধিক মহিলাসহ প্রখ্যাত বাউল শিল্পীদের মহাসমাবেশ। প্রথম দিনের অনুষ্ঠানে এই মহতী উদ্যোগকে অভিনন্দন জানিয়ে এই গ্রামের শিল্পপতি জনাব জাহিদ মালেক স্বপন, রমজান আলী, এ টি এন এর পরিচালক জনাব এনায়েতুর রহমান এবং অন্যান্য। এরপর সবারই অনুরোধক্রমে প্রথমেই মানিকগঞ্জের মানিককন্যা মমতাজের গান। দু'টি ভক্তি সংগীত গেয়ে সে শ্রোতাদের মুগ্ধ বিমুগ্ধ করে দিল। অন্যান্য বাউল শিল্পীবৃন্দের (মহিলাসহ) এরপরে বিচার ও বাউল গানের যে মধুছন্দ সুরের নদী বইলো – এই লেখায় তার বর্ণনা সম্ভব নয়। শ্রোতা দর্শকদের উৎফুল্ল অভিনন্দন, করতালি সে শুধু উপলব্ধি করার বিষয়। অর্থাৎ এ যেন হাজার বৎসরের সম্পদ। ভালোলাগা আর ভালোবাসার সম্পদ। এ গান চলুক–চলতে থাকুক–সারাদিন–সারারাত।

নদীমাতৃক এই বাংলাদেশে শতবর্ষ পূর্বেও বাউলসহ প্রায় ১৩২ প্রকারের লোকগীতি প্রচলিত ছিল। যার অনেকগুলিই আজ হারিয়ে গেছে যত্ন আর সংরক্ষণের অভাবে। এই গানগুলি ছিল ঃ জারীগান, সহেলার গান (সইপাতার গান), গাজনের গান, বেহুলার গান, মানিকপীরের গান, সত্যপীরের গান, খেমটা, গম্ভীরা, ভাওয়াইয়া, চট্কা, আলকাপ, ভাটিয়ালী, ঘাটু, রাখালী, বিচার, কবি, ধামালী,অষ্টক, বারমাসী, সাপুড়েদের গান, মানতের গান প্রভৃতি।

পাদ্রী উইলিয়াম কেরী, মার্শম্যান, স্যার জর্জ গ্রীয়ারসন প্রমুখ প্রাচ্য বিশারদগণ শ্রদ্ধার সঙ্গে এইসব গানের ঐতিহ্যের প্রশংসা রেখেছেন। পাদ্রী জি সি হর্ষণ এর ভাষায়

"এদেশের একান্ত নিরক্ষর লোকের মুখেও মনের যে অপূর্ব বাণী উচ্চারিত হতে শোনা যেতে পারে, পল্লীপথে হেঁটে যেতে এমন সূক্ষ কারুকার্য অবলোকন করা যেতে পারে যা যুগ-যুগান্তরের সাধনার ধন। যে গ্রাম্য শিল্পীর হস্তপাথর কেটে মহাকালের বুকে পদ্মপুস্প রেখে যেতে পারে- সে জাতি শ্রদ্ধার" (সিদ্দিকী, লোক সাহিত্য, প্রথম খণ্ড, ঢাকা, ১৯৯৫)

এইসব লোকগীতির গুরুত্ব সম্বন্ধে এই মানিকগঞ্জেরই সু-সন্তান, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রামতনু লাহিড়ী, অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র সেন বড়ই দুঃখ করে লিখেছিলেন ঃ উর্ধতন পর্যায়ে বিদেশী প্রভাবের পাণ্ডিত্যের দর্প, সংস্কারের বোঝা এবং নানারূপ আবর্জনা জমিয়া সমস্ত প্রশ্ন জটিল ও দুরুহ করিয়া তুলিয়াছে, কিন্তু নিম্নে শ্যামল শস্যপূর্ণ নিত্য সজীব তরু গুল্মময় সবুজ পল্লী-এখানেই বঙ্গলক্ষী তাহার ধনভাণ্ডার রাখিয়াছেন। এখানেই বঙ্গের চারুশিল্পী ... এখানেই নিরক্ষর কবির অপূর্ব পল্লীগীতি,বাউল ও বৈষ্ণবনৃত্য, এখানেই সহজিয়ার সুনির্মল অদ্বিতীয় প্রেমের আদর্শ ...যদি বাংলার এই পল্লীগীতিকা, পল্লীর শিল্পকলা চলিয়া যায় তবে বাংলার ভৌগলিক তত্ত্ব জানিয়া আমরা কি করিব? বাংলাদেশ'ত তাহা হইলে লুপ্ত হইল ... জগতের শিরায় বাংগালীর যে অসাধারণ দান ছিল তাহা লুপ্ত হইলে বাংলাদেশকে অন্য যে কোন নাম দাও, তাতে আপত্তি নাই, কিন্তু বাংলা-সোনার বাংলা নাম দিয়া সেই পবিত্র নামের অবমাননা করিও না ..(সেন, বৃহৎবঙ্গ, পৃঃ ৮৫৯ ; সিদ্দিকী, প্রাগুক্ত)।

ফিরে আসছিলাম-ভাবছিলাম-আমাদের বুদ্ধিজীবী সমাজ দলমত নির্বিশেষে আমাদের তরুণদের যদি শিকড়ের সন্ধান দিতেন তবে হয়তো বন্ধ হতো সন্ত্রাস-শিক্ষাঙ্গণগুলি হতো সংস্কৃতির মিলনক্ষেত্র। তখনো ভেসে আসছে মোহনীয় বাউলগীতির মূর্ছনা-যা মানুষকে মানুষের প্রতি ভালোবাসায়-বিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ করে-যে গান ছিল রবীন্দ্রনাথের প্রিয়-যার উপর গবেষণা করেছেন চেক পণ্ডিত দুসান জাবেতিল, শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের জর্জ এডওয়ার্ড, ডিমক এবং জাপানে প্রফেসর দত্ত। গবেষণা হচ্ছে ফরাসী দেশে এবং বিশ্বের বহু বিশ্ববিদ্যালয়ে -পশ্চিমবঙ্গে-বিশেষ করে বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে। এমন কি ডক্টরেট পর্যায়ে।
একটা তৃপ্ত মন নিয়ে সেদিন ঢাকায় ফিরে এলাম। এখনো কানে বাজছে-

নানান বরণ গাভীরে ভাই একই বরণ দুধ।
জগৎ ভরমিয়া দেখলাম একই মায়ের পুত।

প্রফেসর মুহম্মদ মতিউর রহমান*

পাঠাগারের গুরুত্ব

সাধারণ অর্থে পাঠাগার বলতে বোঝায়, অসংখ্য বই-পুস্তক,পত্র-পত্রিকা, জ্ঞানকোষ ইত্যাদির আগার। যেখানে এগুলো সযত্নে সংরক্ষিত হয় এবং তা পাঠের উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকে সেটাকে আমরা বলি পাঠাগার। বই জ্ঞানের ভান্ডার। বই পড়েই আমরা জ্ঞান আহরণ করি। যে যত বই পড়ে সে তত জ্ঞানী বা আলেম। তাই শুধু পরীক্ষায় পাশের জন্য নয়, অধিক জ্ঞান আহরণের জন্য বই পড়া একান্ত প্রয়োজন। এজন্য সবদেশে এবং সব যুগেই জ্ঞানী-গুণীরা সর্বদা বই পড়ার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। আগেকার দিনে বিদ্যাশিক্ষা লাভ বা জ্ঞান চর্চার জন্য অনেক কষ্ট স্বীকার করে দূর-দুরান্তে জ্ঞানী ব্যক্তিদের সান্নিধ্যে গিয়ে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, এমনকি বছরের পর বছর ধরে নিরলসভাবে জ্ঞান চর্চায় নিয়োজিত হতে হতো। এখন বিদ্যার্জন বা জ্ঞান লাভের জন্য অতটা কষ্টের প্রয়োজন হয় না। যত্রতত্র বিদ্যায়তন গড়ে উঠেছে। পাড়ায়, মহল্লায় নানা ধরনের পাঠাগার বা লাইব্রেরী গড়ে উঠেছে। এখন যেটার অভাব তা হলো ভাল শিক্ষায়তন, ভাল ভাল বই-পুস্তক, সমৃদ্ধ পাঠাগার এবং জ্ঞান চর্চার উপযুক্ত পরিবেশ। বলা যেতে পারে, বর্তমানে ভাল শিক্ষায়তন, যোগ্য শিক্ষক, ভাল বই এবং জ্ঞান চর্চার উপযুক্ত পরিবেশ এ জিনিসগুলোরই অভাব রয়েছে।

শহরাঞ্চলে তো বটেই, প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলেও এখন অসংখ্য বিদ্যাপীঠ গড়ে উঠেছে। বর্তমানে দেশে প্রাইমারী থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত কোন ধরনের বিদ্যায়তনেরই তেমন অভাব নেই। শিক্ষার্থী এবং শিক্ষাদানকারীদের সংখ্যাও কম নয়। বিভিন্ন শিক্ষায়তনে এবং অন্যান্য স্থানেও কিছু কিছু পাঠাগার গড়ে উঠেছে। শিক্ষিতের হারও বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এ বৃদ্ধির হারও ক্রমাগত উর্ধ্বমুখী। কিন্তু প্রকৃত শিক্ষা এবং যে শিক্ষার দ্বারা জ্ঞানের প্রসার ঘটে, সমাজ আলোকিত হয়, বিদ্যার প্রতি মানুষের শ্রদ্ধার ভাব সৃষ্টি হয় তা তৈরী হচ্ছে না। শিক্ষাদানকারী শিক্ষকেরা অধিকাংশই তাদের মহৎ পেশার প্রতি সুবিচার করছেন না। আন্তরিকতার সাথে তারা শিক্ষাদানের সুমহান পেশায় আত্মনিয়োগ করছেন না। ফলে সমাজে তাদের মর্যাদা ও শ্রদ্ধা বহুলাংশে ভূলুণ্ঠিত। শিক্ষার্থী ও ডিগ্রীধারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

---

* বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ।

কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, তাদের অধিকাংশই জ্ঞানী হয়ে নয়, বরং নানারূপ অশিক্ষা, কুশিক্ষা ও বিরূপ পরিবেশের শিকার হয়ে অমানুষ হওয়ার দীক্ষা নিয়ে বেরিয়ে আসছে। শিক্ষা লাভের পর এরাই সরকারী, বেসরকারী সকল অফিস-আদালত, কোর্ট-কাছারী এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের দন্ডমুন্ডের কর্তা হয়ে বসেন। ফলে দুর্নীতি, অব্যবস্থা,অরাজকতা ইত্যাদিতে জাতির অগ্রগতি ও সম্ভাবনা নানাভাবে ব্যাহত হয়।

অনুরূপভাবে দেশে পাঠাগারের সংখ্যাও কম নয়। কিন্তু প্রকৃত আগ্রহী পাঠকের সংখ্যা কয়জন? জ্ঞানার্জনের জন্য যে নিরলস সাধনার প্রয়োজন তা এখন কোথায়? পাঠাগারে ভাল গ্রন্থের অভাব, পাঠের উপযুক্ত পরিবেশ ইত্যাদিরও অভাব রয়েছে। সেক্ষেত্রে সামগ্রিকভাবে জ্ঞানচর্চার উপযোগী পরিবেশ তৈরী না হলে ভাল পাঠক তৈরীও সম্ভব নয়। তাই এজন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন পাঠাগার আন্দোলনের, পাঠক তৈরীর এবং সামগ্রিকভাবে সমাজে জ্ঞানচর্চার প্রতি সকলের আগ্রহ সৃষ্টি করা।

লেখাপড়ার প্রধান উদ্দেশ্য তিন প্রকার। ১. ভাল মানুষ হওয়া ২. মানুষের মধ্যকার সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ সাধন ও ৩. নিজের জন্য, অন্যের জন্য সর্বোপরি সমাজের জন্য কল্যাণকর হওয়া। মূলত উপরোক্ত তিনটি উদ্দেশ্যই পরস্পর সম্পুরক।

আগেকার দিনে লেখাপড়া শিখে ভাল মানুষ হওয়ার উদ্দেশ্যে ছেলেমেয়েদেরকে বিদ্যালয়ে প্রেরণ করা হতো। ছেলেমেয়েদের অর্ন্তনিহিত প্রবণতা অনুযায়ী তাদের স্ব স্ব প্রতিভার বিকাশের চেষ্টা করা হতো। নীতি হিসাবে শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এখনো তাই আছে। কিন্তু বাস্তব অবস্থা ভিন্ন। এখন লেখাপড়া শিখে মানবিক গুণ সম্পন্ন কাংক্ষিত মানুষ তৈরী হচ্ছে না। শিক্ষার্থীরা স্ব স্ব প্রতিভা বিকাশের উপযুক্ত সুযোগ পাচ্ছে না। শিক্ষার উপযোগী পরিবেশ নেই। বিদ্যার্জনে বিদ্যার্থীদের মনোযোগ নেই। যেনতেন প্রকারে সার্টিফিকেট অর্জন বা ডিগ্রী লাভই আজকাল শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য হিসাবে গণ্য হয়ে থাকে। শিক্ষাদানকারীগণও তাদের মহান পেশার প্রতি সুবিচার করতে পারছেন না। শিক্ষাদান করা যেখানে শিক্ষকদের একমাত্র ধ্যান জ্ঞান হওয়া বাঞ্ছনীয়, সেখানে তারা নানা কর্মকাণ্ডে ও নিজেদের পেশা বহির্ভূত কাজে ব্যাপৃত থাকেন। শিক্ষার্থীদেরকে তারা উপযুক্ত শিক্ষাদানে যেমন ব্যর্থ হন তেমনি শিক্ষার প্রতি তাদেরকে গভীরভাবে উৎসাহী ও আগ্রহী করে তোলার ক্ষেত্রেও চরমভাবে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়ে থাকেন। সবকিছু মিলিয়েই শিক্ষার কাংক্ষিত সাধারণ মান খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না । এটা সমগ্র জাতির জন্য অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। তবে কিছু কিছু ব্যতিক্রম যে নেই তা নয়। ক্ষেত্র বিশেষে ভাল শিক্ষক

যেমন আছেন তেমনি আছে ভাল শিক্ষার্থীও। এটাকে ব্যতিক্রম হিসাবে চিহ্নিত করা যায়।

শিক্ষাঙ্গনে আজ রাজনীতি ,দলীয়প্রভাব, মিটিং, মিছিল, বোমাবাজি, চাঁদাবাজি, সিট দখল এমন কি নানা অশ্লীল কর্মকাণ্ড চলছে দেদারছে। শিক্ষার্থীরা তাদের জীবনের লক্ষ্য সম্পর্কে উদাসীন। "ছাত্র নং অধ্যয় নং তপঃ" ছাত্রদের এই মহান নীতিবাক্য আজ ধূল্যবলুণ্ঠিত। শিক্ষকেরা তাদের শিক্ষা, চরিত্র ও নৈতিক মনোবল দ্বারা শিক্ষার পরিবেশকে সমুন্নত করার কোন চেষ্টাই করছেন না। বরং তাদের অনেকেই যেন আজ এ বিধক্ষংশের করাল প্রবাহে গা ভাসিয়ে দিয়েছেন। এটা কোন দায়িত্বশীলতার পরিচয় বহন করে না। অবশ্য এ ক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম আছে। তা স্বীকার করতেই হবে।

পাঠাগারের অবস্থাও তাই। বই আছে কিন্তু ভাল বইয়ের রয়েছে অভাব। ভাল বইয়ের অভাব বলতে পাঠ্য বইয়ের অভাব বলছি না। প্রকৃত জ্ঞানার্জনের জন্য শুধু পাঠ্য বই নয়, তার বাইরেও নানা ধরনের বই পড়া প্রয়োজন। ভাল বইয়ের অভাব কথাটিও যথার্থ নয়। কারণ, অনেকেই ভাল বই লেখেন কিন্তু সেসব পাঠাগারে প্রবেশের সুযোগ পায় না। সেখানে যেসব বই স্থান পাচ্ছে সেসব পড়ে পাঠক প্রত্যাশিত জ্ঞান লাভ করতে পারছেনা। অর্থাৎ যে জ্ঞান মানুষের মনে মহৎ ইচ্ছার জন্ম দেয় যেমন, সৎ চিন্তা, সদাচার শিক্ষা, অর্থাৎ এক কথায় মানুষকে উন্নতত্ম ও মহৎ হবার শিক্ষা দেয় সে জ্ঞানের চর্চা অতিশয় বিরল। অতএব নিছক পাঠাগার নয়, আদর্শ পাঠাগার চাই। আদর্শ মানুষ গড়ার মত উপযুক্ত সমৃদ্ধ পাঠাগার চাই। বয়স নির্বিশেষে সকল মানুষকে পাঠাগারমুখী করার উদ্যোগ চাই। সকলকে যথার্থ জ্ঞানচর্চায় উদ্বুদ্ধ করে গড়ে তোলা চাই। এজন্য চাই কল্যাণকামী মানুষের উদ্যোগ। যা আমাদের সমাজকে ধক্ষংশের পথ থেকে মুক্তির পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

পৃথিবীতে জ্ঞানী ব্যক্তির অভাব নেই। তবে প্রকৃত জ্ঞানী ব্যক্তির নিদারুণ অভাব। জাহিলিয়াতের যুগেও জ্ঞানী লোকের অভাব ছিল না। সমাজে তখনো অনেক জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন। তৎকালীন আরব সমাজে আবু লাহাবকে সবচেয়ে জ্ঞানী মনে করা হতো। এজন্য তাঁকে "আবুল হাকাম" খেতাবে ভূষিত করা হয়। কিন্তু তিনি জ্ঞানী হলেও প্রকৃত জ্ঞান তাঁর আয়ত্বে ছিল না। তাই প্রকৃত জ্ঞানের অভাবে "আবুল হাকাম" (জ্ঞানীদের পিতা) "আবু জাহেলে" (অজ্ঞদের পিতা) পরিণত হয়। বস্তুগত জ্ঞানে (চৎধপঃরপধষ কহড়ষিবফমব) আবু লাহাব সর্বদাই সমৃদ্ধ ছিলেন। সে কারণেই তিনি "আবুল হাকাম" খেতাব পেয়েছিলেন। কিন্তু যে জ্ঞান হক-বাতিল বা সত্য-মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করে ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, কল্যাণ-অকল্যাণ

সম্পর্কে সম্যক ধারণা দেয় সে জ্ঞান তাঁর ছিল না। আর এজন্যই বস্তুগত জ্ঞান তাঁর কোন কাজে আসেনি। ফলে তাঁর দুনিয়া এবং আখিরাত উভয়ই বরবাদ হয়েছে। এভাবে বর্তমান জগতের বহু বরেণ্য জ্ঞানী ব্যক্তি যেমন, হেগেল, ডারউইন, ফ্রয়েড, কার্ল মার্কস, লেনিন, স্ট্যালিন, মাও-সে-তুঙ প্রমুখ অনেক জ্ঞানের অধিকারী হয়েও এবং মানব সভ্যতায় নানা যুগান্তকারী অবদান রাখা সত্বেও প্রকৃত জ্ঞানের সন্ধান না পাওয়ার কারণে তাঁদের জ্ঞানের দ্বারা মানব জাতির কোন কল্যাণ সাধিত হয়নি। বরং তাঁদের জ্ঞানের দ্বারা মানব জাতির সমূহ ক্ষতি ও বিপর্যয় সাধিত হয়েছে।

যুগে যুগে এ ধরনের জ্ঞানী ব্যক্তিদের কোন অভাব কখনো পরিলক্ষিত হয়নি। হযরত আদম(আঃ)-এর পুত্র কাবিল থেকে শুরু করে নমরুদ, ফিরাউন , কারুণ, আবু লাহাব এবং আধুনিক যুগের অনেক তথাকথিত খ্যাতনামা ব্যক্তিগণ সকলেই এ শ্রেণীর জ্ঞানী ব্যক্তি। জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে পৃথিবীর উত্থান-পতনে তাঁদের অনেকেরই বিশিষ্ট অবদান রয়েছে। দুর্ভাগ্যবশত তাঁদের অবদানে মানব সভ্যতা সমৃদ্ধ হয়নি। মানব জাতির কোন কল্যাণ সাধিত হয়নি। বরং মানব-সভ্যতা মসীলিপ্ত হয়েছে। মানব জাতির অকল্যাণ হয়েছে এবং বহু ক্ষেত্রে মানব জাতির ভাগ্য বিপর্যয় ঘটেছে।

প্রকৃতপক্ষে পূর্ণজ্ঞান (ডযড়ষব ঞ্ৎঁঃয) এবং যথার্থজ্ঞান (অনংড়ষঁঃব ঞ্ৎঁঃয) এর একমাত্র অধিকারী হলেন বিশ্ব জগতের মহান স্রষ্টা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন। যিনি অনন্ত, অসীম, সর্বোজ্ঞ, সর্বশক্তিমান, সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা, সকল কিছুর স্রষ্টা, মালিক ও প্রতিপালনকারী। মানুষ সৃষ্টির পর সে মহান স্রষ্টাই স্বয়ং মানুষকে জ্ঞানালোকে সমৃদ্ধ করেন এবং এ কারণেই সকল সৃষ্টির মধ্যে মানুষ শ্রেষ্ট সৃষ্টি বা'আশরাফুল মাখলুকাতে'র মর্যাদা লাভ করে। মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে ঃ 'আল্লামা আদামাল আসমা'আ কুল্লাহা"–অর্থাৎ 'আর তিনি আদমকে (আঃ) যাবতীয় নাম শিক্ষা দিলেন।' এখানে নাম একটি পরিচয় জ্ঞাপক শব্দ। কোন কিছুর পরিচয় জানার অর্থ সে সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান দান করা। আদমকে (আঃ) সৃষ্টির পর আল্লাহতায়ালা তাঁকে সকল জ্ঞান শিক্ষা দিলেন। আর এ জ্ঞানের পরীক্ষাতেই তিনি ফিরিশ্তাকুলকে পরাভূত করে সকল সৃষ্টির সেরা বা 'আশরাফুল মখলুকাতে'র মর্যাদা লাভ করেন।

আরবি 'এসেম' শব্দের আভিধানিক অর্থ নাম। 'এসেমে'র বহুবচন 'আসমা'। এর অর্থ নাম সমূহ। ফলে এখানে এর অর্থ দাঁড়ায় বস্তুজগতের সম্যক পরিচয় বা জ্ঞান দান করা। অতএব এ আয়াতের প্রকৃত অর্থ হলো ঃ "মহান স্রষ্টা আদম (আঃ) কে বস্তুজগতের পরিপূর্ণ পরিচয় বা জ্ঞান দান করেন।" যুগে যুগে বিভিন্ন দেশ ও জাতির মধ্যে প্রেরিত নবী-রাসুলগণও ওহীর মাধ্যমে এ সত্য জ্ঞান লাভ করেন এবং মানব

জাতির মধ্যে তা যথাযথভাবে প্রচার করেন। নবী-রাসুলগণ আল্লাহর প্রেরিত পুরুষ। আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রকৃত জ্ঞান ও পৃথিবীতে চলার পথের সঠিক হিদায়াত প্রদর্শন করাই তাঁদের কাজ। যুগে যুগে তাঁরা এ কাজটিই যথাযথভাবে আঞ্জাম দিয়ে গেছেন। অতএব সঠিক জ্ঞানের একমাত্র উৎস হলেন স্বয়ং আল্লাহতায়ালা এবং তা হাসিলের মাধ্যম হলেন নবী-রাসুলগণ ও ঐশী কিতাবসমূহ। এজন্যই পবিত্র কুরআনে নাযিলকৃত প্রথম আয়াতেই আল্লাহ বলেন, "ইকরা বিস্‌মে রাব্বিকাল্লাযি খালাক"–অর্থাৎ "পড়, তোমার প্রভূর নামে, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।"

কত সুন্দর যুক্তিপূর্ণ কথা। যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনিই তো আমাদের প্রকৃত মালিক, তাঁরই নামে পাঠ করা কর্তব্য বা তাঁর হুকুম ও নির্দেশ মত জীবন পরিচালনা করা ফরয। এর বিপরীত কাজ, কথা, চিন্তাভাবনা অযৌক্তিক ও ভ্রান্তিপূর্ণ। ভ্রান্তিপূর্ণ পথে শান্তি, কল্যাণ, সাফল্য অর্জন কখনো সম্ভব নয়। অতএব জ্ঞান লাভ করা যেমন আবশ্যক জীবনে শান্তি, কল্যাণ ও সাফল্য অর্জনের জন্য সঠিক জ্ঞান অর্জন করা তেমনি বা তারচেয়েও অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

জ্ঞান লাভের জন্য শিক্ষার প্রয়োজন। এ শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে আল্লাহর প্রেরিত আখেরী ও শ্রেষ্ঠতম রাসুল মহানবী (সঃ) নিজেকে মানব জাতির একজন মহান শিক্ষক হিসাবে পরিচয় দিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষেই তিনি ছিলেন মানব জাতির সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক। ঐশীজ্ঞানের শিক্ষায় তিনি মানব সভ্যতাকে সমুদ্ভাসিত করে গেছেন। সে শিক্ষা যেমন সার্বজনীন তেমনি তা সর্বকালীন। জ্ঞানচর্চা ও বিদ্যাশিক্ষায় তাঁর গুরুত্বপূর্ণ বহু সংখ্যক হাদীস রয়েছে। এখানে প্রসঙ্গত কতিপয় হাদীসের উল্লেখ করা যায়। একটি হাদীসে তিনি বলেন, "তলাবুল ইল্‌মে ফারিদান আলা কুল্লি মুসলিমিন"–অর্থাৎ প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর জন্য বিদ্যাশিক্ষা করা ফরয বা অবশ্য কর্তব্য। এর অর্থ দাঁড়ায়, বিদ্যাশিক্ষা ছাড়া প্রকৃত জ্ঞানার্জন সম্ভব নয়। এবং প্রকৃত জ্ঞান ব্যতিত মুসলিম হিসাবে জীবন-যাপন করাও কঠিন।

মহানবী (সাঃ) আরো বলেন, " জ্ঞানীর কলমের কালি শহীদের লহুর বা রক্তের চেয়েও পবিত্র।"

অন্য এক হাদীসে আছে, "আবেদের সারা রাত জেগে নফল ইবাদতের চেয়ে জ্ঞানীর একঘন্টা জ্ঞানের সাধনা অধিক উত্তম।"

মহানবী (সাঃ) এর জীবনে আরো দেখি, বদরের যুদ্ধে শিক্ষিত বন্দী কাফিরদের মুক্তিপণ হিসাবে তিনি দশজন অশিক্ষিত মুসলমানকে শিক্ষাদানের শর্ত আরোপ করেন। অর্থাৎ একজন শিক্ষিত কাফির বন্দী দশজন অশিক্ষিত মুসলমানকে শিক্ষিত করতে পারলেই তাকে মুক্তি দেয়া হতো।

পৃথিবীর যুদ্ধের ইতিহাসে বন্দীর মুক্তিপণ হিসাবে এ এক অভিনব শর্ত। এর দ্বারা জ্ঞানার্জন বা বিদ্যাশিক্ষার প্রতি ইসলাম কতটা গুরুত্ব দিয়েছে তা সম্যক উপলব্ধি করা যায়। আজ থেকে প্রায় দেড় হাজার বছর পূর্বে মহানবী (সাঃ) শিক্ষার উপর যে গুরুত্ব আরোপ করেছেন, আধুনিক সভ্যতাগর্বী মানুষ তা উপলব্ধি করেছে মাত্র অর্ধ শতাব্দী বছর পূর্বে। এ উপলব্ধির ফলেই বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে জাতিসংঘ তার ঞযব টহরাবৎংধষ উপিষধৎধঃরড়হ ঙভ ঐঁসধহ জরমযঃং- এ ঘোষণা করে ঃ "ঊাবৎু ঙহব ঐধং ঞযব জরমযঃ ঞড় ঊফঁপধঃরড়হ ঝযধষষ ইব ঋৎবব. অঃ খবধংঃ ওহ ঞযব ঊষবসবহঃধৎু ঝঃধমবং. ঊষবসবহঃধৎু ঊফঁপধঃরড়হ ঝযধষষ ইব ঈড়সঢ়ঁষংধৎু.

ইসলামে বিদ্যাশিক্ষা ও জ্ঞানার্জনের উপর গুরুত্ব দেয়ার ফলে প্রাথমিক যুগের মুসলমানরা শুধু নিজেদের এলাকাতেই নয়, তাঁরা যেখানেই গিয়েছেন সেখানেই সঙ্গে নিয়ে গেছেন মানব জাতির মহান হিদায়াত গ্রন্থ আল-কুরআন, আল-হাদীস ও অন্যান্য মূল্যবান গ্রন্থরাজি। সেখানে বিদ্যাশিক্ষার জন্য গড়ে তুলেছেন বিদ্যালয় ও জ্ঞানার্জনের জন্য স্থাপন করেছেন লাইব্রেরী বা পাঠাগার। স্পেনে মুসলমানেরা প্রায় সাত'শ বছর রাজত্ব করেন। এ সময় তারা সমগ্র স্পেনে যেমন বড় বড় মসজিদ গড়ে তোলেন তেমনি প্রতিষ্ঠা করেন জ্ঞান-বিজ্ঞানের শীর্ষ পীঠস্থান এবং বিশাল গ্রন্থাগার। তাতে সংগৃহিত হয়েছে লক্ষ লক্ষ মহামূল্যবান গ্রন্থ। তৎকালে অসভ্য-বর্বর ইউরোপ ধীরে ধীরে জ্ঞান-বিজ্ঞানের শীর্ষ দেশে উপনীত হবার মূলে তৎকালীন কর্ডোভায় মুসলমানদের নির্মিত শিক্ষায়তন ও গ্রন্থাগার সমূহই দায়ী। এসব গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত নানা বিষয়ে লেখা অসংখ্য গ্রন্থরাজি পাঠ করেই তারা প্রকৃত আলোর পথের সন্ধান পায়। ফলে ইউরোপীয় রেঁনেসা ও আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতা মুসলমানদের নিকট বিপুলভাবে ঋণী। তাতার যোদ্ধা চেঙ্গিস খাঁ বাগদাদ আক্রমণ করে সেখানকার ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে দেয়। বিদ্যায়তন ও গ্রন্থাগারসমূহ ধ্বংস করে। গ্রন্থাগারের গ্রন্থসমূহ অপ্রয়োজনীয় মনে করে বর্বর তাতার বাহিনী সেগুলো ফোরাত নদীতে ফেলে দেয়। ফলে ফোরাত নদীর প্রবাহ বন্ধ হয়ে যায়। অসংখ্য গ্রন্থে ভরাট হয়ে যায় নদী। সে গ্রন্থের উপর দিয়ে সবাই নির্বিঘ্নে নদী পার হয়। কী বিপুল সংখ্যক গ্রন্থ নদীতে নিক্ষেপ করা হয়েছিল, এ থেকে তা অনুমান করা যায়। অতএব মুসলিম জাতি একসময় জ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে, গ্রন্থ রচনার ক্ষেত্রে ও অধ্যয়নের ক্ষেত্রে কতটা উন্নত ছিল এ থেকে তা প্রমাণিত হয়।

ইউরোপ-আমেরিকা তখনো বর্বর যুগের অধিবাসী। জ্ঞান ও সভ্যতার আলো থেকে অনেক দূরে। তারা ক্রমান্বয়ে মুসলমানদের সংস্পর্শে এসেই সভ্যতার আলোকদীপ্তি লাভ করে। আধুনিক সভ্যতার যাত্রা শুরু হয় এখান থেকেই। অর্থাৎ বর্তমান বিশ্ব মুসলমানদের কাছেই জ্ঞান-বিজ্ঞানের দীক্ষা লাভ করে ধীরে ধীরে উন্নতির শিখরে আরোহন করেছে। দুর্ভাগ্যবশত কালক্রমে মুসলিম জাতি পাশ্চাত্য শক্তির কাছে

স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব বিসর্জন দিয়ে পরাধীন হয়ে পড়ে। পরাধীনতার যুগে ক্রমান্বয়ে মুসলিম জাতি হতদরিদ্র ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পশ্চাৎপদ হয়ে পড়ে। অন্যদিকে পাশ্চাত্য শক্তি মুসলমানদের রাজ্য, অর্থ, আধিপত্য হস্তগত করে এবং তাদের জ্ঞান ভাণ্ডার লুণ্ঠন করে ক্রমাগত উন্নতির দিকে অগ্রসর হতে থাকে। এ ভাবে এক সময় তারা সমগ্র বিশ্বে আধিপত্য বিস্তার করে এবং আধুনিক বিশ্ব-সভ্যতার উদ্গাতা হিসাবে তাদের কৃতিত্ব সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে।

দুর্ভাগ্যবশত আগে জ্ঞান-বিজ্ঞানের মশাল ছিল ঐশীজ্ঞানের অধিকারী মুসলমানদের করতলগত। আর এখন তা নাসারা মুশরিকদের হাতে। ফলে বিশ্বশান্তি, মানবতা এমনকি মানব সভ্যতাও আজ হুমকির সম্মুখীন। ঐশীজ্ঞান ছাড়া মানুষের মধ্যে শুভবোধ ও কল্যাণ চিন্তার উদ্ভব ঘটে না। বরং মানুষকে তা নিয়ে যায় ধব্বংসের দ্বারপ্রান্তে। আধুনিক যুগে এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ হলো বিশ্বের প্রধান পরাশক্তি আমেরিকার মহাশক্তিধর প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ ও তার সঙ্গী-সাথীরা মিলে আফগানিস্তান ও ইরাকের মতো দুটি প্রাচীন সভ্যতার মুসলিম দেশকে অকারণে বর্বরোচিতভাবে অকস্মাৎ ধ্বংসস্তুপে পরিণত করা। এজন্যই দার্শনিক কবি ডক্টর আল্লামা মুহাম্মদ ইকবাল ঐশীজ্ঞানহীন বস্তুতান্ত্রিক জ্ঞানকে এভাবে ব্যাখ্যা দিয়েছেন–

> জ্ঞান যদি হয় তোমার দেহের সমৃদ্ধির জন্য,
> তবে জ্ঞান হচ্ছে এক বিষধর সর্প
> জ্ঞান যদি হয় তোমার আত্মার মুক্তির জন্য নিবেদিত,
> তবে এ জ্ঞান হবে তোমার পরম বন্ধু, তোমার গর্ব।

ঐশীজ্ঞান মানুষের শান্তি, কল্যাণ ও মুক্তির জন্য। আর বস্তুগত জ্ঞান পার্থিব সমৃদ্ধি আনে ঠিকই কিন্তু পরিণামে তা ধ্বংস ডেকে আনে। কমিউনিস্ট দুনিয়া ও পাশ্চাত্য জগতের দিকে তাকালে এ সত্য প্রতিভাত হয়। এক সময় এ উভয় শিবিরের পারস্পরিক দ্বন্দ-সংঘর্ষ ও স্নায়ুযুদ্ধে সমগ্র বিশ্ব ছিল উৎকণ্ঠিত। বর্তমানে আমেরিকান একক পরাশক্তির দানবিক কড়াল গ্রাসে বিশ্বশান্তি চরমভাবে বিপর্যস্ত। বিশ্বে আধিপত্যবাদ বিস্তারের জন্য এবং অর্থনৈতিক শোষণের পথ নিষ্কণ্টক করার জন্য লক্ষ লক্ষ মানুষকে নির্বিচারে হত্যা, অগণিত জনপদ ধ্বংস ও মানব সভ্যতার প্রাচীনতম সব নিদর্শন ধূলিস্যাৎ করে দিতে জড়বাদী সভ্যতাগর্বী পাশ্চাত্য শক্তি এতটুকু কুণ্ঠাবোধ করেনি। অতএব প্রমাণ হচ্ছে, আল্লাহহীন জড়বাদী সভ্যতা পরিণামে মানব জাতির ধ্বংস ডেকে আনে। মানুষের কোন কল্যাণই তাদের দ্বারা সাধিত হয় না।

মানবতার মুক্তি, কল্যাণ ও শান্তির জন্য ঐশীজ্ঞানে বিশ্বাস স্থাপন অপরিহার্য্য। ঐশীজ্ঞানে বিশ্বাস ও তার ভিত্তিতে ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ পরিগঠনের মাধ্যমেই

মানবজাতির ইস্পিত কল্যাণ, শান্তি ও মুক্তি লাভ সম্ভব। ঐশীজ্ঞান বিস্তারের জন্য বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষায়তনের পরিবেশ পরিবর্তন করা যেমন আবশ্যক তেমনি শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মানসিকতা এবং তাদের জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের মধ্যেও পরিবর্তন আনা আবশ্যক। অনুরূপভাবে শুধু পাঠাগার স্থাপন করাই যথেষ্ট নয়। সেখানে চাই যথার্থ জ্ঞানের চর্চা, জ্ঞান চর্চার উপযুক্ত পরিবেশ, ভাল বই সংগ্রহ ও সংরক্ষণ এবং পাঠক সৃষ্টি। সমাজের কল্যাণকামী মানুষই পারেন এসবের ব্যবস্থা করতে।

এজন্য চাই যথার্থ সত্যোপলব্ধি, মানসিকতার পরিবর্তন, প্রবল আগ্রহ ও দৃঢ় প্রত্যয়। তার জন্য চাই ব্যাপক গণসচেতনতা ও আন্দোলন। শিক্ষাব্যবস্থা পরিবর্তনের আন্দোলন, গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন, ভাল বইয়ের আন্দোলন, জ্ঞানচর্চা, মননশীলতার বিকাশ, সুপ্ত প্রতিভার উন্মেষ এবং সর্বোপরি মহৎ ও প্রকৃত মানুষ হওয়ার আকাংক্ষাকে তীব্রতর করে তোলার আন্দোলন। এজন্য গণপাঠাগার প্রতিষ্ঠা ছাড়াও ঘরে ঘরে পারিবারিক পাঠাগার গড়ে তোলা প্রয়োজন। তরুণদেরকে বইমুখী করে তোলা প্রয়োজন। এবং এর মাধ্যমেই সমাজ থেকে সন্ত্রাস, দুর্নীতি, জুলুম, নিপীড়ন, অন্যায়, অবিচার ইত্যাদি দূরীভূত হবে। সুন্দর, সমৃদ্ধ ও শান্তিপূর্ণ সমাজ বিনির্মাণ সম্ভব হবে। আমাদের সকলের সে লালিত স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার জন্য আমাদের সকলকে সচেতন হতে হবে। ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। প্রয়োজনে আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। সে আন্দোলন বই পড়ার আন্দোলন, মানুষ গড়ার আন্দোলন, অন্ধকার থেকে আলোর পথে যাত্রার আন্দোলন এবং ধ্বংস থেকে জীবনের পথে অগ্রসর হওয়ার আন্দোলন।

তবে এজন্য অপরিহার্য্য শর্ত হলো, ঐশীজ্ঞানের আলোকে দীপ্ত জ্ঞানের সাধনা। যুগে যুগে একমাত্র এটাই সুনিশ্চিত করেছে শান্তি, সাম্য, কল্যাণ ও মানবতার মহান আদর্শের বিজয়কে।

ড. তপন বাগচী*

কাজী মোতাহার হোসেনের নজরুল চর্চা

জাতীয় অধ্যাপক ডক্টর কাজী মোতাহার হোসেন (১৮৯৭-১৯৮১) বিজ্ঞানচর্চা এবং শিক্ষাদানের পাশাপাশি ক্রীড়া ও সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রেও ব্যাপক অবদান রেখেছেন। বাংলাদেশে বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের অন্যতম পুরুষই শুধু নন, মুসলিম সাহিত্য সমাজের মুখপত্র 'শিখা' সম্পাদনার মাধ্যমেও তিনি জাতীয় গুরুদায়িত্ব পালন করেছেন। কাজী নজরুল ইসলামের সাহিত্য নিয়ে সমালোচনা-গবেষণায়ও রেখেছেন গুরুত্বপূর্ণ অবদান। বিজ্ঞানী ও দাবাড়ু কাজী মোতাহার হোসেনের নজরুলচর্চা বাংলাসাহিত্য-সমালোচনার ক্ষেত্রেও ভিন্ন মাত্রা প্রদান করেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান বিভাগ তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাঁর আবিষ্কৃত সূত্র সংখ্যাতত্ত্বে 'হোসেইন'স চেইন রুল' নামে সারা বিশ্বে পরিচিতি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতিমান অধ্যাপক ডক্টর কাজী মোতাহার হোসেন একসময় হয়ে ওঠেন বাংলাদেশের জাতীয় অধ্যাপক (১৯৭৫) আর অবিভক্ত ভারতের বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম হয়ে ওঠেন বাংলাদেশের জাতীয় কবি (১৯৭২)। বাংলাদেশের জাতীয় অধ্যাপকের দৃষ্টিতে জাতীয় কবির মূল্যায়ন নিঃসন্দেহে আমাদের কাছে আগ্রহের বিষয়। আমরা মনে রাখতে চাই যে, মূল্যায়ন-বিশ্লেষণের সময়ে কেউ-ই আমাদের জাতীয় কবি কিংবা জাতীয় অধ্যাপক উপাধিতে ভূষিত হননি। যোগ্য বন্ধুর হাতে যোগ্য বন্ধুর মূল্যায়ন দেখে আমরা তৃপ্ত হতে পারি।

ডক্টর কাজী মোতাহার হোসেন ছিলেন বাংলাদেশের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের (১৮৯৯-১৯৭৬) ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের অন্যতম। সমবয়সী এবং দীর্ঘদিনের অকৃত্রিম বন্ধু হিসেবে তিনি নজরুল ব্যক্তি-ও-সৃষ্টি জীবনের অনেক ঘটনার সঙ্গেও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন। কাজী মোতাহার হোসেনের সঙ্গে কাজী নজরুল ইসলামের পরিচয়ের প্রথমপর্ব এবং তাঁদের ক্রমঘনিষ্ঠতার প্রেক্ষাপট

*ডক্টর তপন বাগচী (জ. ১৯৬৮) : কবি সাংবাদিক ও প্রাবন্ধিক। প্রাক্তন গবেষক, বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট।

সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায় মোতাহার-রচনাবলীর অন্যতম সম্পাদক, বিশিষ্ট গবেষক, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রফেসর ডক্টর আবুল আহসান চৌধুরীর (জ. ১৯৫৩) অনুসন্ধানী-গবেষণা থেকে। তিনি লিখেছেন—

১৯২০-২১ সালে কলকাতায় তাঁদের প্রথম পরিচয়। ১৯২৫ সালে নিখিল ভারত দাবা প্রতিযোগিতার মাধ্যমে দু'জনের সম্পর্ক নিবিড় হয়। এই সম্পর্ক পুরোপুরি বন্ধুত্বে পাকা হলো ১৯২৭ সালে। এ-বছরের গোড়ার দিকে নজরুল ঢাকা এলেন 'মুসলিম সাহিত্য-সমাজের' 'বার্ষিক অধিবেশনের বিশেষ অতিথি হিসেবে' যোগদানের জন্য। পরের বছর (১৯২৮) এই একই উদ্দেশ্যে আবার তিনি ঢাকায় এলেন। এইবার তিনি একনাগাড়ে প্রায় আড়াই মাস মোতাহার হোসেনের বাসায় ছিলেন। নজরুলের সাহচর্য ও সান্নিধ্য মোতাহারমানসে গভীর ছাপ ফেলেছিল—প্রসারিত হয়েছিল তাঁর শিল্প ও জীবনের অভিজ্ঞতা ও ধারণা।

সকলেই জানি যে, বিজ্ঞানচর্চা, দাবাখেলা ও অধ্যাপনার পাশাপাশি কাজী মোতাহার হোসেন নিয়মিত সাহিত্যচর্চা করেছেন। কাজী আবদুল ওদুদ (১৮৯৪-১৯৭০), আবুল হুসেন (১৮৯৬-১৯৩৮), আবুল ফজল (১৯০৩-১৯৮৩) প্রমুখের সঙ্গে তিনি ঢাকায় 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' (১৯২৬) গঠন করে বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনে নেতৃত্ব প্রদান করেন। এই সংগঠনের মুখপত্র 'শিখা'র (১৯২৭) দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংখ্যা সম্পাদনা করেন কাজী মোতাহার হোসেন। মুসলিম সাহিত্য সমাজের অধিবেশনে অংশ নিতে ঢাকায় আগমনের সূত্রেই নজরুলের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব প্রগাঢ় হয়। কাজী মোতাহার হোসেন শুধু নজরুলের ব্যক্তিগত বন্ধুই ছিলেন না, নজরুল-সাহিত্য মূল্যায়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। ১৯৫৫ সালে তিনি রচনা করেন 'নজরুল-কাব্য পরিচিতি' নামের ১৮৬ পৃষ্ঠার একটি গ্রন্থ। এটি বাংলাদেশে নজরুল-বিষয়ক দ্বিতীয় গ্রন্থ। নজরুল সাহিত্য নিয়ে প্রথম গ্রন্থ রচনা করেন অধ্যাপক শিবপ্রসন্ন লাহিড়ী। নজরুল চর্চার প্রথম উদ্‌যোগ হিসেবে শিবপ্রসন্ন লাহিড়ীর গ্রন্থ বাংলা সমালোচনা-সাহিত্যে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। কিন্তু কাজী মোতাহার হোসেনের গ্রন্থটিও নজরুলের প্রতিভা-পরিমাপে প্রভূত সহায়ক।

কাজী মোতাহার হোসেন 'নজরুল-কাব্য পরিচিতি' গ্রন্থের মাধ্যমে নজরুলকে ভিন্নমাত্রায় উপস্থাপন করেছেন। আপাত দৃষ্টিতে বন্ধুকৃত্য মনে করা গেলেও এটি যে একটি নির্মোহ সমালোচনা গ্রন্থ, তা পাঠ করার পরে অনুধাবন করা যায়। বন্ধুরা যেখানে বন্ধুর সৃষ্টি সম্পর্কে প্রশংসা রচনা করতে এগিয়ে আসে না, নিজের উচ্চতা কমে যাওয়ার আশঙ্কায়, সেখানে কাজী মোতাহার হোসেন গ্রন্থরচনা করে কেবল বন্ধুর প্রতি দায়িত্ব পালনই করেননি, সাহিত্যের প্রতি তাঁর দায়িত্বশীলতারও প্রমাণ

রাখলেন। তিনি যে কেবল বিজ্ঞানী নন, সাহিত্যিক এবং বিশেষত সমালোচক– এই গ্রন্থ তারও প্রমাণ বহন করে। এই গ্রন্থটি যে সকল কারণে গুরুত্বপূর্ণ, তা হলো–

১. গ্রন্থটি বাংলাদেশের একজন বিজ্ঞানীর লেখা
২. গ্রন্থটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপকের লেখা
৩. গ্রন্থটি নজরুলের সমকালীন একজন সাহিত্যিকের লেখা
৪. গ্রন্থটি ঢাকার মুসলিম সাহিত্য সমাজের একজন পুরোধা ব্যক্তির লেখা
৫. গ্রন্থটি নজরুলের একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধুর লেখা
৬. গ্রন্থটি নজরুলের জীবদ্দশায় রচিত

কাজী মোতাহার হোসেনের গ্রন্থটি যখন প্রকাশিত হয় তখন নজরুল বাক্‌হারা। নজরুলের সৃষ্টি তখন থেমে আছে। চিকিৎসার চেষ্টা চলছে দেশে বিদেশে। সেই সময় ঢাকার বন্ধু কাজী মোতাহার হোসেন রচনা করেছেন নজরুলের কবিতার সমালোচনাগ্রন্থ। নজরুলের প্রায় প্রতিটি কাব্যে উল্লেখযোগ্য কবিতার বিশ্লেষণ করে তিনি নজরুলের কবিত্বশক্তির শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের চেষ্টা করেছেন। প্রাতিষ্ঠানিক মননশীল এই কাজটি সম্পন্ন করেছেন লেখক তাঁর সূক্ষ্ম রসবোধের সাহায্যে। কাজী মোতাহার হোসেন কেবল সাহিত্যিক নন, সাহিত্যবোদ্ধা এবং বিদগ্ধ সমালোচক হিসেবেও নন্দিত হয়েছেন এ গ্রন্থের মাধ্যমে।

এই গ্রন্থের বাইরেও রয়েছে নজরুল-বিষয়ক আরও কয়েকটি রচনা। এসকল রচনায় নজরুলের কবিতা ও গানের মূল্যায়ন এবং ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণের মাধ্যমে তিনি নজরুল মানস উন্মোচনের চেষ্টা করেছেন। নজরুলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতাই কেবল নয়, নিজের জীবনে নজরুলের প্রভাবকেও তিনি স্বীকার করেছেন। মুসলিম সাহিত্য-সমাজের সূত্রেই তাঁর সঙ্গে যে ঘনিষ্ঠতা, তার উল্লেখ করে তিনি লিখেছেন—

এই সুযোগে নজরুল ইসলামের সঙ্গে আমার কিছুটা অন্তরঙ্গ পরিচয় ঘটে। এর ফলে কাব্য, সঙ্গীত প্রভৃতির উৎস মুখেরও কিছুটা অনুভূতি জন্মে। তাতে হয়ত সাহিত্য ক্ষেত্রে আমার লেখায় কিছু সজীবতা এসে থাকবে। আমার জীবনে আন্তরিকতার অভাব বোধহয় কোনদিনই ছিল না, নজরুলেরও তাই। এ-কারণে নজরুলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার দিনগুলো আমার সাহিত্যিক জীবনের অমূল্য সঞ্চয়। দৃষ্টিতে তীক্ষ্ণতা (বৈজ্ঞানিক হিসাবে) আগে থেকেই ছিল, কিন্তু নজরুলের সংস্পর্শে এসে হয়ত মানুষকে আরও নিকট করে, আপন বলে ভাবতে শিখেছি। এই দুর্লভ মানবীয় অনুভূতি যদি সত্যিই কিছুটা এসে থাকে, তবে তার ষোল আনা না হলেও অন্তত বারো আনাই যে নজরুলের প্রভাবে হয়েছে, একথা অকুণ্ঠভাবে স্বীকার করবো।

কাজী মোতাহার হোসেনের 'নজরুল কাব্য-পরিচিতি' গ্রন্থের বাইরে বিভিন্ন আঙ্গিকের ১৪টি রচনা রয়েছে। বিভিন্ন উপলক্ষে তাঁর রচিত নজরুল-সম্পর্কিত পাঁচটি প্রবন্ধ, পাঁচটি বেতার-কথিকা, দু'টি গ্রন্থালোচনা ও দু'টি সাক্ষাৎকার পাওয়া যায়। সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়েছিল আরো কয়েকটি, কিন্তু নজরুল সম্পর্কিত তথ্য আছে আবুল আহসান চৌধুরী ও সৈয়দ ইমদাদুল হকের নেয়া সাক্ষাৎকার দু'টিতে। এই ১৪টি রচনা ছাড়াও তাঁর 'আমার সাহিত্যিক জীবনের অভিজ্ঞতা' এবং 'মরহুমা ফজিলাতুন্নেসার সঙ্গে আমার পরিচয়' শীর্ষক প্রবন্ধ দু'টিতে নজরুল সম্পর্কে কিছু তথ্য রয়েছে। 'আমার সাহিত্যিক জীবনের অভিজ্ঞতা' প্রবন্ধে তাঁর সাহিত্যজীবনে নজরুলের প্রভাব বিধৃত হয়েছে। মরহুমা ফজিলতুন্নেসার সঙ্গে আমার পরিচয় প্রবন্ধেও ফজিলত-নজরুলের পরিচয়ের উল্লেখ রয়েছে। তবে নজরুল মুখ্য নয় বলে ওই প্রবন্ধ দু'টিকে নজরুলচর্চার স্মারক মনে করার সুযোগ নেই।

'কাজী মোতাহার হোসেন রচনাবলী প্রথম খণ্ডে' স্থান-পাওয়া 'নজরুল-কাব্যে ইসলামী ভাবধারা' এবং 'নজরুলের বিদ্রোহী কবিতা' প্রবন্ধ দু'টি তাঁর গুরুত্বপূর্ণ রচনা। নজরুল-কাব্যের ইসলামী ভাবধারা যে ধর্মীয় প্রতিক্রিয়াশীলতা নয়, তা কাজী মোতাহার হোসেনের মতো প্রগতিশীল সমালোচকের কলমেই শুদ্ধ রূপে বিশ্লেষিত হতে পারে। নজরুলের কবিতা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি দেখিয়েছেন ইসলামের সংস্কৃতি ও ভাবদর্শন নিয়ে চমৎকার কবিতা লেখা যায়। নজরুলই যে ইসলামী ভাবধারা প্রচারে যথার্থ কবি, সে কথাই বলা হয়েছে। 'বিদ্রোহী' কবিতা নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা তাঁর কাব্য সমালোচনার শক্তিমত্তার পরিচয় বহন করে। সংখ্যাতত্ত্বের অধ্যাপকও যে কতটা কাব্যজ্ঞান ধারণ করেন, প্রবন্ধটি তার প্রমাণ বহন করছে। তিনি যে সেকালের একজন বড় কাব্য সমালোচক তাতে আর কারো দ্বিধা নেই।

'স্মৃতিপটে নজরুল' প্রবন্ধটি নজরুল একাডেমী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৬৯ সালে। ব্যক্তিগত স্মৃতির আয়নায় বিম্বিত অন্য এক নজরুলকে এখানে খুঁজে পাওয়া যায়। নজরুল-জীবনীর অনেক তথ্য এই প্রবন্ধে লুকিয়ে আছে। সৈয়দ আলী আশরাফ সম্পাদিত 'নজরুল জীবনে প্রেমের এক অধ্যায়' গ্রন্থে ব্যবহৃত নজরুলের চিঠিপত্র নেয়া হয়েছিল কাজী মোতাহার হোসেনের সংগ্রহ থেকে– এই স্মৃতিকথা পড়ে আমরা তা জানতে পারি। নজরুল সম্পর্কে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি খুঁজে পাওয়া যায়। স্মৃতিচারণার সময় ও ক্ষেত্র ভিন্ন হলেও স্মৃতির কেন্দ্র যেহেতু এক নজরুল, তাই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হওয়াটাই স্বাভাবিক। তবু একথা বলা যায় যে, 'নজরুলের কবিতা ও গানের মূল্যায়ন এবং ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণের

মাধ্যমে তিনি নজরুল মানস উন্মোচনের চেষ্টা করেছেন। নজরুলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতাই কেবল নয়, নিজের জীবনে নজরুলের প্রভাবকেও তিনি স্বীকার করেছেন। সমকালীন প্রতিভার প্রভাবকে স্বীকার করে কাজী মোতাহার যেমন নজরুলকে মহান করে তুলেছেন, তেমনি নিজের উদারতার পরিচয়ও গোপন রাখেননি।

কাজী মোতাহার হোসেন ‘ঘধুৎঁষ ওংষধস : এ্যব ঝরহমবৎ ধহফ ডৎরঃবৎ ড়ভ ঝড়হমঝ্ঞ নামে একটি ইংরেজি প্রবন্ধ রচনা করেন। এই দীর্ঘ ইংরেজি প্রবন্ধটি নজরুলের প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগের প্রকাশ। ‘নজরুলের জীবন ও কাব্য’ প্রবন্ধটি ১৯৫০ সালে ‘দিলরুবা’ পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়। পরে এটি ‘কাজী মোতাহার হোসেন রচনাবলী প্রথম খণ্ডে’ স্থান পায়। এই প্রবন্ধে তাঁর নতুন কোনও চিন্তা যুক্ত না হলেও নজরুল সাহিত্য প্রচারের ক্ষেত্রে এর ভূমিকাকে অস্বীকার করা যায় না। কাজী মোতাহার হোসেন রচিত পাঁচটি বেতার-কথিকা প্রচারিত হয়েছিল তৎকালীন রেডিও পাকিস্তানে। ‘গীতিকার নজরুল ইসলাম’, ‘নজরুল-জীবনকথা’, ‘মানুষের কবি নজরুল’, ‘নজরুল-কাব্যে ইসলামী রূপ’ এবং ‘নজরুলকে যেমন দেখেছি’—এই পাঁচটি কথিকায় কাজী মোতাহার হোসেন সহজ ভাষায় নজরুলের যে মূল্যায়ন করেছেন, তা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। ‘নজরুল-জীবনকথা’ কথিকার পাণ্ডুলিপিতে কোনও শিরোনাম ছিল না। বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক ও মোতাহার-রচনাবলীর সম্পাদক আবদুল হক এর শিরোনাম প্রদান করেন। এই কথিকায় পরিমিত তথ্যে নজরুলের পরিচয় প্রকাশিত হয়েছে। নজরুলের মৃত্যুর পরে নজরুল জন্মবার্ষিকী সংকলনে তিনি একটি সাক্ষাৎকার প্রদান করেন। সৈয়দ ইমদাদুল হকের নেয়া সাক্ষাৎকারটি ‘সু-সমাজ’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। তিনি নজরুল সাহিত্য রুশ ও ইংরেজি ভাষায় অনুবাদের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। নজরুলের কবিতায় সাম্যবাদের উপাদান ছিল বলেই হয়তো লেনিনের দেশের ভাষায় নজরুল-সাহিত্য অনুবাদের কথা ভেবেছিলেন। কিন্তু জাতীয় অধ্যাপকের এই পরামর্শ কেউ কানে তুলেননি। তিনি হয়তো নমুনা হিসেবে ইংরেজি ও রুশ ভাষার কথা উল্লেখ করেছিলেন, প্রকৃত বিচারে জাতীয় কবিকে বিশ্ব পরিসরে উপস্থাপন করতে বিশ্বের প্রধান সকল ভাষাকেই অবলম্বন করা যেতে পারে। ১৯৭৮ সালে ডক্টর আবুল আহসান চৌধুরীর নেয়া একটি সাক্ষাৎকারেও তিনি নজরুল-সম্পর্কে নানামুখী আলোচনা করেন। নজরুলের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা, ফজিলাতুননেসা এবং সেই সময়ের সাহিত্য-সংস্কৃতির অবস্থা উঠে এসেছে এই সাক্ষাৎকারে।

বেগম শামসুন নাহার মাহমুদ রচিত ‘নজরুলকে যেমন দেখেছি’ (১৯৫৯) এবং আবদুল কাদির সম্পাদিত ‘নজরুল রচনা-সম্ভার’ (১৯৬২) গ্রন্থ দু’টি নিয়ে ‘মাহে নও’ পত্রিকায় কাজী মোতাহার হোসেনের সমালোচনা-নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল।

গ্রন্থ-আলোচনায় গ্রন্থকার বা সম্পাদকের সফলতা-বিফলতা আলোচনা করলেও বিষয় যেহেতু নজরুল, কাজী মোতাহার হোসেন তাই নজরুল-সম্পর্কে নিজের অনুভব প্রকাশ করেছেন। নজরুলের আরেক বন্ধু কবি আবদুল কাদির সম্পাদিত 'নজরুল রচনা-সম্ভার' গ্রন্থের সমালোচনা-সূত্রেও তিনি নজরুলের প্রশংসা করেছেন। বেশ দীর্ঘ এই আলোচনা কাজী মোতাহার হোসেন নজরুল-সংগীতের প্রথম উর্দু তর্জমা সম্পর্কে কিছু নতুন তথ্যও হাজির করেছেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি নজরুল সম্পর্কে কিছু তথ্য পরিবেশন করেছেন, যাতে একটু অসঙ্গতি রয়েছে। মোতাহার-উল্লিখিত কংগ্রেস কর্মীর নাম কাজী আশরাফ হোসেন নয়, ড. কাজী আশরাফ মাহমুদ (১৯০৮-১৯৮৩)। তিনি তখন রায়পুরে থাকতেন পিতা ডা. কাজী আবদুস সাত্তারের সঙ্গে। পরে ঢাকায় ফিরে আসেন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হন। আর অধ্যাপক আবদুস সাত্তার 'এঁর পুত্র' নন। ড. কাজী আশরাফ মাহমুদের পিতার নাম ডাক্তার কাজী আবদুস সাত্তার। তিনি তৎকালীন ফরিদপুর, অধুনা মাদারীপুর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। পেশায় তিনি অধ্যাপক নন, চিকিৎসক ছিলেন। ভারতের রায়পুরে তিনি চিকিৎসা পেশায় নিয়োজিত ছিলেন। এদেশের প্রথম মহিলা ডাক্তার জোহরা বেগম কাজী ছিলেন ডাক্তার কাজী আবদুস সাত্তারের কন্যা এবং ড. কাজী আশরাফ মাহমুদের বোন। ডাক্তার জোহরা বেগম কাজীর বোন শিরীন কাজীও ছিলেন ডাক্তার।

বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী কাজী মোতাহার হোসেনের অনেকের পরিচয়ের মধ্যে নজরুল-গবেষক পরিচয়টিও কম গৌরবের নয়! সমকালীন সাহিত্য নিয়েই নয়, ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সাহিত্য নিয়ে একাধিক্রমে স্বপ্রশংস আলোচনা-গবেষণা করার ঘটনাও বাংলাসাহিত্যে খুব বেশি চোখে পড়ে না। নজরুল চর্চায় কাজী মোতাহার হোসেনের এই উদারতা অবশ্যই এক ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত। আজকে যাঁরা নজরুল-গবেষক কিংবা নজরুল-অধ্যাপক হিসেবে সম্মানিত, তাঁদের কাছে আদর্শ হিসেবে গণ্য হওয়া উচিত মোতাহার হোসেনের অপ্রাতিষ্ঠানিক নজরুল-চর্চার ধারা। নজরুল-চর্চায় কাজী মোতাহার হোসেনের অবদান একজন নৈয়ায়িক পথ প্রদর্শকের কাজ হিসেবে সম্মান ও মর্যাদা লাভের যোগ্য।

ড. মুহাম্মদ মুহসিন উদ্দীন*

মুরগী ও ডিমের বিস্ময়কর রহস্য

সৃষ্টির অগণিত রহস্যের মধ্যে আমাদের গৃহপালিত পক্ষীকুলের একটি হলো মোরগ-মুরগী। তাকিয়ে দেখুন তাদের জন্ম রহস্য এবং চলাফেরার মধ্যে কত আশ্চর্যজনক দৃশ্যমান ও অদৃশ্য বিষয় রয়েছে। একটু খেয়াল করে তাকালেই বিস্ময়ে আমরা হতবাক হয়ে যাব এবং তখন সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ তায়ালার মহিমা প্রকাশে আমাদের কণ্ঠে মুখর হয়ে উঠবে স্বত:স্ফূর্তভাবে এবং আবেগাপ্লুত হৃদয়ে আমরা তখন আনুগত্য করতে উদ্বুদ্ধ হবো।

মোরগ-মুরগীর বাড়ীতে পোষ মেনে থাকা দানা-পানি গ্রহণ এবং তাদের অভ্যাসাদি সম্পর্কে আমরা সবাই কিছু না কিছু বুঝতে পারি। ভোর বেলায় ঘর থেকে বেরিয়ে এলেই তারা তাদের প্রয়োজনীয় খাদ্যের সন্ধানে আবর্জনা স্তুপের দিকে এগিয়ে যায় এবং সেখানে থেকে তারা পছন্দ ও রুচিমত খাদ্য সংগ্রহ করতে থাকে। তাদের বিচিত্র পছন্দ থেকে পোকামাকড়, সাপের বাচ্চা, বিচ্ছু, কীটপতঙ্গ, ঘাস, ফল-ফুল, কাঁচ, পাথর, বালি, সোনা-চাঁদি, কিছুই বাদ পড়ে না। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত অনবরত তারা খুঁটে খুঁটে খেতেই থাকে। তাদের পাকস্থলী আল্লাহ তায়ালার নির্মিত এমনই একে অভিনব কারখানা যেখানে পড়ার সাথে সাথে সকল কিছু হজম বা আত্মস্থ হয়ে যায়। প্রয়োজনীয় উপাদান তাদের শরীরে পৌঁছে যাওয়ার পর বর্জ্য পদার্থ মল আকারে বেরিয়ে যায়। একটু খেয়াল করে দেখুন এবং ভাবুন যে এমন পাকস্থলী বাঘ-ভাল্লুক, হাতী, ঘোড়া এমনকি মানুষেরও নয়; যেখানে লোহা, কাঁচ, পাথর, শাক-সবজি, ঘাস-পাতা তরিতরকারী গোশ-মাছ সবকিছুই হজম হয়ে যায়। তার পাকস্থলীটি এক অত্যাশ্চর্য ফ্যাক্টরী, যা তার শরীরের আভ্যন্তরীণ প্রয়োজন মেটানোর জন্য প্রকৃতি থেকে উপাদান সংগ্রহ করে। তার জন্ম এবং তার অস্তিত্ব মানুষেরই খিদমতের জন্য, আর সেই জন্যই তার মধ্যে এসব জিনিসের চাহিদা এবং হজমের ব্যবস্থা মানুষের মালিক তার মধ্যে রেখে দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, রাব্বুল

* সহকারী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, ইসলামী শিক্ষা বিভাগ, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ।

আলামীন তার মধ্যে এমন বীজ রেখে দিয়েছেন যার ফলে এমনি আরও মুরগী পয়দা হবে এবং দুনিয়ায় তাদের বংশ বিস্তার হতে থাকবে। এইভাবে প্রতিনিয়তই আমরা দেখতে পাব যে প্রকৃতির মধ্যে অবস্থিত জীব-জন্তু ও পক্ষীকুলকে আল্লাহ তায়ালা বিভিন্ন ধরনের ওহী বা ইলহাম দ্বারা তাদের কার্যক্রম ও খাদ্য খাবার গ্রহণ নিয়ন্ত্রণ করছেন।

আমি আবারও অনুরোধ জানাচ্ছি, একবার অন্তরের চোখ মেলে তাকান, আপতদৃষ্টিতে মুরগীর এই চলাফেরা, খাদ্য সংগ্রহ তাদের মিলন ও ডিম দান ইত্যাদি এক স্বাভাবিক নিয়ম মনে হলেও দেখতে পাবেন তাদের সুনিয়ন্ত্রিত এসব অভ্যাসের পিছনে মহান আল্লাগ রাব্বুল আলামীনের কুদরত সক্রিয় রয়েছে। আর তাই, তারই ইলহামী ইশারাতে মুরগী যমীনের অভ্যন্তর ও উপরিভাগের অসংখ্য জিনিস থেকে ডিম দেয়ার জন্য প্রয়োজনীয় মালমসলা সংগ্রহ করে নেয়। কিন্তু যখন ডিম দেয়ার মেয়াদ শেষ হয়ে যায় তখন মাওলা পাক তাকে গোপন ওহীর মাধ্যমে নির্দেশ দেন। এখন আর এতসব খাদ্য দরকার নেই। এতদিন ডিমের খোলস শক্ত বানানোর জন্য নানাবিধ খাদ্যসহ ঐ সব ধাতব দ্রব্য প্রয়োজন ছিল। এখন ডিম দেয়া বন্ধ, কাজেই ঐগুলি আর খেয়োনা এবং প্রজন্মের জন্য এখন নর ও মদ্দীর মিলনও দরকার নেই। এবার একুশ দিনের জন্য এত্তেকাফে বসে যাও, ডিমগুলি তা দিতে থাক। এ জীবনটাকে বাঁচিয়ে রাখার তাগিদে যতটুকু প্রয়োজন আল্লাহ তায়ালার হুকুমে ততটুকু খাদ্য গ্রহণের প্রয়োজনে দিনে একবার বের হবে। কতটুকু তাপ কত সময় ধরে দিতে হবে সে বিষয়েও তাকে ইলহামের মাধ্যমে জানানো হয়।

তাই সে প্রথম সপ্তাহে একটি নির্দিষ্ট নিয়মে কিছু খাবার খেয়ে আবার গিয়ে বসে। দ্বিতীয় সপ্তাহে তার দীর্ঘক্ষণ ধরে রাখার প্রয়োজনে ডিম থেকে উঠে আসা আরও কমিয়ে দেয়া হয়। ভেবে দেখুন, কোন পর্যায়ে কতটুকু সময় এবং কতক্ষণের জন্য তাপ দিতে হবে এবং কতক্ষণ তাপ দেয়া থেকে বিরত থাকলে ডিম ঠান্ডা হয়ে যাবে না এ জ্ঞান ও বোধশক্তি তাকে কে দিয়ে থাকে? অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা ইলহাম দ্বারা এসব বিষয় নিয়ন্ত্রণ করেন। কারণ সে তো এই প্রথম ডিম দিয়েছে এবং প্রথম তা দিতে বসেছে। তার তো পূর্বের কোন বাস্তব অভিজ্ঞতা নেই। শুধু যে ডিমের তাপ সংরক্ষিত রাখার জন্য তার বসে থাকতে হয়, তাও নয়, বরং ডিমগুলি মাঝে মাঝে নাড়তে হয়। নেড়ে চেড়ে তার সকল দিকের পরিচর্যা সুসামঞ্জস্যভাবে করা লাগে এ বিষয়েও তাকে গায়েবী নির্দেশ দেয়া হয়।

একুশ দিন পূর্ণ হয়ে যাওয়ার পর ডিমের মধ্যে বাচ্চার গঠন যখন পূর্ণ হয়ে যায় তখন গায়েবী নির্দেশ আসে। এখন আর ডিম নাড়াচারা নয়, এখন দুনিয়ার জীবনে

পদার্পণ করার জন্য বাচ্চা প্রস্তুত, তার দেহ অত্যন্ত নাজুক। অতএব সে নিজে নিজে চেষ্টা করে শক্ত খোলটি ভেঙ্গে ফেলে ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসবে।

কুদরত তাকে এ নির্দেশ দিয়েছেন, সেই মতে সে কাজ করবে। অন্য কেউ যেন ডিম ভাঙ্গার চেষ্টা না করে। কারণ তার সঠিকভাবে জানা নেই, কতক্ষণ পর বাচ্চাটি বের হওয়ার উপযোগী হবে। সুতরাং সব করতে হবে, মুরগীকে অপেক্ষা করতে হবে, বাচ্চা যেন নিজের চেষ্টায় ঠোকর দিয়ে খোল ভেঙ্গে নিজেই দুনিয়াতে পদার্পণ করে। তখন তার কানে হালকা হালকা মনোরাম আওয়াজ আসতে থাকে। এ সময়ে বাচ্চাকে দেখার জন্য মুরগীটি অস্থির হয়ে উঠে। এজন্য সে ডিমের উপর বারবার ঠোঁকর দিতে থাকে। এ সময়ে তাকে সতর্ক করার জন্য তার কানে গায়েবী শব্দ ভেসে আসে; হে আমার নয়ন মুরগী, তোর সামান্য ভুলের কারণে ডিমের মধ্যে এতদিন ধরে লালিত বাচ্চাটি মারা যেতে পারে। তুই যদি তোর ঠোঁট দিয়ে ঠোঁকর মেরে বাচ্চাকে তাড়াতাড়ি বের করার চেষ্টা করিস তাহলে খোলটি ভেঙ্গে ভিতরে বসে গিয়ে বাচ্চার গায়ে আঘাত লাগার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। এমন কি সেই আঘাত বা চাপে বাচ্চাটা মারা যেতে পারে। সুতরাং মুরগীর কর্তব্য হচ্ছে, বাচ্চা নিজে নিজেই খোল ভেঙ্গে বেরিয়ে আসুক-তার জন্য অপেক্ষা করতে থাকা। গায়েবের জগতে আল্লাহ তায়ালার প্রতিপালন, রহমত এবং হেদায়েত দানের কাজ একই সাথে চলছে ।

এখন আসুন, মুরগীর মধ্যে আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞান এবং তার মধ্যে প্রাকৃতিকভাবে আগত ওহী সম্পর্কে আলোচনার পর আমরা বুঝতে চেষ্টা করি কেমন করে অদৃশ্য জগত থেকে কিভাবে ডিমের মধ্যে প্রাণ সৃষ্টি সম্ভব হয়।

অতি দুর্বল নবজাতক মুরগী বা মুরগীর বাচ্চা কঠিন একটি পর্দা ও তার উপরের শক্ত খোলের মধ্যে কিভাবে প্রাণ পেল, কিভাবে বন্দী জীবন যাপন করল, কিভাবে পেল পর্দা ও খোলের যিন্দানখানা ভেঙ্গে দুনিয়াতে আসার সামর্থ্য! সে পর্দা ও খোলের মধ্যে এতদিন সে বাস করল, সেখানে না ছিল চোখ খোলার কোন উপায়, না বাহু বা পাখা মেলার জায়গা। সেখানে সে না পা বিস্তার করতে পারে, আর না বাহ্যিক জগতের সাথে তার কোন সম্পর্ক গড়ে উঠেছে যার ফলে বাইরের কোন সাহায্য পাওয়া তার পক্ষে সম্ভব।

এ সময় তার মালিক, বিশ্ব জগতের সৃষ্টিকর্তা দয়াময় আল্লাহ তায়ালাই তার একমাত্র সাহায্যকারী এবং ত্রাণকর্তা, আর অবশ্যই তার জীবন শিরা বা শাহরগ থেকেও তিনি তার সন্নিকটে। কুরআনের ভাষায় আল্লাহ পাক বলেছেন, “অবশ্যই আমি, সর্বশক্তিমান তার শাহরগ থেকেও বেশি নিকটে আছি।” সূরা কাফ ঃ ১৬।

এই আয়াতে যে কথাটি বলা হয়েছে ডিমের থেকে বাচ্চার আগমনের এই যে পর্যায়ক্রমিক ধারা, তার থেকে আয়াতটির তাৎপর্য সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায়।

ঐ রহস্যময় অজানা-অচেনা গভীর অন্ধকার জগত থেকে দিক নির্দেশনা আসে ডিমের খোলের মধ্যে আগত নবীন ঐ বাচ্চাটির জন্য এবং তখন সে তার ছোট মোলায়েম ঠোঁট বা চঞ্চু দিয়ে ঠোঁকর মেরে মেরে পর্দার স্তরগুলি ছিড়ে ফেলতে থাকে এবং পরিশেষে বাহিরের শক্ত খোলটি ভেঙ্গে সে বাহিরে আসার পথ করে নেয়। ঠিক কোন মুহূর্তে কিভাবে সে পথ করে নেবে তা তাকে জানানো হতে থাকে কুল মাখলুকাতের মালিকের পক্ষ থেকে। যার একক নিয়ন্ত্রণে সব কিছু চলছে ও সংঘটিত হচ্ছে। এসব বিষয়ের উপর চিন্তা-ভাবনা করলে স্বাধীনতা শুধুমাত্র তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে প্রদত্ত হয়েছে। যে এ আমানতের সদ্ব্যবহার করবে, সে নিজের স্বার্থের জন্যই তা করছে। এ স্বাধীনতার উপযুক্ত ব্যবহারেই তার হৃদয়ের বন্ধ দ্বারগুলি খুলতে থাকবে এবং ক্রমান্বয়ে অজানা অনেক রহস্য ভান্ডার তার সামনে উম্মোচিত হতে থাকবে।

ডিমের এ রহস্য সংবেদনশীল চিত্তে জাগাবে সর্বশক্তিমান মাওলাপাকের ক্ষমতা ও শক্তির চেতনা। সংক্ষেপে বলতে গেলে ডিমের মধ্যে রক্ষিত বিভিন্ন স্তরও আকৃতি উদ্দেশ্যবিহীন নয়। লাটিমের মতো এ গোলকটির নীচের দিকে থাকে একটি কালো ক্ষুদ্র গোলক। এই কালো বিন্দুকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠে তার মাথা এবং উপরের মোটা অংশটিতেই ধড়। এভাবে আরোও বিভিন্ন স্তরে তার পাখনা, হৃদপিন্ড, যকৃত, পাকস্থলী ইত্যাদির গঠন হতে থকে মালিকের ইচ্ছামত। এ সবের উপর মালিকের নিয়ন্ত্রণ একচ্ছত্র। এর উপর অন্য যে কোন হস্তক্ষেপ বিপর্যয় ডেকে আনে এবং যে ক্ষতি হয় তা পূরণের আর কোন উপায় থাকে না। এসব কিছুর পরিচর্যার জন্য যে ব্যবস্থার প্রয়োজন তার নির্দেশনা (ওহী) বাচ্চাটির মায়ের হৃদয়ের উপর নাযেল হতে থাকে এবং সে মতে সে ব্যবস্থা নিতে থাকে । হ্যাঁ এ পর্যায়ে বুঝতে হবে ডিমের মধ্যে প্রক্রিয়াজনিত যেসব কাজ চলতে থাকে পৃথিবীর গর্ভে উৎপাদিত সকল বস্তু ও জীবও একই প্রক্রিয়ার অধীন নিরন্তর কাজ করে চলেছে।

আমরা ডিম থেকে বাহিরে বেরিয়ে আসার প্রক্রিয়া সম্পর্কে কথা বলছিলাম। ডিমের সরু অংশে যেখানে ছোট গোলকটি উৎপন্ন হয়ে মাথা তৈরীর কাজ করে, ঠোঁকর মেরে খোলসটির ভাঙ্গার কাজ করে কিন্তু ওখান থেকে মাথা বের হতে পারলেও বড় ধড়টি বের হওয়া মুশকিল। এজন্য খোলটির সাথে সংলগ্ন উপরের বিল্লির সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে বাচ্চাটিকে ঘুরতে হয় এবং এটা রাব্বুল আলামীনের নির্দেশেই সে করে। তবে গম্বুজের মতো শেষ অংশের দিকে ঘুরে সে ঠোঁকরাতে থাকে। এভাবে তার বাইরে বেরিয়ে আসার পথ সুগম না হয়ে তার মৃত্যু ডেকে আনবে। যেহেতু মোটা অংশে থাকে অক্সিজেন ট্যাংক। এজন্য তাকে পাশে ঠোঁকর দিয়ে বেরুনোর

পথ করে নিতে হয়। আজব এ কারখানার কার্যক্রমের দিকে যতই নজর নিবদ্ধ করা হবে ততই মানুষ রাব্বুল ইয্যতের সৃষ্টি নৈপুণ্য সম্পর্কেও ওয়াকিবহাল হতে থাকবে এবং কৃতজ্ঞচিত্তে তার গর্বদীপ্ত উন্নত শির নত হতে থাকবে।

একটু খেয়াল করলেই আমরা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ব্যবস্থাপনা ও সরাসরি নিয়ন্ত্রণ বুঝতে পারব। নরম তুলতুলে ঐ মুরগীর বাচ্চাটির শরীরে কোন প্রকার চাপ বা আচ না লাগে তার জন্য তাকে তিনি ইলহামের মাধ্যমে নির্দেশ দিচ্ছেন ধীরে ধীরে ঠোঁকর দিয়ে খোলটির গায়ে এমনভাবে দাগ করে দাও যেন খোলটি দুর্বল হয়ে দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যায় এবং তুমি আগামীতে দুনিয়ার আলোয় বেরিয়ে আসতে পার। কে তাকে এই সুনিপুণভাবে ডিমের গায়ে দাগ লাগিয়ে দেয়ার কৌশল ও টেকনিক শেখাল? এসব আর কিছুই নয়, প্রকৃতির সব কিছুর উপর আল্লাহ তায়ালার নিয়ন্ত্রণ ও হেদায়েত বা ওহীর মাধ্যমে পরিচালনার কারণ যা ভাসা ভাসা দৃষ্টিতে তাকালে বুঝা যাবে না।

মানুষকে এসব কথা বুঝানোর জন্য পর্যায়ক্রমিক অর্থের যে শব্দগুলি আল্লাহ তায়ালা ব্যবহার করেছেন যেগুলো একটু খেয়াল করে দেখুন ঃ

"শুরু, সৃষ্টি, সুসামঞ্জস্যকরণ, নির্ধারণ করণ, নির্দেশনা ইত্যাদি"। জেনে রাখুন, সৃষ্টির প্রতিটি অণু পরমাণুর অস্তিত্বের জন্য রয়েছে তাদের সৃষ্টি ও বৃদ্ধির জন্য পর্যাক্রমিক ধারা, কিন্তু অজ্ঞ-মূর্খ ভাসা ভাসা দৃষ্টিসম্পন্ন এবং বস্তু পূজারী ও বস্তুবাদী জনগোষ্ঠীর সংকীর্ণ বুদ্ধি ও বাহ্যিক জ্ঞানের অধিকারীদের পক্ষে দৃষ্টিসীমার বাইরের এবং তাদের আবিস্কৃত যান্ত্রিক পর্যবেক্ষণের আওতার বাইরের কোন কিছু বুঝা সম্ভব হয় না। আর এজন্য সব থেকে বড় যে দুর্বলতা তাদের মধ্যে সক্রিয় হয়ে রয়েছে সেটা হলো, নিজেদের জ্ঞান-বুদ্ধি, শক্তি, সামর্থ ও যোগ্যতাকে যথেষ্ট মনে করা। তাদের দৃষ্টি শ্রবণেন্দ্রিয়, ঘ্রাণশক্তি, স্বাদগ্রহণ ও স্পর্শ অনুভূতি ইত্যাদি যে পঞ্চ ইন্দ্রিয়গুলি আছে তার বাহিরের কোন কিছু তারা মানতে চায় না। অথচ ভাবে না কে দিয়েছেন এসব ইন্দ্রিয় এবং কার নিয়ন্ত্রণেই বা এগুলো কাজ করে যাচ্ছে । একথা তারা ভাবতে রাজী নয় যে, এ শক্তিগুলো বিলুপ্ত হয়ে গেলে কেউ ফিরিয়ে দিতে পারে না কেন, ভাবে না কতটুকু ক্ষমতার এবং কতক্ষণের জন্য তার হাতে সে ক্ষমতা অক্ষত থাকবে? আল্লাহকে দেখে না তারা, দেখে না তার শক্তিকে। যেহেতু দেখতে চায় না, এজন্য তারা যথেচ্ছা সিদ্ধান্ত নিয়ে বসে তার ক্ষমতা সম্পর্কে। তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কে। নিজের জ্ঞান বুদ্ধি ও দৃষ্টি সীমার মধ্যে যেটুকু তারা পায় তার উপরেই তারা সিদ্ধান্ত নিয়ে বসে।

বিভ্রান্তির বেড়াজালে আটকে পড়া মানুষ কতইনা মূর্খ, এ বিশ্বের বিশাল আয়োজনে তার অজানা-অচেনা জগতও যে কত বিরাট সেটাও তাদের জানা নেই। মাওলা করীম তিনি, কথা বলেন তিনি, তার সৃষ্টির প্রতিটি বস্তুর বা ব্যক্তির সাথে। সবকিছু একমাত্র তিনি দেখেন, সকল আওয়াজ একমাত্র তিনিই শুনেন; সবার সাথে এবং সব কিছুর সাথে একমাত্র তিনি কথা বলতে পারেন। এটা জেনে রাখা প্রয়োজন যে, কাউকে এবং কোন কিছুকে প্রাণহীন (রূহ বিহীন) মনে করা আল্লাহ তায়ালাকে এবং তার গুণাবলীকে অস্বীকার করার নামান্তর। আল্লাহ তায়ালা কথা বলেন, পরিচালনা করেন (ইলহামের মাধ্যমে) জীবজন্তু ও আমাদের দৃষ্টিতে যারা জড় পদার্থ তাদের সবাইকে ।

প্রফেসর এস এম গাজিউর রহমান*

ক্লাসিসিজম বনাম রোমান্টিসিজম

ক্লাসিসিজম এবং রোমান্টিসিজম এর বিষয়ে কিছু ভ্রান্ত ধারণা আছে। কারণ এ শব্দ দু'টি নিয়ে বাক-বিতণ্ডার জন্য প্রকৃত অর্থ নির্ণয় করা খুবই কঠিন হয়ে পড়েছে। শব্দ দু'টি নিয়ে ক্লাসিকাল যুগ এবং রোমান্টিক যুগের সৃষ্টি হয়েছে। কেউ কেউ ক্লাসিসিজমকে শিক্ষিত সমাজের সাহিত্য এবং রোমান্টিসিজমকে সাধারণ জনগণের সাহিত্য অর্থাৎ প্রথম শ্রেণীর সাহিত্য হিসাবে উল্লেখ করেছেন। কোথাও কোথাও আবার ক্লাসিসিজমকেও প্রথম শ্রেণীর সাহিত্য এবং চিরায়ত সাহিত্য বলা হয়েছে। যা কালের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। ক্ল্যাসিকাল সাহিত্য হল এরিস্টটল প্রবর্তিত। গ্রীক সাহিত্যকে ক্ল্যাসিকাল সাহিত্য বলা হয়। গ্রীক সাহিত্যের রীতি বিশুদ্ধ মানবিকতার আলোকে সমুজ্জল। এর আবেদন বিশ্বজনীন। গ্রীক সাহিত্যের অনুকরণে ল্যাটিন সাহিত্য রচিত হয়। ল্যাটিন সাহিত্যের অনুকরণে ফরাসী সাহিত্য সৃষ্টি হয়। ফরাসী সাহিত্যের ক্ল্যাসিকাল রীতির অনুকরণ করা হয় ইংরেজী সাহিত্যে। গ্রীক সাহিত্যের মূল ধারণা ছিল সৌন্দর্য সৃষ্টি। পরবর্তীতে ল্যাটিন সাহিত্যে সংযোজিত হল বুদ্ধিদীপ্ত রীতি। ফরাসী সাহিত্যে ল্যাটিন সহিত্যের অনুকরণে সংযোজিত হল যুক্তিবাদী তীক্ষ্মতা। ইংরেজী সাহিত্যেও তাই হল। ফলে এক কৃত্রিম রীতির আবিষ্কার হল। এই কৃত্রিম রীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা হল। এরিষ্টটল নিন্দিত হলেন। সাহিত্যের জগতে নতুন এক দলের সৃষ্টি হল। এবং তা হল রোমান্টিক দল।

কিছু কিছু সমালোচক মনে করেন ক্লাসিসিজম হল স্বাস্থ্য এবং রোমান্টিসিজিম হল রোগ। অপরপক্ষে কেউ কেউ বলেন, সকল ভাল সাহিত্যই রোমান্টিক। ক্ল্যাসিকের উৎপত্তি সম্পর্কে আমরা জানতে পারি যে, রোমান সমাজে পাঁচটি শ্রেণীর মধ্যে যার ১,২৫,০০০টি গাধা ছিল তিনিই হলেন উচ্চ বংশ এবং উচ্চ শ্রেণীভুক্ত। রোমান্টিসিজম শব্দটি রোমাঞ্চ বা রোমান্টিক শব্দ থেকে এসেছে। রোমান সাম্রাজ্য ধ্বংস হবার পরে দক্ষিণ ইউরোপে বসবাসকারী কিছু জনগণের মাতৃভাষা থেকে রোমান্স এবং রোমান্টিক শব্দের উৎপত্তি। এইজন্যই ইউরোপের কোন কোন

* ডীন, স্কুল অব আটর্স এবং বিভাগীয় প্রধান, ইংরেজী বিভাগ, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ।

বিশ্ববিদ্যালয়ে রোমান্স ভাষা বিভাগ চালু আছে। মাতৃভাষায় একজন গল্প লেখককে রোমান্স বুঝায়।

এডিসন এবং গ্রে মনে করেন, মধ্যযুগীয় পুরাতন দালানের ধ্বংসাবশেষ সমূহ এবং এর দৃশ্যাবলীই রোমান্টিক। ইহা খুবই কৌতুকের বিষয় যে, ঊনবিংশ শতাব্দির গোড়ার দিকে ওয়ার্ডস ওয়ার্থ এবং কোলরিজ নিজেদেরকে কখনোই রোমান্টিক ভাবতেন না। ওয়ার্ডস ওয়ার্থ রোমান্টিক শব্দটাকে অনাকাঙ্খিত ও অবাঞ্চিত মনে করতেন। ঊনবিংশ শতাব্দির শেষদিকে ১৭৯৮-১৮১৪ সালের মধ্যে যেসব কবিতা লেখা হল সেগুলোকে রোমান্টিক যুগের কবিতা বলে আখ্যায়িত করা হল। আধুনিক ইংরেজী সাহিত্যে রোমান্টিক শব্দকে কল্পনা প্রবণ, অবাস্তব, আজগবি, কাল্পনিক পরীর রাজ্য, অতীন্দ্রীয়, অদৃশ্যমান, মহা জাকজমকপূর্ণ এবং আবেগপূর্ণ বলা হয়।

কেউ কেউ বলেন, রোমান্টিসিজম অস্পষ্ট এবং এর কোন ফরম নেই। এর নির্দিষ্ট কোন সংজ্ঞা নেই। এটা ছলনাময়ী নারীর মতো। এটাকে বিশ্বাস করা যায় না। ইহা মধ্যযুগীয় প্রাচীন ভগ্ন রাজপ্রাসাদের ভৌতিক পরিবেশের কথা বলে, ইহা ওয়ার্ডস ওয়ার্থের প্রকৃতির কবিতা, কোলরিজের অস্বাভাবিক কবিতা। ইহা অলৌকিক এবং অতি প্রকৃত। ইহা শেলীর আদর্শবাদী কবিতা। কীটস্ এর হেলেনিক কবিতা। ভিক্টোর দুগো মনে করেন, বিষাদময়তাই হল রোমান্টিসিজমের মূল বৈশিষ্ট।

টি,এস,এলিয়টের মতে ক্লাসিসিজম যেখানে সম্পূর্ণ এবং শৃংখলাবদ্ধ–রোমান্টিসিজম সেখানে ভগ্নাংশ এবং বিশৃংখল। তিনি আরও মনে করেন, ক্লাসিসিজম সভ্যতার নিদর্শন এবং সৌন্দর্যের প্রতীক আর রোমান্টিসিজম অপরিচিত বিষয় নিয়ে কথা বলে। ক্ল্যাসিক সাহিত্য বোধগম্য, উন্নত শ্রেণীর এবং যুক্তি ও অনুভূতির ভারসাম্য। ক্ল্যাসিকাল সাহিত্যে প্রতিটি বিষয় মনের পর্দায় স্পষ্ট হয়ে ধরা দেয় সুস্পষ্ট দিবালোকের মত। রোমান্টিকের মনের অবস্থা সব সময়ই উত্তেজিত।

ক্ল্যাসিকাল রীতির শব্দ রচনার মধ্যে অলংকরণের প্রাধান্য দেখা যায়। কিন্তু রোমান্টিক রীতিতে সহজ-সরল অনাড়ম্বর কথ্য ভাষার লক্ষণ দেখা যায়। কবিতায় অভিজাত ভাষার পরিবর্তে অনভিজাত শব্দের নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়। ক্ল্যাসিকাল রীতি অনুযায়ী প্রতিটি স্তবকে একটি করে বক্তব্য শেষ হতো। রোমান্টিক রীতিতে ছন্দের ব্যঞ্জন মুক্তির ফলে ভাব প্রকাশের বন্ধন মুক্তি ঘটল। ক্ল্যাসিকাল রীতি–বুদ্ধিদীপ্ত অপেক্ষা আবেগ প্রধান সরলতা লাভ করলো রোমান্টিক রীতিতে। ক্ল্যাসিকাল রীতি ছিল কিছুটা কৃত্রিম। রোমান্টিক রীতিতে সহজ-সরল দৈনন্দিন জীবনের ভাষা স্থান করে নিল। ক্ল্যাসিকাল ভাষা একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে ছিল। কিন্তু রোমান্টিক ভাষা সীমাহীন অবয়বের মধ্যে জীবনের কথা প্রকাশ করলো।

যাদের রচনায় উন্মাদনার সুর লক্ষ্য করা যায়, তারা জীবনের সুগভীর রূপদান করতে পারেনা বলে আমি মনে করি। তাদের রচনায় সৌন্দর্য্যের তাজমহল গড়ে উঠে না। মনে রাখতে হবে, কবি মানেই কাল্পনিক। কবি রূপ সৃষ্টি করেন। কবি আপন মনের মাধুরী দিয়ে কাব্য সৃষ্টি করেন। সত্যিকারের কবিতা মস্তিস্ক প্রসূত নয় হৃদয় প্রসূত । তাই রোমান্টিক কবিদের কবিতায় অতিলৌকিক বিষয়বস্তু একান্ত সামগ্রীক রূপে পাঠকের সামনে প্রকাশিত হয়। তারা আকাশের তারায় তারা দেখেন। তারা ভাষাহারা সংগীত ও অবান্তর জগৎকে তৈরী করেন মানবিক ও সত্য রূপে। প্রকৃতির রূপ রস গন্ধ স্পর্শ এবং শব্দের মাঝে দেখতে পান অপূর্ব আমন্ত্রণের ইশারা। কবি যখন জগৎ ও জীবনকে স্থিরভাবে অবলোকন করেন তখন তিনি ক্ল্যাসিকাল আর যখন তিনি কল্পনার আলোকে অবলোকন করেন তখন তিনি রোমান্টিক। রোমান্টিক কল্পনা আমাদের মনকে উদ্বেলিত ও সচল করে। আমরা যখন রোমান্টিক হই তখন নতুন কিছু করার চিন্তা করি।

বাস্তবিক পক্ষে একজন কবি একটি স্বর্গীয় আলোক। তিনি পবিত্রতার প্রতিমূর্তি তথা বাস্তবরূপ। তার আত্মা ফুলে ফুলে মধু আহরণ করে–সুরালোকের পুষ্পোদ্যানে। আর আমাদের জন্য বহন করে আনে সুরের মাধুর্য্য। সৌন্দর্য্যকে মেলে ধরে প্রকৃত সত্যকেই প্রকাশ করে। তাই একজন কবিকে ক্ল্যাসিক বা রোমান্টিক এইভাবে আলাদা করে দেখা যায় না। তিনি কবি কিংবা লেখক এটাই তার বড় পরিচয়।

ড. সৈয়দা মোতাহেরা বানু*

বিশ শতকের প্রথম চার দশকের বাংলা শিশু সাহিত্য

বাংলা শিশুসাহিত্য বাংলা সাহিত্যেরই অঙ্গীভূত একটি বিশিষ্ট ধারা। উৎস ও উন্মেষে লোকজ ও সংস্কৃত ধারার ঐতিহ্যবহুল শিশু সাহিত্যের প্রকৃত চর্চা ইংরেজ সভ্যতা ও শিক্ষার সংস্পর্শে প্রথম পাঠ্যপুস্তক রচনার মধ্যে প্রস্তুতি পর্ব সম্পন্ন করে। মৌলিক শিশু সাহিত্যের সূত্রপাত হয় কেশবচন্দ্র সেন সম্পাদিত 'বালক-বন্ধু' (১৮৭৮) প্রকাশিত হওয়ার পর।

আধুনিক শিক্ষা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গেই শিশু শিক্ষা প্রসারের কাজও চলতে থাকে। এই সাহিত্যের উৎস সন্ধান করতে গেলে প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের ধারা, রূপকথা, ছেলে ভুলানো ছড়া পর্যায়ক্রমে এসে পড়ে। আধুনিক অর্থে বাংলা শিশু সাহিত্যের সূত্রপাত উনিশ শতকের ইউরোপীয় প্রভাবেরই ফল। এই অর্থে বাংলা শিশু সাহিত্যের উদ্যোগ পর্বে বিদ্যাসাগর-অক্ষয় দত্ত প্রমুখ পাঠ্য রচনায় বা এই সময় প্রকাশিত 'পদ্মাবলী' ইত্যাদি পত্রিকায় শিশু বা বালকদের জন্য রচনাকে চিত্তহারী করার প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা গেলেও পাঠ্যপুস্তকের শিক্ষা বা নীতি-উপদেশের অতিরিক্ত কিছু করার উদ্দেশ্য তাদের ছিলনা। এইসব পত্রিকায় যাঁরা লিখতেন তাঁরা অনেকেই শিশু শিক্ষার প্রসারেই অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন। 'শিশুর বিষয় নিয়ে শিশুর জন্য রচনা'র সূত্রপাত হয় এর পরবর্তী পর্বে। শিশুদের বয়সের সঙ্গে অর্থাৎ মানসিক প্রস্তুতির দিকে নজর রেখে সমালোচকরা শিশু সাহিত্যকে বিশেষ কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করতে চান। এই হিসেবে সমস্ত শিশু সাহিত্যিকের রচনা সর্বশ্রেণীর শিশুর জন্যেই উপযুক্ত বলে বিবেচিত হয়না। বিশ শতকের পূর্বে বাংলা শিশুসাহিত্য প্রথমতঃ বিদ্যালয়ের পাঠ্য, দ্বিতীয়তঃ অনুবাদ, তৃতীয়তঃ নীতি শিক্ষামূলক ছিল।

সাহিত্যে জাতীয় চেতনার প্রকাশ পরোক্ষভাবে ঘটে। উনিশ শতকের মধ্যভাগে জাতীয় ইতিহাস বা ঐতিহ্যের আলোচনা, মহাপুরুষদের জীবনী রচনা ইত্যাদির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এর পরবর্তীকালে জাতীয় চেতনা ধর্মাশ্রয়ী থেকেছে। সন্ত্রাসবাদ, গণপতি উৎসব তার মধ্যে অন্যতম।

---

* সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ।

বাংলা শিশু সাহিত্যের জন্মলগ্ন থেকেই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মতো প্রতিভাধর পাঠ্যপুস্তক রচনার সঙ্গে সঙ্গে কিছু প্রেরণামূলক বই লিখেন। গুরুত্ব দেয়া হত এমন সব বিষয় যেখানে দেশ বিদেশের জ্ঞানভান্ডার থেকে সম্পদ আহরণ করা হত। গুরুত্ব ছিল অনুবাদ বা অবলম্বিত রচনার উপর। সংস্কৃত বা পালি থেকে যেমন তেমনি অন্যদিকে প্রধানত ইংরেজীর মাধ্যমে পাশ্চাত্য সাহিত্য থেকে নানাবিধ উৎকৃষ্ট রচনা ছোটদের উপযোগী করে পরিবেশন করা হত।

পরাধীন ও অধঃপতিত জাতিকে উদ্দীপ্ত ও আশান্বিত করার জন্য কবি সাহিত্যিকরা জাতির অতীত কীর্তিকে মহিমান্বিত করে প্রকাশ করেন। বাঙালি সাহিত্যিকরাও সেটা করেছেন – সৃষ্টি করেছেন স্বাধীনচেতা বীরনায়ক। রঙ্গলাল মধুসূদন প্রমুখ বীর নায়কের প্রতিপক্ষ প্রায় ক্ষেত্রেই অত্যাচারী আক্রমণকারী পাঠান, মোগল সেনানায়ক বা রাজা বাদশা। বাঙালি মুসলিম সাহিত্যিকরাও প্রাক-মুসলিম ভারতীয় ঐতিহ্যকে নিজের বলে গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছেন। ভারতীয় ভাষায় তারা যবন ম্লেচ্ছ। এইসব বিষয় সংক্রান্ত জাতীয়তাবাদী সাহিত্য বাঙালি জাতীয়তাবাদে ফাটল ধরিয়েছে। এদেশের হিন্দুদের কাফের বলে তারা জেনেছেন। মুনীর চৌধুরী বলেন, ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের সূচনা থেকেই বাঙালির জাতীয়তাবাদের ধারণার সঙ্গে হিন্দু পুনর্জাগরণের আদর্শ মিশ্রিত হতে থাকে। শতাব্দীর শেষে এসে এই জাতীয়তাবাদ প্রায় অবিমিশ্ররূপে হিন্দু জাতীয়তাবাদে রূপান্তরিত হয়। হেম নবীনের কবিতা ও ভূদেব–বঙ্কিমের উপন্যাস এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। উপন্যাসে মুসলমান সেনাপতি শাসনকর্তাদের অত্যাচার অনাচারের চিত্র অতিরঞ্জিত করে অঙ্কিত করে তারা জনান্তিকে ইংরেজদের বিরুদ্ধে আঘাত হানতে চেয়েছেন, একথা কেবলমাত্র অংশত সত্য। ইসলাম ধর্ম ও মুসলিম নর-নারীর সর্বপ্রকার লাঞ্ছনা গ্রন্থকারগণের ব্যক্তিগত উল্লাস চাপা থাকেনি। এসব উপন্যাসে প্রায়শ দেখতে পাওয়া যায় মুসলমান চরিত্রগুলো হীনস্বভাব এবং হিন্দুগণ গুণনিধি।

উনিশ শতকের শেষভাগে শিশুসাহিত্যে জাতীয়তাবাদের সূচনা লক্ষ্য করা যায়, তবে সেই জাতীয়তাবাদ মনীষীর চরিত্র চিত্রণ ও দেশপ্রেমের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এর সঙ্গে সংগ্রহ হচ্ছিল বাংলার ঘুমপাড়ানী গান, ছেলেভুলানো ছড়া, রূপকথা, উপকথা, ভূতের গল্প, কিংবদন্তী ইত্যাদি। এই ধরনের রচনা সংগ্রহের পিছনে রবীন্দ্রনাথের সক্রিয় উৎসাহ ও উদ্দীপনা অন্য লেখকদের কাছে প্রেরণার কাজ করেছিল। রবীন্দ্রনাথ অনেককে দিয়ে লোকসাহিত্যের বিভিন্ন নিদর্শন সংগ্রহ করিয়েছিলেন।

তাঁদের মধ্যে উপেন্দ্রকিশোর রায়, দক্ষিণারঞ্জন মিত্র, অবনীন্দ্রনাথ প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্রনাথের অনুরোধে শকুন্তলার গল্প ছোটদের মতো করে পরিবেশন করবার পর অবনীন্দ্রনাথ লিখেছেন 'ক্ষীরের পুতুল'(১৮৯৬)।

এর পরবর্তী পর্ব শিশু পত্রিকার প্রকাশনা। সমকালীন সমাজ জীবনের ছবি শিশু পত্রিকাগুলিতে নিষ্ঠার সাথে তুলে ধরা হয়। বাংলা শিশু সাহিত্যের জয়যাত্রা উনিশ শতকের শেষে 'সখা' (১৮৮৩), 'সাথী', 'বালক' (১৮৮৫), 'সখা ও সাথী' (১৮৯৪), 'মুকুল' (১৮৯৫) ইত্যাদি পত্রিকার মাধ্যমে। শিশু সাহিত্যের ক্ষেত্রে নবজাগ্রত জাতীয় চেতনার প্রতিফলন ঘটে তার জন্মের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। 'সখা'য় রাজনীতি বিষয়ক প্রবন্ধ উগ্ররচনা প্রথম ছাপা হয় এবং তখন থেকেই শুরু হয় জাতীয় চেতনার গঠনমূলক ক্রিয়া।

তবে 'মুকুল' পত্রিকায় শিবনাথ শাস্ত্রী দেশী বিদেশী রূপকথাকেই সহজ সরল ভাষায় স্বচ্ছন্দ রূপ দিয়ে প্রকাশ করেন। আবার বিভিন্ন সামাজিক আন্দোলনের সঙ্গেও এই পত্রিকা জড়িত ছিল। এই পত্রিকাতেই বিশিষ্ট সম্পাদক শিশু সাহিত্যের বয়সের সীমা (৮/৯-১৬/১৭) নির্ধারণ করেছিলেন। পৃথিবীতে জন্মের শুভক্ষণ থেকে আঠারো বছর বয়স পর্যন্ত শিশু এবং শৈশবকাল হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। সকল ক্ষেত্রেই শিশু ধারণা গঠনের একটি জাতীয় মাত্রা পরিণত বা পুষ্ট হলেই কেবল বৈশ্বিক প্রবাহে মিলিত হতে পেরেছে।

শিশু সাহিত্যের ইতিহাসে যে যুগ পরিবেশ ও সামাজিক পটভূমি সক্রিয় ছিল এসব বিষয় দ্বারা তা প্রমাণিত হয়। এই সময়ে বাঙ্গালী মনীষির অনেকেই শিশু সাহিত্য রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। এইসব পত্রিকার মাধ্যমে যেসব লেখকের উদ্ভব হয় তাদেরকে বিশ শতকের বাংলা শিশু সাহিত্যের পথিকৃত হিসাবে বিবেচনা করা যায়। এদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী, দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার প্রমুখ সাহিত্যিক শিশু সাহিত্যের ক্ষেত্রে মৌলিক অবদান রাখেন। এই পর্বে পাঠ্যপুস্তকের প্রত্যক্ষ শাসন হতে শিশু সাহিত্য মুক্তি লাভ করে। নবীন লেখকেরা বুঝেছিলেন, যে ছোটদের সর্বাঙ্গীন মানসিক উৎকর্ষ সাধন করতে হলে আনন্দকে প্রথম সারিতে রেখে নীতিকে নেপথ্যে রাখতে হবে। যোগীন্দ্রনাথ সরকারের 'হাসি ও খেলা' (১৮৯১) ও খুকুমনির ছড়া (১৮৯১), অবনীন্দ্রনাথের 'শকুন্তলা'(১৮৯৫) ও 'ক্ষীরের পুতুল' (১৮৯৬) এ দিক থেকে অনন্য কৃতিত্বের নিদর্শন।

মহাপুরুষ চরিত জাতির নিজস্ব গৌরব গাথার তথা জাতীয় চরিত্র গঠনের উপযোগী মালমসলা সন্ধানের যে প্রবণতা লক্ষ্যণীয়, তার প্রতিফলন আরো দু'টি ক্ষেত্রে দেখা যায়। প্রথমটি নীতিপ্রীতি বা অদর্শবাদিতা। এ-প্রবণতা বাংলা শিশু সাহিত্যে আগেও

ছিল। কিন্তু জাতীয়তাবাদের যুগে এর ব্যাপকতর প্রকাশ ঘটে। জাতীয়তাবাদী চেতনার অন্যতম প্রকাশ ঘটে স্বদেশের রূপকথা সংগ্রহে। এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ্য, অবনীন্দ্রনাথের (১৮৭১-১৯৫১)'ক্ষীরের পুতুল' (১৮৯৬), দক্ষিণারঞ্জনের (১৮৭৭-১৯৫৭) 'ঠাকুরমার ঝুলি' (১৯০৬) আর 'ঠাকুরদার ঝুলি' (১৯০৮), উপেন্দ্রকিশোরের 'টুনটুনির বই' (১৯১০) ইত্যাদি গ্রন্থে জাতীয় চেতনা দেশজ ঐতিহ্যে গৌরবের বস্তুর সন্ধান করে ফিরেছে।

উনিশ শতকের শেষ থেকে বাংলায় যে জাতীয় জাগরণের সূচনা হয়, সে সময় শিক্ষিত বাঙালী সমাজ জাতীয় চেতনার উৎস সন্ধানে প্রাচীন ইতিহাস এবং ঐতিহ্যের দিকেও ঝুঁকে পড়েন। সেই সঙ্গে তাঁদের দৃষ্টি যায় বিভিন্ন যুগের মহাপুরুষদের বিশেষত স্বদেশের আর স্বধর্মের মনীষীদের–জীবনী আলোচনার দিকে। বাংলা শিশু সাহিত্যের ক্রমবিকাশ ধারায় জাতীয় চেতনার একটি বড় দান ছিল মহাপুরুষদের (প্রধানতঃ দেশী, অন্যত্র বিদেশী) চরিতকথা। জীবনী সাহিত্যের ব্যাপক বিকাশে কালীপ্রসন্ন দাশগুপ্তের 'আর্যনারী' (১৯০৮-০৯), রামপ্রাণ গুপ্তের 'হজরত মোহাম্মদ' (১৯০৪) ইত্যাদি এমনি ক্রান্তিকালের ফসল। শিশুভোগ্য এবং বয়স্কজন পাঠ্য উভয় শ্রেণীর সাহিত্যেই বহু ঐতিহ্য সন্ধানী রচনা আর জীবনীগ্রন্থ রচিত এবং প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালে, বিশ শতকের প্রথম দিকে, এটা প্রায় জোয়ারের রূপ নেয়, এ জের চলে তৃতীয় দশক অবধি।

গোটা বিশ শতক জুড়ে বিস্তর শিশু সাময়িক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। নানা অর্থেই সাময়িক পত্রিকা সমকালীন জীবনের দর্পণ। বৃটিশ যুগের অন্যান্য বাংলা পত্রিকার মতোই শিশু পত্রিকাগুলোতেও উক্ত জাতীয় জাগরণের প্রভাব ছিল অপরিহার্য। এর সবচেয়ে বেশি প্রভাব দেখা যায় 'তোষিণী' (১৯১০) তে।

উন্নয়নশীল জাতীয় চেতনার স্বাভাবিক প্রকাশ ছিল দেশকেন্দ্রিকতায়। প্রবণতাটি কোথাও অতিরেখ রূপে ছড়ানো নয়, রচনাবলীতে ছড়ানো। বিদেশী রচনার ভাবানুসরণ বা অনুবাদ প্রকাশনের অধিকাংশ রচনাই ভাবধারার দিক থেকে ছিল মাটিকেন্দ্রিক। মাঝে মাঝে পত্রিকাগুলিতে দেশ পরিচয় মূলক এবং ভাষাপ্রীতি মূলক রচনাও দেখা যায়।

উদ্দিপনা মূলক জাতীয় ভাবধারার কবিতায় বাঙালি কবিরা গৌরব সন্ধান করেছেন দূর অতীতের ইতিহাসে। তা কখনো ভারতের গৌরব, কখনো আর্যের গৌরব, কখনো হিন্দুর গৌরব। মধ্যযুগের মুসলিম ইতিহাসকে তাঁরা বিদেশীরূপে অনাত্মীয়রূপে দেখেছেন। বাঙালি মুসলিম সহিত্যিকরাও প্রাক-মুসলিম ভারতীয়

ঐতিহ্যকে নিজের বলে গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছেন। এ দেশের হিন্দুদের তারা কাফের বলে অভিহিত করেছেন।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের (১৯০৫) পর এই ধারার কিছু পরিবর্তন সূচিত হয়। এই সময় থেকে বাঙালি কবি-সাহিত্যিকগণ সাহিত্যে হিন্দু মুসলিম মিলনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতে থাকে। তখন থেকে কাব্যে, নাটকে, কথাসাহিত্যে মুসলিম ঐতিহ্যে তাঁদের প্রীতি ও প্রশংসা পেতে থাকে।
'শিশু'(১৯১২) পত্রিকায় মুসলিম বিষয়বস্তু গুরুত্ব পেয়েছে, তবে অব্যবহিত পশ্চাৎভূমি ছিল হিন্দু পাঠক সমাজ। 'সন্দেশ'(১৯১৩) পত্রিকা ধর্মবোধের উর্ধ্বে শৈশবের মুক্ত সুখ ও অবিমিশ্র আনন্দ সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু সমকালীন সমাজ জীবনের বাস্তবতার সঙ্গে 'সন্দেশ' পাঠক-পাঠিকাদের তেমন প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিলনা। 'সন্দেশ' সম্পাদক খুশীর রঙীন আতস বাজীতে শিশু সাহিত্যের আকাশ মাতিয়ে রেখেছিলেন। যোগীন্দ্রনাথ সরকারের সেই আশ্চর্য ছড়া ও ছবিতে নবদিগন্তের আহক্ষান অনিবার্য ছিল। অথচ প্রথম মহাযুদ্ধের কাল সেটা।

সমাজ চেতনায় উদ্বুদ্ধ হল 'সন্দেশের পরের পত্রিকাগুলি। বিশ্বযুদ্ধের বিষক্রিয়ায় ভারত জুড়ে মানুষের কষ্ট আরো তীব্রতর হল পঁচিশ বছরের মধ্যে। বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কার, সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির অবিমৃষ্যকারিতা, ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টির জন্ম (১৯২৫), পৃথিবীর সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জাগরণ, যুদ্ধ-বিধ্বস্ত ভেঙে পড়া অর্থনীতি শিশু সাহিত্যের লেখকদের আর কেবল উদ্ভট কল্পনার জগতে সম্পূর্ণ নির্বাসিত করে রাখতে পারল না। সে অবস্থার চূড়ান্ত রূপ এল মন্বন্তরের ভয়াবহতায়। সঙ্গে আবার বিশ্বযুদ্ধ।

যদিও শিশু পত্রিকায় জাতীয়তাবাদী চেতনা উনিশ শতকের শেষ থেকে দেখা যায়, কিন্তু বাংলা ভাষার কোন শিশুতোষ পত্রিকাই সে- আমলে রাজনীতির সাথে বিশেষ সম্পর্ক রাখেনি। 'আঙুর' (১৯২০) পত্রিকা ছিল ধর্মনিরপেক্ষ।

'শিশু সওগাত' পত্রিকা ১৯২২, এপ্রিল প্রথম প্রকাশিত হয়। কিছুকাল বন্ধ থাকার পরে ১৯৩৮ সালে পুনরায় প্রকাশিত হয়। শিশু বিকাশের সঙ্গে ইতিহাস জ্ঞান ও বিজ্ঞান বুদ্ধিকে বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। অমুসলিমদের জন্য দ্বার উন্মুক্ত রেখেই মুসলিম ঐতিহ্যের কথা এসেছে। সে কারণে শিশু বিকাশের ক্ষেত্রটি এখানে বেশ প্রসারিত করে তোলা হয়েছে। মুক্ত বিকাশের দিকটি বিশেষ গুরুত্ব অর্জন করেছে। বাঙালি মুলমানদের সাহিত্যিক জাগরণ হিন্দুদের বিস্ময়ের কারণ হয়েছিল। তারা নানাস্থানে সাহিত্য সম্মেলন এবং কলকাতার নানা কাগজে বিস্ময় প্রকাশ করতে থাকেন। মুসলমানরা রাজনীতির ক্ষেত্র হতে সাহিত্যেও সাম্প্রদায়িকতা টেনে আনলো বলে নানাদিক থেকে হুঙ্কারও আসতে থাকে।

'শিশুসাথী'(১৩২৯) পত্রিকায় হিন্দু ধর্মবিষয়ক ও বিজ্ঞানবিষয়ক রচনা পাশাপাশি গুরুত্ব পেয়েছে। অনুমিত হয়, হিন্দু সমাজ ও সংস্কৃতি গঠনের জন্য এ পত্রিকা আগ্রহী ছিল। সমকালীন রাজনীতির সারকথা জানানোর জন্যও এই পত্রিকা দায়বদ্ধ ছিল। যুদ্ধের ফলশ্রুতিতে গ্রাম বাংলার অর্থনৈতিক কাঠামোর মর্মন্তুদ পরিবর্তনের প্রতিফলন পত্রিকায় প্রতীয়মান হয়। বার্ষিক 'শিশুসাথী'(১৩৩২) মাসিক 'শিশুসাথী'রই ধারাবাহিকতা রক্ষা করেছে। সব পত্রিকাই পাঠ্যপুস্তকের বাইরে শিশু ভুবন গঠন করেছে।

স্বাভাবিকভাবে এই সামাজিক পরিবেশে শিশু পত্র-পত্রিকাগুলি কেবল নৈতিক চরিত্র গঠনোপযোগী আদর্শ মূলক রচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে পারল না। একদিকে স্বদেশী আন্দোলন, স্বদেশ শ্রদ্ধা, মাতৃজ্ঞানে দেশকে ভালবাসার প্রেরণা দেওয়া, স্বাধীনতা আনার পুণ্যব্রতে উদ্বুদ্ধ করা, অন্যদিকে দুর্বল অর্থনৈতিক কাঠামোয় বিধ্বস্ত সমাজবোধ জন্মানো, রুদ্র কঠিন বাস্তবতার মধ্যে জীবন গড়ে তোলার দায়িত্ব জাগানোই ছিল এই পত্র-পত্রিকাগুলির প্রধান উদ্দেশ্য। এই সমস্ত মিলেই আধুনিক শিশু সাহিত্যের অস্তিত্ব।

পুরাতন পরীর গল্প, দৈত্যদানোর গল্পের বদলে ক্রমশ শিশুদের বাস্তব পারিপার্শ্বিকের চেনাভুবন সম্পর্কে আরো জানার কথায় উদ্দীপ্ত কৌতুহল চরিতার্থের দায়িত্ব নিলেন শিশু সাহিত্যিকরা। এই প্রচেষ্টায় সমাজের ক্রমোন্নতি ও অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তন জনিত যে দ্রুত শিল্পোন্নয়ন সাড়া পৃথিবী জুড়ে মানব সভ্যতার একটা বিরাট পরিবর্তন এনে দিচ্ছিল তার প্রতিচ্ছাপও অনিবার্যভাবে সাহিত্যে পড়লো। এ বদল ইংরেজী সাহিত্যের শিশুবিভাগেও পড়েছিল। উনিশ শতকের শেষেই সে বদল ঘটে গিয়েছিল। 'ঞবপযহরপধষ ঢ়ৎড়মৎবংং রহ ঃযব ১৯ঃয পবহঃঁৎু ধিং ৎবষধঃবফ ঃড় ঃযব মৎড়রিহম ষরঃবৎধঃঁৎব ঃৎবহফ রহ ঊহমষধহফ.' সুতরাং জনরুচি তথা পাঠক রুচিরও বদল ঘটেছিল। উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে পাশ্চাত্যে যে বিপুল বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও উন্নতি সাধিত হয়েছে তার প্রভাব সাহিত্যে অনিবার্যভাবে এসে পড়েছিল। জ্ঞান ও আনন্দ সৃষ্টির আদর্শ অক্ষুন্ন রেখে অম্লান শৈশবের অক্ষয় সৌন্দর্য্যের লীলা উপস্থিত করেছেন - বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির কথা - সভ্যতার অগ্রগতির কথা মাথায় রেখে।

উনিশ শতকের কিছু মাহেন্দ্রক্ষণ ছিল শিশু সাহিত্য সৃষ্টি হয়ে ওঠার সঙ্গে যুক্ত। সামাজিক শিশু ধারণা যত পরিণত রূপ প্রাপ্ত হয়েছে শিশু সাহিত্যের মধ্যে সে সবের সৃষ্টিশীলতা একত্রে গঠিত হয়ে গেছে। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন মূল নক্ষত্র এবং তিনি ছিলেন উনিশ এবং বিশ শতক জুড়ে। তাঁর প্রায় আশি বছর পার্থিব জীবনের অর্ধেক ছিল উনিশ শতকে বাকি অর্ধেক ছিল বিশ শতকে। উনিশ শতকে চরণ রেখেই তিনি বিশ শতকটিকে জয় করে নিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের কালসীমার মধ্যে আরো কিছু

উল্লেখযোগ্য শিশু সাহিত্যিক পাওয়া যায়, যাদের সক্রিয় সাহিত্যিক জীবনের পুরো অংশ উনিশ ও বিশ শতকের মধ্যে পরিব্যাপ্ত, বিশ শতকের মধ্যে এসে তাদের বিশেষ উল্লেখযোগ্য সাহিত্য কর্মগুলো প্রকাশিত হয়েছিল। উনিশ শতকে পুনর্জাগরণ সৃষ্টির লক্ষ্যে যখন বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষেত্রে অতীত সন্ধান শুরু হয়েছিল তখন একদিকে যেমন লোকজীবন ও লোকসাহিত্য অনুসন্ধানের জন্য আগ্রহ জন্মে তেমনি অতীত ইতিহাসের মধ্যে আবেগমন্ডিত সফর শুরু হয়। লোকজীবনে ও সমাজে প্রচলিত রূপকথাগুলো পুনর্জীবনপ্রাপ্ত হয়ে শিশু সাহিত্যে এসে আশ্রয় করে নেয়। বিশ শতকে এর জের চলতে থাকে। অতীত ইতিহাস উপাখ্যান ইত্যাদি সূত্রে রামায়ণ, মহাভারত ও পৌরাণিক কাহিনীগুলো শিশু সাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ অধিকার করে। রামায়ণ, মহাভারত ও পৌরাণিক কাহিনীগুলোর সঙ্গে সমকালীন সমাজ জীবনের সম্পর্ক স্থাপনের সমস্যা ছিল অনেক, ফলে শিশু সাহিত্যে এসবের পুনর্বাসনের বিষয়টি সহজ ছিল। কেবল রূপকথার কাহিনীতে নয় ছড়ায়. কবিতায় সর্বত্রই পৌরাণিক কাহিনীর আবেগকে গ্রহণ করে নেবার আগ্রহ লক্ষ্য করা যায়। এভাবে বাংলা শিশু সাহিত্যের প্রথম দিকে গভীর সমাজ সম্পর্কযুক্ত হয়ে উঠলেও পৌরাণিক আচ্ছাদনকে সহজে ত্যাগ করতে পারেনি। এই নতুন পথ নির্মাণ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। রূপকথার মধ্যে তারা ভালোমন্দের পার্থক্য, সামাজিক নৈতিকতার দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করে রেখেছেন। শিশু সাহিত্যে যে ভুবন রচিত হয়েছিল তার মধ্যে মুক্ত শিশুকে পাওয়া গিয়েছিল।

বাংলা সাহিত্য বিকাশের ধারাবাহিকতায় অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগে বাস্তব জীবনের সাথে ঘনিষ্ট পরিচয় ও নিবিড়তম বন্ধন হচ্ছে সাম্প্রতিক সাহিত্যের স্বরূপ লক্ষণ। শুধু তাই নয়, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে দেবত্বের মোহ, অলৌকিকতার মায়াজাল কেটে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই সংস্কারমুক্ত হওয়ার পরিক্রমায় আমাদের চোখ পড়তে লাগল মানুষের দিকে, তার মহিমাই ক্রমে ক্রমে হৃদয় ও মন অধিকার করতে লাগল। এই মানবতার সুরই আধুনিক যুগের মূল সুর।

ইতিহাসের আবর্তনের ভিতর দিয়ে সাহিত্যের দেহে ও মনে একটু একটু করে প্রকাশ পেয়েছে এই পরিবর্তনের বিশেষ লক্ষণ- সেই লক্ষণ সমষ্টিই আধুনিক যুগের পরিচয়। আমাদের চিন্তাশক্তির ক্রমবিবর্তনের ভিতর তিনটি প্রধান স্তরবিভাগ রয়েছে। চিন্তার আদিম যুগ, দার্শনিক চিন্তার যুগ ও সবশেষে বৈজ্ঞানিক যুগ। মানুষের চিন্তার প্রসারের ফলে এখন আমরা এসে পৌঁছেছি বৈজ্ঞানিক যুগে। এ যুগে সত্য লাভের যথার্থ উপায় হচ্ছে গাণিতিক উপায়, এবং সে সত্য লাভের একমাত্র উদ্দেশ্য হবে এই জীবনকে পূর্ণ পরিণতি দান। আধুনিক যুগের লক্ষণ মুক্তির সন্ধান।

মোঃ শাহাদত হোসেন*

লেখক ও সমাজ

লেখক একটি সমাজের ধারক ও বাহক। আমি মনে করি, লেখকের কলমের ডগায় নির্ভর করে সমাজের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের নিয়তি। কেবল লেখকগণই দিতে পারেন উচ্ছৃংখল হতাশাগ্রস্ত তরুণদের জন্য মুক্তির বারতা। একজন লেখক তাঁর সংবেদনশীল মন দিয়ে সমাজের নানান খুঁটিনাটি বিষয়, মানুষের দুঃখ-কষ্ট, অতীতের ঘটনাবলী, সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদান রেখেছেন এমন ব্যক্তিবর্গের জীবনী, সমাজের ভেতর, প্রকৃতির ভেতর আলোচিত-অনালোচিত বিভিন্ন গুরুতর ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর গবেষণামূলক গ্রন্থ–ইত্যাদি রচনা করে কিংবা উপন্যাস নাটক গল্প কবিতা লিখে সমাজকে দিতে পারেন নতুন জীবনী শক্তি।

এসব দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, লেখক যেহেতু প্রচলিত ধারণা থেকে ভিন্নতর ধারণা নিয়ে সমাজের মাঝে আত্মপ্রকাশ করেন তাই লেখক তাঁর বিবেকের তাড়না বশেই সমাজের কাছে দায়বদ্ধ থাকেন। লেখক তাঁর অর্ন্তদৃষ্টি দিয়ে সমাজকে দেখেন, তাঁর সংবেদনশীল মন দিয়ে সমাজকে অনুভব করেন, অত:পর সেটা তিনি তাঁর সৃষ্টিশীল তুলি দিয়ে সাধারণের সামনে প্রকাশ করেন। কাজেই বলা যায়, একমাত্র একজন লেখকের পক্ষেই সম্ভব একটা নির্দিষ্ট সময়ের সমাজকে অনির্দিষ্ট সময়ের মাঝে প্রসারিত করে দেয়া এবং পৃথিবীর একপ্রান্তের সংস্কৃতি, সভ্যতা সবকিছুকে অন্যপ্রান্তে পৌঁছে দেয়া।

এ ক্ষেত্রে বলা যেতে পারে, প্রাচীন যুগের সাহিত্য চর্যাগীতিকা থেকে শুরু করে মধ্যযুগের সাহিত্য অতঃপর আধুনিক যুগের সাহিত্যিকগণ তাঁদের নিজ নিজ সময়ের সমাজ প্রেক্ষাপটকে বয়ে নিয়ে চলেছেন অনির্দিষ্ট সময়ের স্রোতে। তাঁদেরই কল্যাণে আমরা আজ দু'হাজার সালের শুরুতে বসেও জানতে পারছি ছ'শত সালের সমাজ প্রেক্ষাপটকে।

এখন সঙ্গত কারণেই প্রশ্ন জাগে, যেখানে সমাজের প্রতি লেখকের এত দায়বদ্ধতা সেখানে লেখকের প্রতি কি সমাজের কোন দায়বদ্ধতা নেই? আমি বলবো, অবশ্যই আছে। লেখকের প্রতি সমাজের দায়বদ্ধতা অবশ্যই আছে। লেখক তো সমাজেরই

* পরিচালক, প্রশাসন, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ; প্রাক্তন পরিচালক, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

সন্তান। তাঁরা কোন ভিন্ন গ্রহ থেকে এসে সমাজের দায়িত্ব ঘাড়ে তুলে নেন নি বা নেন না। এখন সমাজ যদি তাদের প্রতি কোন দায়িত্ব পালন না করে তাহলে কি করে কোন দেশে মহত লেখক সৃষ্টি হবে।

একজন লেখক যখন বিভিন্ন দিক থেকে মানুষের দুঃখ কষ্টকে উপলব্ধি করেন এবং সেটা তাঁর সুকুমার মনোবৃত্তির স্পর্শ দিয়ে সমাজের সামনে তুলে ধরেন, তখন সেই লেখকের প্রতিও সমাজের কর্তব্য আছে। আর এ কর্তব্য হতে পারে একজন লেখককে মেন্টাল শেল্টার দেয়া, সামাজিক ও নৈতিক স্বীকৃতি দেয়া, সবদিক দিয়ে তাঁকে বাঁচিয়ে রাখা ও পরিপুষ্টি দেওয়া। তবে এক্ষেত্রে বিচার বিবেচনারও প্রয়োজন পড়ে। যারা সমাজের পক্ষে অবক্ষয়মূলক রচনা করে সমাজের শৃংখলা নষ্ট করতে তৎপর থাকে, আমি মনে করি তখন সমাজের শৃংখলা রক্ষার উদ্দেশ্যে তাদেরকে নিয়ত্রণ করাও সমাজের কর্তব্য বা দায়িত্ব।

একটা কথা আমাদের মনে রাখা দরকার, লেখক কখনো তৈরী করা যায় না। তবে নানা রকম প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ নিয়ে লেখক সত্বাকে বের করে আনা সম্ভব। যেমন, সাহিত্য প্রতিযোগিতা, সাহিত্য পত্রিকা ইত্যাদি। লেখকের চিন্ত ার স্বাধীনতায় কখনো হস্তক্ষেপ করা ঠিক নয়।

সবশেষে বলা যায়, সমৃদ্ধ ভালো লেখার উপর সমাজের সুস্থতা যতখানি নির্ভর করে, অন্য কোন শিল্পের উপর তা ততখানি নির্ভর করে না। শুধু তাই নয়, একটি যুগকে বা সময়কে যুগান্তরে বা সময়ান্তরে বয়ে নিয়ে যাবার জন্যও উৎকৃষ্ট লেখা এবং লেখকের বিকল্প কিছু নেই। সুতরাং সেই সমৃদ্ধ লেখা এবং লেখক দু'টিকেই উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করা সমজের অবশ্য কর্তব্য। লেখক ও সমাজ একে অন্যের পরিপুরক ও পরিপোষক হওয়া খুবই জরুরী।

খন্দকার আব্দুল মোমেন*

গৃহ পরিবেশ ঃ শিশুর ভবিষ্যৎ নির্মাণের অনিবার্য অনুসঙ্গ

একটি দেশ তথা পৃথিবীর ভবিষ্যৎ উন্নতি-অবনতি সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে শিশুদের উপর। শিশুরাই দিনে দিনে বড় হয়ে একদিন শাসন করবে দেশ। তাদের মধ্য থেকেই বের হয়ে আসবে এক একজন কলম্বাস, সক্রেটিস, শেক্সপিয়র, হিলারী, রবীন্দ্রনাথ, নজরুলের মতো বিজ্ঞানী, দার্শনিক, পর্যটক সাহিত্যিক। এই এদের মধ্য থেকেই তৈরী হবে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, রাজনীতিবিদ, শিক্ষাবিদ। কাজেই তাদের সুস্থ, সুন্দর বেড়ে উঠা এবং ক্রমবিকাশ খুবই জরুরী। ওদের প্রতি অবহেলা করা মানে একটি দেশ তথা পৃথিবীকে অন্ধকার কুঠরীতে নিমজ্জিত করে দেয়া।

শিশুর সুস্থ সুন্দর বেড়ে উঠা এবং ক্রমবিকাশ নির্ভর করে দুটি বিষয়ের উপর। এক. বংশগতি (ঐবৎবফরঃু) দুই. পরিবেশ (ঊহারৎড়হসবহঃ)। শিশু তার জীবনের শুরুতে পিতামাতা এবং পূর্ব পুরুষের কাছ থেকে যে সহজাত গুণাবলী পেয়ে থাকে তাকে বলা হয় বংশগতি বা যবৎবফরঃু. এটি শিশুর মানসিক, শারীরিক, চারিত্রিক গুণসহ অংশত তার দেহের গঠন, বুদ্ধিমত্তা, বর্ণ, মেজাজ, দক্ষতা প্রভৃতির সংলক্ষণও হতে পারে। উডওয়ার্থের (ডড়ড়ফড়িৎঃয) ভাষায়, মানুষ যা নিয়ে তার জীবনটা শুরু করে তাই তার বংশগতি। জীবনটা শুরু হয় ভূমিষ্ঠ হবার সময় নয়, তারও প্রায় ন'মাস আগে থেকে।

আমাদের চারপাশের দৃশ্যমান জগৎ হচ্ছে পরিবেশ। গৃহ, স্কুল, সমাজব্যবস্থা, এমন কি আবহাওয়াগত শীত-গ্রীষ্মের প্রাকৃতিক অবস্থাও পরিবেশের অন্তর্ভূক্ত। একটি বৃক্ষের বীজে যে শক্তি লুকিয়ে থাকে অঙ্কুরোদগমের পর পৃথিবীর আলো-বাতাস, তাপ, শৈত্য বা রোদ-বৃষ্টির প্রভাবে তা বিকশিত অথবা নষ্ট হতে পারে। অনুকূল পরিবেশে শিশু গাছটির বিকাশ আবার প্রতিকূল পরিবেশে বিনষ্ট হয়ে যেতে পারে। শিশুর সহজাত সংলক্ষণের কোনটি বিকাশ লাভ করবে আর কোনটি করবে না তা

* সম্পাদক, সাহিত্য পত্রিকা, প্রেক্ষণ ও শিক্ষক, বাংলা বিভাগ, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ।

নির্ভর করে পরিবেশের উপর। বিষয়টি এমন যে, আগুনে মাখন গলে কিন্তু ডিম শক্ত হয়ে যায়।

আমাদের একটি কথা মনে রাখতে হবে, বংশগতির উপর মানুষের কোন হাত নেই। তবে পরিবেশ মানুষের নিয়ন্ত্রণে। পরিবেশের উন্নতি-অবনতি আমাদের পরিচর্যা, জীবনবোধ, দর্শন, অনুশীলন প্রভৃতির উপর নির্ভরশীল। শিশুর জন্য একটি সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি করা একান্ত অপরিহার্য। শিশুর বেড়ে উঠা এবং সুস্থ-সুন্দর ক্রমবিকাশ প্রক্রিয়ায় গৃহ পরিবেশ ও সমাজ পরিবেশের প্রভাব অপরিসীম। এ নিবন্ধে শিশুর গৃহ পরিবেশের আলোচনাই মুখ্য।

শিশুর গৃহ পরিবেশের বস্তুগত উপাদানের মধ্যে পড়ে ঘর, আসবাবপত্র, বাসন-কোশন, বই-পুস্তক, লেপ-তোষক, কাঁথা-বালিশ ইত্যাদি। পরিবারের সদস্যদের আচার-আচরণ, রুচি, নিয়ম-শৃংখলা, কথা-বার্তা ছাড়াও গৃহের সাজানো-গোছানো ভাব, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন অবস্থা প্রভৃতি একটি গৃহ পরিবেশের উপাদান। আলো-বাতাস গৃহ পরিবেশের প্রাকৃতিক উপাদান। সর্বোপরি বাবা-মার ধৈর্য্য ও শিশু সম্পর্কে তাদের যথার্থ ও সুস্পষ্ট জ্ঞান এবং গৃহের মধ্যে শিশুর নিরাপত্তাভাব গৃহ পরিবেশের বড় উপাদান। সু-পরিবেশে সজ্জিত একটি সু-গৃহই শিশুর সুস্থ সুন্দর ক্রমবিকাশের পথকে সুগম করতে পারে।

বাবা-মার দাম্পত্য জীবনের সুখ-শান্তি সু-গৃহের মূল উৎস। যে পরিবারে পিতা-মাতার সম্পর্ক দৈহিক ও আধ্যাত্মিক বিষয়ের সমন্বয়ে গড়ে উঠে তাদের সম্পর্ক হয় মধুর। তাদের দৈনন্দিন জীবনধারা থাকে সুস্থ সজীব ও সুন্দর। এমন পরিবারের পিতা-মাতার পক্ষেই সম্ভব ধৈর্য্যের সাথে শিশুকে জানা এবং শিশুর পরিচর্যা করা। গৃহের সুখ-শান্তিই শিশুর নিরাপত্তা ভাবকে সুরক্ষা করে। পিতা-মাতার চারিত্রিক অসদ্ভাবের কুফল শুধু তাদের জীবনকেই বিষময় করে তোলে না, তার বেশির ভাগ গরলই অসহায় শিশুর জীবনকে করে বিপন্ন। যে পরিবারের সদস্যরা ঝগড়াটে, যাদের নিয়ম-শৃঙ্খলা নেই,যাদের রুচিবোধ অপরিচ্ছন্ন সে পরিবারের শিশুর মধ্যে এ কু-প্রভাবগুলো সংক্রেমিত হয়। এবড়সবঃৎরপধষ চৎড়মৎবংংরড়হ অর্থাৎ গুণোত্তর প্রগতিতে(১:৩:৯:২৭:৮১)। ফলে শিশুর চরিত্রে নোংরামি, বিশৃঙ্খলা ও ঝগড়াটে ভাব দানা বাঁধতে থাকে দ্রম্নত গতিতে। অপরপক্ষে সাজানো গোছানো, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, নিয়মতান্ত্রিক ও সুরুচিপূর্ণ একটি পরিবারের শিশুর মধ্যে এইসব সদগুণাবলীর বিকাশ ঘটতে থাকে ধীরে ধীরে। ভাল জিনিসের প্রভাব শিশুর মধ্যে বিকশিত হয় অৎরঃযসবঃরপধষ চৎড়মৎবংংরড়হ অর্থাৎ সমান্তরাল শ্রেণীতে (১,২,৩,৪,৫)। যেমন, কোন এক

সন্ধ্যাবেলা একটি গৃহে মাগরিবের নামাজ পড়ছে সবাই। তিন বছরের শিশুটিও দাঁড়িয়েছে পাশে। তাকে কিন্তু কেউ ডাকেনি। আবার নামাজ শেষে পড়তে বসেছে সবাই। কেউ ক্লাশের পড়া পড়ছে, কেউ গল্পের বই কেউবা খবরের কাগজ। তিন বছরের শিশুটিও একটি বই নিয়ে পড়ার চেষ্টা করছে। এই-ই হচ্ছে পরিবেশের প্রভাব। সু-গৃহের একটি উপাদান স্নেহ ভালবাসা ও সৌহার্দ্যপূর্ণ মধুর সম্পর্ক। যে গৃহের ভাই-বোনদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ, সহমর্মিতা, ত্যাগ-তিতীক্ষা বর্তমান থাকে এবং পিতামাতার বাৎসল্যরসে সন্তানাদির জীবন হয় সিক্ত সেখানে শিশুর ক্রমবিকাশ হয় স্বাভাবিক ও জীবন্ত। তবে আদর-সোহাগ-ভালবাসার সাথে শিশু পরিচর্যায় শাসনের সমন্বয় থাকা দরকার। এ ক্ষেত্রে যে উপদেশটি শিরোধার্য তা হচ্ছে,"শাসন করা তারই সাজে সোহাগ করে যে"। শিশু প্রতিপালনে শাসন এবং সোহাগের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকা প্রয়োজন। কেননা," অনাদরের অনাবৃষ্টিতে শিশুমন হয়ে উঠে ঊষর মরুভূমি, আবার স্নেহের আতিশয্যে তা হয় জলাভূমি। শিশুর স্বাভাবিক বৃদ্ধির পক্ষে উভয়ই পরিপন্থী। চারাগাছের পক্ষে বারিসিঞ্চন ও রৌদ্রতাপ যতখানি প্রয়োজন, ক্রমবর্ধমান শিশুর পক্ষে স্নেহ ও শাসন ঠিক ততখানিই প্রয়োজন।" অশান্তি ও অনাদরের মধ্যে যে শিশু পালিত হয় ধীরে ধীরে তার জীবন হয়ে উঠে বিষময়। উপেক্ষা আর অবহেলায় নির্জীব শিশুটি ক্রমান্বয়ে জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণ হয়ে পড়ে। দেখা দেয় অপরাধ প্রবণতা। শিশুকে এই পরিণতি থেকে বাঁচানোর জন্য মহানবী (সঃ)-এর বাণীর অনুসরণ একান্ত জরুরী। তিনি বলেন "শিশুরা হচ্ছে বেহেশ্তের ফুল'– অন্যত্র তিনি বলেন,' শিশুরা হচ্ছে বেহেশ্তের প্রজাপতি তুল্য"। মহানবী (সঃ) আরো বলেন, "যারা ছোটদের স্নেহ করে না আর বড়দের সম্মান করে না তারা আমার উম্মতের মধ্যে গণ্য নয়।" নবী করিম (সঃ) শিশুর জন্য একটি উপঢৌকন নিয়ে বাড়ি পৌঁছাকে দুর্ভিক্ষ পীড়িত মানুষের জন্য খাদ্যসামগ্রী বহন করে নিয়ে যাওয়ার সাথে তুলনা করেছেন। গৃহ পরিবেশ এমন হওয়া বাঞ্ছনীয় যাতে শিশু বুঝতে পারে পরিবারের মধ্যে তার সম্মান আছে। তার গুরুত্ব আছে। শিশু বিজ্ঞানী ইমারসন (ঊসবৎংড়হ) এর একটি কথা এখানে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন " শিশুকে সম্মান কর। অতি মাত্রায় মাতৃত্ব বা পিতৃত্ব ফলাতে যেওনা।...শিশুকে সম্মান কর। শেষ পর্যন্ত তাকে সম্মান দেখাও। কিন্তু নিজের সম্মানও বজায় রাখ। তার চিন্তার সাথী, বন্ধুত্বের দোসর ও সদগুণের অনুরাগী হও। কিন্তু কোনক্রমেই তার পাপের প্রশ্রয় দিও না।"

বেড়ে ওঠা প্রক্রিয়ায় শিশুর জীবনে প্রথম তিন বছর খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই তিন বছর শিশু পরিচর্যায় পিতামাতাকে অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হয়। কেননা শিশুর দেহ

এবং মনের বিকাশ এই সময়ে খুবই দ্রুত এগিয়ে চলে। দু'বছর পর্যন্ত মা শিশুকে অবশ্যই বুকের দুধ খাওয়াবেন। কারণ বুকের দুধের কোন বিকল্প নাই। তিনমাস বয়স থেকে শিশুকে মায়ের দুধের পাশাপাশি অল্প করে অন্যান্য খাবার খাওয়াতে হবে। নিদৃিষ্ট নিয়ম অনুযায়ী ঘুম ও খাওয়ার প্রতি পিতামাতার যত্ন নেওয়া প্রয়োজন। শিশু কাঁদলেই শিশুকে খাওয়ানো ঠিক নয়। কেননা ক্ষুধা লাগলেই শিশু কাঁদে এমনটি নাও হতে পারে। শিশুর স্পর্শাতুর মন মায়ের কোল পাওয়ার জন্যও কাঁদে। শিশুরা অত্যন্ত অনুকরণপ্রিয়। হৃদয়টা তাদের আরশির মত। এ সময় সব কিছুরই ছাপ শিশুমনে গভীরভাবে দাগ কাটে। তাই বাছাই করা ছাঁটাই করা ছবিই এ আরশির সামনে তুলে ধরা উচিত। শিশুর কান্না থামাবার জন্য কখনো ভয় দেখানো উচিত নয়। কেননা ভয়-ভীতিতে শিশুমন বাড়তে থাকলে ভবিষ্যতে সে সাহসী মানুষ হিসাবে গড়ে উঠবে না। শিশুদের সামনে ভূতের গল্প না করে যদি বীরের গল্প করা হয় তাহলে তাদের মন সাহসী হয়ে উঠবে। এবং তাদের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাময় হয়ে উঠবে।

অনেকে শিশুর খেলাধুলা পছন্দ করেন না। শিশুরা হৈ-চৈ করলে বিরক্ত বোধ করেন। কিন্তু শিশুরাতো শিশুর মতই। আমাদের মতো নয়। লাফালাফি হৈ-চৈ তাদের প্রকৃতিগত স্বভাব। তাদের এই স্বত:স্ফুর্ত স্বভাব প্রকৃতিতে বাঁধা প্রদান করলে শিশুর সুস্থ বিকাশ হবে বিঘ্নিত। শিশুদের স্বাভাবিক আচরণের প্রতি মহানবী (সঃ) এর আচরণের একটি উদাহরণ, " মহানবী (সঃ) যখন নামাযের সিজদা আদায় করতে যেতেন তখন প্রায় সময়ই তাঁর দুই নাতি ইমাম হাসান ও ইমাম হোসাইন তাঁর ঘাড়ে সওয়ার হতেন। ভাবটি তাদের এমন ছিল যে, তারা ঘোড়ায় চড়েছে। নবীজী তখন তাদের আনন্দ যেন নষ্ট না হয় সেজন্য তাঁর সিজদা দীর্ঘায়িত করতেন।" কাজেই শিশুদের কাজে, চিন্তায় খেলাধুলায় স্বাধীনতা দিতে হবে তবে সে স্বাধীনতা যেন বল্গাহীন ঘোড়ার মত না হয়। মনে রাখতে হবে, যে গৃহে খেলাধুলার সরঞ্জামাদি নেই সে গৃহ শিশুর জন্য এক সাহারা মরুভূমি। শিশুর দৈহিক ও মানসিক বিকাশের জন্য খেলাধুলার প্রয়োজন অপরিসীম। শিশু বিশেষজ্ঞ ছদরুদ্দীন বলেন," শিশুর স্বাভাবিক বিকাশের জন্য খেলার ততখানি প্রয়োজন, পুষ্প কোরকের জন্য সূর্যরশ্মি যতখানি।" বাবা-মা, ভাই-বোন সবাই হবে শিশুর খেলার সাথি। তবে এক বছরের শিশুর জন্য মা-ই তার যথার্থ খেলার সাথি। শিশুর বয়স দু'বছর শেষ হয়ে গেলে তখন তাকে তার সমবয়সী শিশুদের সাথে খেলতে দেয়া খুবই প্রয়োজন।

গৃহ পরিবেশের ব্যাপারে আমাদের সকলেরই যত্নশীল হওয়া প্রয়োজন। বাগানের মালি যেমন বাগানের চারাগাছগুলোকে যত্ন করে সতেজ-সজীব রেখে বড় করে তোলে এবং একদিন তাকে ফুলে ফুলে সুশোভিত করে তোলে ঠিক তেমনি করে আমাদেরকেও শিশুর মন ও দেহকে সুস্থ, সুন্দর, সবল ও সমৃদ্ধ করে তোলার জন্য বাগানের মালির মত ভূমিকা পালন করতে হবে। তাহলেই শিশুর একটি সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ এবং সেই সাথে একটি সম্ভাবনাময় পৃথিবীর প্রত্যাশা আমরা করতে পারবো।

কবিতা

আলাউদ্দিন আল আজাদের কবিতা*

লাইট হাউজ

১

কি এমন আফসোস অভিমান ছিল তুমি চলে গেলে, সব
হিসাব নিকাশ বিবেচনাধীন আয়োজন, সেরা বিশেষজ্ঞ
চিকিৎসকগণের কিস্‌কিস্‌ পর্যালোচনার ক্ষান্তি ছিলনা–
এইটুকু কৌশল যমের থাবার মধ্যেও রোগীকে কেমন
করে আয়ুষ্মান রাখা যায়, সে প্রযুক্তি বাঁধা টপ্‌ট্‌প্‌
অবিরাম পড়ছেই তো লবণের ফোঁটা, শিরা রক্তপ্রবাহ
টানে,
অনিচ্ছুক বারান্দায়
আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব সুহৃদ
প্রজন্মিক সাংবাদিকগণ–
একজন রাগী স্টাফ রিপোর্টার ভীষণ বিরক্ত, এত দেরি হচ্ছে
কেন মৌটুসির সঙ্গে ডেট অবহেলা মনে করলে কারবার
খতম, এবং অবিচুয়ারি লেখা আরেক ঝামেলা
এসব গোবদাগাবদা বলদা লোকের বাড়িতে
জন্ম তারিখটাও খুঁজে পাওয়া যায় না।

প্রখ্যাত হৃৎপিন্ডবিদ ঠোঁটের কোনে হেসে মন্তব্য করতে
করতে যাচ্ছিলেন; বাহ্‌ যেরকম ভিড় পত্রিকার কলাম বেশ
লম্বা হবে তা নি:সন্দেহ কিন্তু যে যত মারপ্যাঁচ খেলাই খেলুক না
ডাক্তারদের দোষী করতে পারবে না–
একটা মুমূর্ষু লোককে বিদেশগামী জাহাজে তোলার অনুমোদন
দিয়ে তাঁরা অপরাধী হতে যাবেন কেন-তাছাড়া উনিতো জীবিত নয়ই
শ্বাস প্রশ্বাসের যন্ত্রটা থামিয়ে দেওয়া মাত্রই বেমক্কা
অক্কা পাবেন!
আছে যখন থাকনা আরো কিছুক্ষণ, টরেটক্কা টরেটক্কা
টক্কা টরে টরে কবে উঠে গেছে! ছট্‌ ছট্‌ ছট্‌ ছট্‌
কেবা খোঁজ করে তার, আর ইমেইল করার চাইতে হাতের
পাঁচ আঙুলই আসল ভরসা
দু’চারটে চ্যাংড়া নেতাও গুণীজন খুঁজে বেড়াচ্ছে সবার আগে

---

* বিশিষ্ট গবেষক ও প্রাক্তন অধ্যাপক, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

মিডিয়া ধরতে।
(–কোরাস–
যাক্ যাক্ যাক্
যা ইচ্ছা করুক)

২
তুমি চলে গেলে, কেন গেলে কেন গেলে কঠিন অংক কষেও
ফল মেলাতে পারিনা; জ্যামিতি ত্রিকোণমিতি এলজেবরার
নিয়ম খুব হতাশায় থাকে চেয়ে, হার মানে আপেক্ষিকতা :
অবশ্য আমার মতো তুমিও বলতে অমাবস্যা গ্রাস করেছে
গর্ত কাঁকরভরা ঘনকৃষ্ণ তমসায় কেমন করে পথ
চলা যায়, দৃষ্টিতেও যায়না দেখা কিছুই, কি চাইবো?
কি করবো কামনায় কিঞ্চিৎ সুগন্ধ শুধু পাই, আঁচলের
উঁছলানো নাকেমুখে, অন্যকেউ নয়, নিশ্চয়ই চলে যায়
প্রিয়তমা। তারপর থাকে; কি আর থাকতে পারে? শূন্যস্থান!
শুনবে কি তুমি কোথাও থেকে, হতে পারে পাহাড় অরণ্যও
বলছি আন্ধারে আমরা ছুটছি কোদাল হাতে কাঁধে বেলচা
তোমাকেও যদি পেতাম গলায় গলায় টেনে নিয়ে যেতাম
যম বলে পাবে না কোথাও, কান বলে ভাঙা হাস্য তবে কার?
ছায়াও যদি হয়ে গিয়ে থাকো কোথা যাচ্ছ? বুঝি ধরা দেবেনা!

অমাবস্যাকে তুমি ঘৃণা করেছিলে এখন দেখছি তারও
চাইতে অধিক অন্ধকার! সূচিভেদ্য! ঝাপটা মারে বাড়তি
বাতাস, আকাশজোড়া নিবেসিত থরে থরে বজ্র থম্থম্
উত্তাল সাগর কল্কল্ ছল্ছল্ বিজলির চক্ষুতারা
বারবার করে ঝিক্মিক্, দানবিক পাখা ঝাপটিয়ে একি
মহাঝটিকার সংকেত! আমাদের ধ্বংস করে এত শক্তি কার ?
উঠছে নামছে তরঙ্গে তরঙ্গে আমাদের লঞ্চ, না ডুবতে
দেবোনা দেবোনা। শক্ত করে ঘোরাও হে সারং তোমার চাকা–
ওই জ্বলছে নিভছে স্তম্ভ বাতিঘর দুর্যোগবিদারী আশা:
এযে বিস্ময় হে বন্ধু আমরা দু:সাহসী হতেই এসে যাই–
একি! মহাগ্রন্থশালা। তুমি সমাপ্ত। বই সাজিয়ে বসে আছ –
বল্লে আমায় ‘তোমার লেখা স্বর্ণশস্য পতাকা উড়িয়ে যাও’
(–কোরাস–
যাও যাও যাও
মশাল জ্বালাও)

আবুল হাসান মুহাম্মদ সাদেক*

হে ফেব্রুয়ারি তুমি ফাল্গুন হও

হে ফেব্রুয়ারি তুমি ফাল্গুন হও।
হে ফাল্গুন তুমি অন্য কিছু নও।

হেথা মোদের ভাষার তরে
কতো শহীদের রক্ত ঝরে
আজি মোরা বৃথা যেতে দেবো না তারে।
হে মম জাতি নন্দিত তুমি নিন্দিত নও
হে ফেব্রুয়ারি আজি তাই ফাল্গুন হও।

হে দাদী, তুমি বাবা হও।
তুমি তো বাবা মোর, তুমি ফধফফু নও।
হে মোর জন্মদাতা জন্ম দিয়েছো তুমি
লালন করেছো অতি যতনে ধন্য আমি।
কিন্তু হায়
ওরা ঠেলে দিতে চায়
তোমা থেকে আমায়
বহু দূরে
পিতা-পুত্রের সীমানার ওপারে।
হে পিতঃ, তুমি বাবা হও
তুমি আমার দাদী নও।

হে মামী, তুমি মা হও
তুমি আমার মা, সঁসসু নও।
তুমি ধরেছো মোরে উদরে
শত কষ্টে শত যাতনায়
তিলে তিলে সয়েছো অনেক বেদনা

---

* ভাইস চ্যান্সেলর, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ।

লালনে পালনে।
আজ নিষ্ঠুর ওরা
ঠেলে দিতে চায় আমাকে
তোমা থেকে অনেক দূরে
মিটাতে চায় মম ধরাকে
জননী আমার মাকে।
হে মা, তুমি মামী নও
তুমি আমার মা হও
মা হয়েই থেকে যাও
মম ভুবনে।

হে মোর প্রিয় দেশ, হে মোর জাতি
তুলে ধরো আজ নিজ পরিচয়
উঁচু করো ঝাণ্ডা
ভেঙ্গে দাও জিঞ্জির
দূর হোক শিকল মানসিক গোলামীর
দাঁড়াও বিশ্বে উন্নত শির।
তোমারই থাকুক তোমার ভাষা
মন মনন সংস্কৃতি।
হে মম কৃষ্টি নন্দিত তুমি নিন্দিত নও
তবু আজি কিসের লাগি
পর রঙ্গে রঞ্জিত হও।

হে মোর জাতি, তুমি তুমিই হও
তুমি প্রাচ্য নও, প্রতিচ্য নও।
তুমি ডান নও, বাম নও।
তুমি তুমিই
তুমি শুধুই তুমি হও।
হে ফেব্রুয়ারি আজি তুমি ফাল্গুন হও।

প্রত্যয় জসীম*

সালাম আমাদের ভাষামানব

আশাপাখি ভাষাপাখি সবপাখি পুষে রাখি
প্রাণের গভীরে-বুকের পাঁজরে পাঁজরে
রফিক বরকত জব্বার সালাম-
স্বাধীনতার প্রথম সূচক-মুক্তির কালাম
তোমাদের জন্য কান্না ঝরে অঝোরে...
তোমরা ভাষামানব দিয়েছো বাঙালিকে আশা
বাংলাভাষা আজ বিশ্বজুড়ে সর্বমানব ভাষা
একুশ আজ কেবল বাঙালির ভাষা দিবস নয়
একুশ আজ মাতৃভাষা দিবস-বিশ্বময়...
সালামের গ্রাম সালাম নগর আজ বিশ্বগ্রাম
রফিক-জব্বার-বরকত মানে অবিনাশী সংগ্রাম
তোমাদের মুখ আজ সব বাঙালির মুখ
তোমাদের শোণিত ধারায়-পেয়েছি মুক্তির সুখ...
একুশের মিনার আজ বিশ্ববাসীর মাতৃভাষা মিনার
ভাষা শহীদ তোমরা আমাদের-ভাষামানব-ভাষামিনার।

* গবেষক, প্রাবন্ধিক, কবি।

সামসুজ্জোহা*

স্বরূপা চন্দ্রমুখী

বাংলাদেশ
তুমি ধনবতী, রূপবতী, স্বরূপা চন্দ্রমুখী
তোমার অমলিন রূপে ঐ পাকিস্তানি –
ঘাতকের দল হয়েছিল ফেরারী।
স্বজাতি মোদের হয়েছিল অমিত্র বাহিনী
তোমার পূর্ণোপমা করিতে বধ
জেগেছিল ওদের বুকে
একটুখানি সাধ।

তোমার বুক ভরা ফসলের দোলা
দু'চোখ ভরা মাছের খেলা
আর মন মাতানো পাখির গান
ওরা চেয়েছিল করিতে নিস্প্রাণ।

সব লুটে-পুটে তোমায় চেয়েছিল
পড়াইতে ভিক্ষার ঝুলি
পাইতে তাদের দ্বারে
তব ভিক্ষারিণী।

তোমার বীর সেনারা কেমন করে
বরিবে মায়ের যন্ত্রণাকে,
তাই ত ওরা জেগেছিল বাংলা বলে
শিকারী বাঘের সাজটা পরে।
চক্ষু সব অগ্নি চাকা
শীর নুয়েছে শত্রু যারা।

---

* শিক্ষার্থী, বাংলা, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ।

জাহানারা খান*

মায়ের কথা

খোকা মোর যুদ্ধে গেছে সেই একাত্তুর সনে,
কত-দিন কত-রাত ঠিক নেই তা মনে।
হাজার বার দিনে গুণি তবু হয় ভুল,
আয় খোকা ঘরে আয় খালি মায়ের কোল।
যুদ্ধে গেলে মাকে বুঝি যেতে হয় ভুলে,
তোর লাগানো বকুল গাছ ভরেছে ফুলে ফুলে।
তবু তুই ফিরবিনে! আসবিনে এ ঘরে,
তোর তরে যে দুঃখিনী মা কেঁদে কেঁদে মরে।
বিদায় বেলা বলেছিলে– আমায় মনে হলে,
বসো যেয়ে মাগো তুমি ওই বকুল তলে।
তাই তো আমি প্রহর গুণি বকুল তলে বসে,
কেউবা আমায় পাগলী বলে কেউবা মুচকি হাসে।
সব স্মৃতি ভুলে গেছি মনে আছে একটি কথা,
পাক-সেনাদের নির্মম আর নিষ্ঠুর বর্বরতা।

মাসুমা আকতার*

শূন্যতা সংজ্ঞাহীন

শূন্যতার নাকি কোন সংজ্ঞা নেই। কিন্তু–
তিক্ততায়, শিক্ততায়, অভিজ্ঞতায় অবশেষে জানি
আমি– তারও একটা সংজ্ঞা আছে।
হারানোর বেদনায় থাকে শূন্যতা-
না পাওয়াতে থাকে শূন্যতা-
বেদনাহীন জীবনেও থাকে শূন্যতা-
বসবাস তার মনোবিন্দুতে।
সৃষ্টে উঠে সে, আত্মার প্রকৃতিতে-
ঘুরে বেড়ায় সে, অবয়বের প্রতি কণায়-

* শিক্ষার্থী, বাংলা বিভাগ, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ।

*শিক্ষার্থী, বাংলা বিভাগ, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ।

শূন্য মূর্তি ধরে। তারপরও-
শোনা যায়, শূন্যতা সংজ্ঞাহীন।

মোঃ ফিরোজ হোসেন রিতু*

অনির্বাণ (সনেট)

দৃষ্টি মেলে তাকাও, ধরণী পরে চাও,
খাদ্যাভাবে শিশুর রোদন, খুন-হত্যা;
অসহায়, নিষ্পাপ বালিকা নির্যাতিতা
নিদ্রিত তুমি? আশ্চর্য! কেমনে ঘুমাও?
শোষণের জাতাকল করছে পেষণ
সম্পদ লোভে কত দেশ আজ লুণ্ঠন।
লালসা! সন্তান হারা মার আর্তনাদ
সভ্যতা, মানবতা ক্ষয়িষ্ণু বরবাদ॥

নিদ্রাকে ছুটি দাও, উঠ - হও জাগ্রত
অবিচার, অত্যাচার কর প্রতিহত।
কর বিদ্রোহ ঘোষণা, শুরু হোক যুদ্ধ
আত্ম তৃপ্তিতে দোহাই থেক না আবদ্ধ;
কি হবে? যায় যাবে ন্যায়ের তরে প্রাণ,
তবু জ্বালিয়ে যাও সত্যের অনির্বাণ॥

মোঃ জিয়ারুল ইসলাম*

সংশোধন

কি করলাম জীবনটা হায়, ফিরে পাবার নয়–
এ জীবনের দুঃখগুলো মোচন করার নয়।
যা করেছি ভুল করে নাইরে কিছু নাই,
এ ভুলের সংশোধন হবে কখন রায়।

যদি জানতাম এ ভুলের হবে না কখনো সংশোধন,
তবে যে করেই হোক করতাম মনের বোধন।
পরেছি এ ভুলে যখন ফিরে আসার নয়,

* শিক্ষার্থী, সরকার ও রাজনীতি, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ।
* শিক্ষার্থী, স্যোসিওলজি এন্ড এ্যানথ্রোপলজি, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ।

মরনের পরে যদি ভুল সংশোধন হয়।

মুহাম্মদ জুবায়ের রহমান চৌধুরী*

ধরণী

নিজেরই অজান্তে সবার অলক্ষ্যে
কোন এক শুভ কিংবা অশুভ মুহুর্তে
ধীরে ধীরে টের পেলাম বেদনার ছায়া
সুখে বা দুঃখে আগলে রেখেছে

তবুও উদাসী এক মানুষ আমি
পথ ভোলা পথিকের ন্যায়
ছুটে চলেছি, তুমিও চলো আমার সাথে
দুঃখিনীর দু'চোখের অশ্রু মুছে দিতে

চাই কিছু বিশুদ্ধ মানুষ
ভোরের সূর্যটাকে রাঙাতে
চাই কিছু অতৃপ্ত আত্মা
পৃথিবীটাকে নতুন করে সাজাতে

চলো নিজেকে আলোকিত করি
নয়া দিগন্তের পথ উন্মুক্ত করে
সাজিয়ে ফেলি আমাদের এই অগোছালো
স্বপ্নীল স্বর্গযোগ্য ধরনীকে।

* শিক্ষার্থী, বাংলা বিভাগ, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ।

মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম*

কর্মের বেদনা

হয়ত আমায় তোমাদের মাঝে যাবে নাতো দেখা,
তাই হৃদয়ের মাঝে ধারণ করি মানচিত্রের রেখা।
একটার পর একটা হয় সমস্যার উদ্ভাব,
বর্তমান যুগে বেশির ভাগ ঘটে অন্যায়ের প্রভাব।
একটু থামে ফের ছুঁটে যায়,
কি করে প্রতিপক্ষকে হারায়।
শান্তিভাবে কাজ নাহি করে,
এক জনের ঘাড়ে আর একজন পরে।
এভাবে দিনের পর দিন চলে যায়,
কাজের মধ্যে শান্তি নাহি খুঁজে পায়।
মুখের সামনে জিনিস-পত্র মেরে যায় চলে,
বেয়দবী হয়ে যাবে কেউ যদি তা উল্টে ফেলে।
নিরপরাধ মানুষের হাহাকার,
সুস্থভাবে কাজ করার নেই কি তাদের অধিকার।
নির্যাতন আর নিষ্পেষণের ভয়ে তারা মুখ নাহি খোলে,
মুখ খুললে তাদের যায় চাকুরীটা চলে॥

* শিক্ষার্থী, বাংলা, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ।

মোঃ কামরুজ্জামান*

তুমি যদি চাইতে

তুমি যদি চাইতে
ছিনিয়ে আনতাম আমি তোমাকে
ঝড়-বৃষ্টি-প্লাবন তোমাকে আটকে রাখার মত
যত নরপশুর বাধা আসুক না কেন?
সবকিছু ভেঙ্গেচুড়ে হৃদয়ের ভালবাসা দিয়ে
বেধে আনতাম আমি তোমাকে।

তুমি যদি চাইতে
অথৈ সাগর আমি দিতাম পাড়ি
তুমি সাগর হয়ে আমায় ভাষাতে
আমি অনিন্দ সুন্দর তোমার বুকে সুখের প্রহর কাটাতাম
আমি মেঘ হয়ে আকাশের বুকে চলে যেতাম
আবার বৃষ্টি হয়ে নেমে আসতাম তোমার বুকে॥

* শিক্ষার্থী, বাংলা, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ।

শাহিদা খানম*

হে মহামানব

হে মহামানব–
যে আলো তুমি জ্বেলে গেছ,
তার নিচে দাঁড়িয়ে থাকার যোগ্য আমি নই।
দীপ্ত সাধ জাগে–
তোমার জ্ঞানের জলে,
আমার হৃদয় জুড়াই।
দূরুদ পাঠে রমজানের রাতগুলো–
হয়ে থাক তোমার নূরের আলোয় আলোকিত,
এই সুন্দর পৃথিবীতে ফুটুক আরো মানবতার
জ্যোতির্ময় ফুল।
তারা গেয়ে যাক তোমার শ্রেষ্ঠ দূরুদ,
আমি বন্দী শিকল ভেঙ্গে–
জেগে থেকে আমার আঁচল ভরাবো তোমারি
আলোর ফুলে।
জীবনের অন্তিমে সারাটা পথ যেন
তোমারি আলোয় চলে যেতে পারি–
হে মহামানব।

* কো-অর্ডিনেটর, দূরশিক্ষণ ও মানবিক বিজ্ঞান বিভাগ, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ।

এম. নাজেম উদ্দীন ছানবী*

প্রত্যয়ী হবো

স্বপ্নের পৃথিবী–
শকুনিরা ওৎ পেতে থাকে
লুণ্ঠিতে আধার,
কখনো গ্রাসে করুণ শ্বাসে ,
কখনো হায় রাক্ষসী ত্রাসে–
লুণ্ঠিত, দলিত,
আমার পৃথিবী ॥

সুদ, ঘুষ দুর্নীতির স্রোতে–
ভেসে বেড়ায় মুখোশধারী,
বলে-এত হাদিয়া জনাব!
বেঁচে থাকার সরল পথ!
নাহ্, এসেছে সময় রুধিতে তাদের–
ভেঙ্গে দিতে সব কালো হাত,
আবার প্রত্যয়ী হবো মোরা
নব সু-প্রভাত ॥

* শিক্ষার্থী, বাংলা বিভাগ, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ।

এস এম ত্বাহা*

ভালবাসার কবিতা

প্রতিটি মানুষের মাঝে কোথাও না কোথাও
একটা হৃদয় আছে,
দুই চোখের পেছনে আছে এক বিশাল সমুদ্র
আর মনের মাঝে আছে –
এক বিশাল তারা ভরা আকাশ। এই দুই বিশালতার
মাঝে যখন,
হৃদয়টা এসে বসে, সৃষ্টি হয় তখন কবিতার।
এই কবিতাগুলোর তখন নাম হয়
"ভালবাসা"
চার অক্ষরের ছোট্ট একটি শব্দ
কিন্তু –
এই ছোট্ট শব্দই হতে পারে অন্তহীন আকাশের মত
হতে পারে গভীর সমুদ্রের মত।
এই একটা শব্দ জুড়ে দিতে পারে
এক অদৃশ্য সম্পর্ক
প্রকৃতির সাথে, মানুষের সাথে,
আর তোমার সাথে।

* শিক্ষার্থী, বি বি এ, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ।

জামসেদ ওয়াজেদ*

ভালো আছি অসহ্য রকম

তোমাকে বিশ্বাস করে ভাল আছি অসহ্য রকম
বরফ সকাল তাই ক্ষয়ে ক্ষয়ে হয়ে উঠে দিন
রমণীয় ভুলগুলো শুদ্ধ করে পৃথিবী প্রবীণ
আমাকে চেননা তুমি; তোমাকে তো চেন আরো কম॥

প্রিয় ফুল প্রিয় পাখি রোদখেকো এই বরষায়
আহত বৃষ্টিতে ভিজে তুমি হও বেহেশতি হুর
মুখোমুখি সময়েরা পালিয়েছে আজ বহুদূর
কষ্টের তছবি গুণে অপেক্ষার দিন কেটে যায় ॥

এখন রাতের মতো দিন জুড়ে শুধু অন্ধকার
সুখ নামে আলো খুঁজি পৃথিবীর জমিনে বাতাসে
সুখেরা বেড়াতে গেছে মাটি ছেড়ে দূর মহাকাশে
সুদীর্ঘ চুলের ঘ্রাণে নেমে আসে মহা-অবতার ॥

আপন পৃথিবী জুড়ে প্রিয় মুখ হয়ে উঠে লাল
যুগল জ্যামিতি ভেঙ্গে সাঁতরায় সময় মাতাল ॥

---

* সম্পাদক, জলছবি (প্রাক্তন শিক্ষার্থী), বাংলা বিভাগ, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ।

রবিউল আলম ফিরোজ*

সুচিত্রাকে সন্ত্রাসী প্রেমিক

পলকে থমকে যাবে সাগরের যত জোয়ার,
চাঁদ জোছনা দুনিয়াতে কেউ দেখবেনা আর।
হু হু করে আসবে নেমে নূহের সেই প্লাবন,
বিকিয়ে দেবো সবুজ শ্যামল বন-কানন॥

শূলে চড়ানো সেই ঘটনা আবার পৃথিবীতে,
ছড়িয়ে পড়বে এ মন যদি চাও ভেঙ্গে দিতে।
স্থির হয়ে যাবে পৃথিবীগোলক এক নিমিষে,
নক্ষত্র সব হোঁচট খাবে খুঁজে পাব না'কো দিশে॥

আগুন জ্বলবে ফুলের বনে পুড়বে হিরোশিমা,
নাগাসাকি আর মরবে ইহুদ ছড়াবে দ্রোহিমা।
প্রশান্ত আর আটলান্টিক কিংবা ওই ভারত,
সব সাগরের জল শুকাবে এমন গভীর ক্ষত॥

আসবে আবার হামান কারুণ নিষ্ঠুর ফিরাউন,
ধ্বংস-যজ্ঞ আঁকবো বুকে সমাজে লাগাবো ঘুণ।
বিসুভিয়াসের লাভার মতো আমার বুকের জ্বালা,
তোমার আমার এই বাংলাদেশে ঘটাবে কারবালা॥

কিছুই ঘটবে না এসব হবনা কু-কর্মের কাজী
সুচিত্রা যদি হেসে বলে–"ভালবাসতে আমি রাজি"

* শিক্ষার্থী, ইসলামের ইতিহাস ও সভ্যতা বিভাগ, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ।

প্রেমাংশু শংকর মালো*

জীবনের চেতনা

চলছে মানুষ ঘুরছে চাকা
দেশ বিদেশে আঁকাবাঁকা,
দেশের নামে হচ্ছে কথা
রাজনীতিতে মাথাব্যথা ॥

ব্যথার ব্যথী হচ্ছে কারা
দুঃখে যাদের জীবন গড়া,
গড়বে জীবন কি করিয়া
জীবন গেছে ক্রুদ্ধ হইয়া॥

বড় বড় বোয়ালেরা
হাতছানি দেয় লোভ দেখিয়া,
লোভের নেশায় যাচ্ছে যারা
শুষ্ক নদীর রোধীর ধারা ॥

ধনীর বুকে পড়ছে ধরা
মরছে তারা অচিন পাড়া,
যেও নাগো হাত ছানিতে
জীবনটাকে অক্ষম করতে
কর্মজীবি হয়ে পড় –
সুখের চেয়ে দুঃখ বড়॥

* শিক্ষার্থী, বি এস এস, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ।

মো ঃ শহীদ দাদ খান*

জামাই আদরে পাটশাক

জামাই আদরে প্রকৃত ভূমিকা কম বেশি কার,
এ নিয়ে তর্কের সীমা অতিক্রম করে যায় বার বার।
শ্বশুর হাকে আমার ভূমিকা মূখ্য বলে সবাই জানে,
এ কারণে জামাই বাবা শ্বশুরের সব কথাই মানে।

কিন্তু শাশুড়ির কথা যদি জামাই বাবা ভুলে যায়,
তুলতুলে ভুড়ি চুপসে সে মরবে নির্ঘাৎ ক্ষুধার জ্বালায়।
খাদক জামাই একদা গেল স্বাদের মজার শ্বশুর বাড়ি,
খাবারের লোভে শাশুড়ির পাছে চলে তার ঘুরাঘুরি।

লোভনীয় খাবারের ভীরে ডাইনিং টেবিলে নেই ফাঁক,
অগুনতি আইটেমের পরে সেথা যোগ দিয়েছে পাটশাক।
শাকের পর শাক দিয়ে সাড়ছে শাশুড়ি জামাইর ভোজ ,
ক্ষুধার্ত জামাইর চোখে আগুন -বলে, আমিতো আসি না রোজ।

আবার যখন শাকের পালা জামাই বলে উঠলো তেঁতে
পাটের ক্ষেতটি দেখিয়ে দিলে নিজেই যাব পাট ক্ষেতে৷৷

---

* শিক্ষার্থী, সরকার ও রাজনীতি বিভাগ, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ।

আসমা আক্তার*

তোমায় নিয়ে

বন্ধু তোমার ভালবাসা মনে বাধে আশা,
তাই তো বন্ধু তোমায় নিয়ে বাধব সুখের বাসা।
সেই বাসাতে থাকব মোরা ছোট্ট টোনাটুনি,
হেসে খেলে দিন কাটাবো তুমি আর আমি।
তুমি আর আমি মিলে বিশ্বাসেরই শেকড় দিয়ে,
তৈরী করবো নতুন কিছু তাজমহলে গিয়ে।
তোমায় নিয়ে বন্ধু আমি যাব মেঘের দেশে,
মেঘের টিপ পড়িয়ে দিও আমার কপোলেতে।
তোমায় নিয়ে বন্ধু আমি গড়বো সুখের নদী,
সেই নদীতে ভেসে যাবো তুমি আর আমি।

* শিক্ষার্থী, বাংলা বিভাগ, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ।

মোঃ আবুল কালাম আজাদ*

মা

শ্রদ্ধা করি মাকে আমি ভক্তি করি তাকে,
ধন্য আমায় দিতে হয় যে সৃষ্টি বিধাতাকে।
পৃথিবীতে দামি জানি দামি আমার মা,
কলিজা কেটে খাইয়ে দিলেও–
তাঁর ঋণ যে শোধ হয় না।
জন্মেই দেখেছি প্রথম যে আমার মাকে,
ধন্য মাটি ধন্য জীবন ধন্য বিধাতাকে॥

* শিক্ষার্থী, বাংলা বিভাগ, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ।

মোঃ জহিরুল ইসলাম জুয়েল*

শ্রাবণের খরস্রোতা নদী

তুমি কবি হলে
আমি হব তোমার কবিতা
তোমার বুকের ভেতর জমে থাকা আবেগ হয়ে
আমি ঝরবো
আমাদের মাঝে হবে গভীর সম্পর্কের হৃদ্যতা
তুমি আষাঢ়ের মেঘে ঢাকা আকাশ হলে
আমি শ্রাবণের খরস্রোতা নদী হবো
তোমার স্পর্শ আমার দু'কূল ভাসিয়ে নিয়ে যাবে
পরিপূর্ণ হবে আমার হৃদয়ের ষোলআনা
তুমি বসন্তের ফুল হলে
আমি ভ্রমর হয়ে তোমাকেই খুঁজব অনন্ত
হৃদয়ের গভীর মমতা ভরে
রাখব তোমায় মনের ছোট্ট কুটিরে
তুমি আমার হলে আমরা দু'জনে করব
দু'জনের ভেতর বসবাস
তোমার হৃদয় জমিনে ফোটাব
আগামীর ফুল॥

* শিক্ষার্থী, বাংলা বিভাগ, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ।

মোহাম্মদ আবুল কালাম*

দু'টি বোন

সুখের লাগিয়া কেঁদে ফিরি আমি–
সুখ নাহি ধরা দেয়,
এর চেয়ে বড় হতাশা
আর না দেখা যায়।
টিয়া পাখির মতই আমি খাঁচায় বন্দী থাকি ,
সুন্দর এই পৃথিবীর পরে কত আয়ু আছে মোর বাকি।
মীযানের পাল্লায় নেকী বেশি দিয়ে,
প্রভু , নিও মোরে কোলে তুলে।
আমার বড় আদরের দু'টি বোন মিলে
বাবা মায়ের মনটা দিবে ভরে
বোঝা হয়ে তারা রবে না জানি
নতুন নতুন বিদ্যা শিখে
হবে তারা বিশ্বজয়ী ॥

---

* চাকুরিজীবী, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ।

মোঃ শহিদুল ইসলাম রনি*

ভোলা মন

আজ ডাকিয়া ডাকিয়া প্রভাত যাবে
নিত্য নতুন সরাব সুরে
বাজবে গগন গভীর তানে
ছন্দ মেতে বেহুশ রবে
তোমার সজাগ প্রাণ।
ওগো ডাকিয়া যাও এমনি করে
মন্দক্রান্তি ছন্দ এঁকে
সকল বাঁধা যাবে টুটে
স্তব্ধ সন্ধ্যা পেরুয়ে যাবে
আজকের ক্ষ্যাপা গান।
মেতেছে সকল রবি শশী
বায়ুচক্রে আসবে কবি
মগ্ন তোমার প্রাণ,
পাবে যে আজ পরম সে সাজ
তোমার পাগল প্রেমে
ওগো সকাল দুপুর ডাকিয়া যাও
এমনি ভোলা মনে।

* শিক্ষার্থী, ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগ, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ।

শ্যামল কুমার বিশ্বাস*

কবে পাবো তোমাকে?

তোমাকে আপন করে কবে পাবো বলোতো?
একটি করে দিন চলে যায়, তারপর মাস পেরিয়ে বছর–
আমি অপেক্ষায় গুণি সময়ের প্রতিটি প্রহর ।
সব বাঁধা ভেঙ্গে তুমি আমার হবে, একান্তই আমার
আমার আরশিতে বধূ বেশে কবে ধরা দিবে বলোতো?
আমি গুণে গুণে ভুল করে আবার যে তা গুণি
কবে শেষ হবে আমার চাওয়া, না জানি আমি না জান তুমি।
তবুও আশায় থাকি হয়তো অচিরেই পাবো তোমায়,
হয়তো বেশিদিন নয় আমি তোমায় পাবো নিশ্চয়।
শিয়রে জ্বালিয়ে বাতি দু'জনে মিলে জাগব রাতি
হাতে রেখে হাত আবার কবে বলোতো?
হবে ভালবাসাবাসি হবে মধুর মিলন দু'জনে
দু'টি দেহ এক হবে, হবে মিলন দু'টি মনে মনে।
বুকের গহীনে পুঞ্জীভূত ব্যথা-বেদনার হবে অবসান
সখি তোমার তরে সপিব আমার এই মন প্রাণ।
সখি তোমার দু'চোখে রেখে মোর দুই চোখ
আকুণ্ঠে পিয়োবো মর্তলোকের যত আছে সুখ
সখি কবে হবে সেই মধুর লগন -বলোতো?
বিরহের এই কণ্টক পথ পাড়ি দিয়ে
আমার এই মরুসম বুকে মুখ লুকিয়ে
ভালবাসার বিশুদ্ধ সরোবরে তুমি আবার কবে
অবগাহন করবে বলোতো?

---

* শিক্ষার্থী, বাংলা বিভাগ, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ।

গল্প

সেলিনা হোসেন*

ধারণা

ছাব্বিশ বছরের তনুশ্রী পঁচাশি বছরের ফখরুল আহমদ চৌধুরীর প্রেমে পড়েছে।

তনুশ্রীর যুক্তি একটাই, না আত্মীয়স্বজন বা বন্ধুবান্ধবের কাছে এর কোন জবাবদিহির উত্তর এটা নয়। নিজের সঙ্গে বোঝাপড়ার সময় এই যুক্তি দাঁড় করানো একসময় দরকার ছিল ওর। এখন আর যুক্তি টুক্তি লাগে না। নিজেকে সামলে ফেলেছে। এখন সত্যিটা ভারী সুন্দর।

ওর যুক্তি ভদ্রলোককে দেখতেই বুড়ো দেখায়। কিন্তু তার আচরণে,ভাষার প্রকাশে এবং যৌন আকাংক্ষায় তার মধ্যে তারুণ্যের দীপ্তি জ্বলজ্বল করে। তার সঙ্গে কমিউনিকেশনে অসুবিধা নেই। চমৎকার ভঙ্গিতে পুরো আবহ এমন মোহনীয় করে ফেলে যে মুগ্ধতার রেশ কাটে না।

আর বয়স? বয়সের ভারে ভারাক্রান্ত তো একজন যুবকও হতে পারে, যার ভেতরে সৃষ্টিশীল উচ্ছাস একদমই অনুপস্থিত! বয়সে কিছু এসে যায় না।

অতএব তনুশ্রী আপন ভাবনায় মশগুল। ফখরুল আহমদ চৌধুরী ওকে নিবিড় কণ্ঠে বলে, সম্পর্ককে কখনো বিয়ে নামক ইন্সটিটিউশনে ঠেসে ফেলা উচিত নয়। সম্পর্ক হবে সীমাহীন, রঙিন এবং রঙের রেশমি সুতোয় সম্পর্কের প্রতিটি গিটঠু হবে অমলিন। এই গিটঠু খোলার সাধ্য কারো নেই। বুঝলে হিরের টুকরো। তোমার হাতটা দাও আমি ধরে রাখি। তোমার হাতটা বড় পবিত্র, মায়াবী এবং স্নিগ্ধ। তোমার হাত ধরলে আমার সমস্তশরীর অবশ হয়ে যায়। মনে হয়, কেউ যেন আমার মাথার কাছে বসে আমাকে ঘুম পাড়িয়ে দিচ্ছে। আমি ঘুমুচ্ছি, ঘুমুচ্ছি-ঘুমে তলিয়ে যাচ্ছি। আমার জীবনে ঘুমের খুব অভাব রে মেয়ে।

এসব কথায় অভিভূত হয়ে যায় তনুশ্রী। অপলক তাকিয়ে থাকে মানুষটির দিকে। তখন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনায় ধানমণ্ডির লেকে। পাখিদের ডানায় ঘরে ফেরার তাড়া। তনুশ্রীর শরীরে শিহরণ–এমন মানুষইতো চাই, যার যৌবন উদ্দীপিত করে দেয় শরীর ও মনের সবটুকু। বয়সের হিসেবে গরমিল হলে হোক, কিছু এসে যায় না। তনুশ্রী জানে অন্ধকার নামলেও ও মানুষটির সবটুকু দেখতে পায়। এত গভীর

---

* কথা সাহিত্যিক ও প্রাক্তন পরিচালক, বাংলা একাডেমী।

দৃষ্টিতে দেখে রেখেছে যে দেখায় ভুল হয় না। তার গালভাঙা মুখে ক্লান্তির ছাপ, বয়স তাকে ছুঁয়েছে এটুকুই। আর কোথাও নয়। তার প্রশস্তকপাল, ফাঁকা হয়ে গেছে মাথার অনেকখানি, ফ্যাকাশে লালচে চুল পুরোটা সাদা নয়। জোড়া ভুরু, ফর্সা গায়ের রঙ এবং টানা ঋজু ফিগার–শুকনো কিন্তু ভাঙা নয়। আশ্চর্য ভরাট কণ্ঠে দারুণ আবৃত্তি করে রবীন্দ্রনাথ।

একদিন কলেজের শিক্ষক ছিল। বলে, তনুশ্রী, পড়ানো ছাড়া আমি আর কিছু পারতাম না। সাহিত্য পড়াতো মানুষটি। ইংরেজী সাহিত্য। টি.এস.এলিয়ট তার প্রিয় কবি। অন্য ক্লাশের ছেলেমেয়েরাও এসে তার ক্লাশে ভরে যেত। মুগ্ধ হয়ে শুনতো তার লেকচার।

তনুশ্রী বিস্ময়সূচক ধ্বধ্বনি তুলে বলতো, তখন কেন আমার জন্ম হয়নি। কেন আমি সে সময়টুকু পেলাম না!

হাসিতে পৌরুষের রেশ ছড়িয়ে লোকটি বলে, আমার এখনকার সময়ের সবটুকু তোমাকে দেবো বলেই তখন তোমার জন্ম হয়নি।

তনুশ্রী এমন উত্তরে ধাক্কা খায় না। ভাবে না যে, তাহলে কি মানুষটি তার জীবনের এক এক সময়ে এক এক জনকে পেয়েছে? যারা বিশেষ বিশেষ সময়ের ব্যবধানে তার জন্য জন্মগ্রহণ করেছে?

মুগ্ধ তনুশ্রীর বুকের ভেতরে প্রশ্ন নেই। তার একটি কারণ আছে। লোকটির অনেক গল্প আছে। সে গল্পগুলো তনুশ্রীর সবই জানা। তার তিন ছেলেমেয়ে অসাধারণ মেধাবী। বিদেশের নামী বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ায়। খুব কমই দেশে আসে। বেশিরভাগ সময় বাবাকে নিয়ে যায় ওরা। স্ত্রী ছিলেন বিদূষী নারী। সভা-সমিতি, নারী সংগঠন, লেখাপড়া, চাকরী ইত্যাদি নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। সেই সঙ্গে দক্ষ ব্যবস্থাপনায় ঘর-সংসার দেখতেন। তার কোন খুঁত ছিল না। বাবার কাছ থেকে একটি চমৎকার বাড়ি পেয়েছিলেন ধানমণ্ডিতে। তার বাড়ির গোলাপ বাগান মানুষের আলোচনার বিষয় ছিল। সেই স্ত্রী বছর দুই আগে মারা গেছেন। স্বামী-স্ত্রীর প্রেম নাকি রাধা-কৃষ্ণের প্রেমের চেয়েও বেশি ছিল।

এতকিছু শুনে তনুশ্রীর তৃষ্ণা বেড়ে যায়–ভালবাসার সরোবরে ডুবে যাওয়ার তৃষ্ণা। কলেজে পড়ার সময় একটি ছেলে ওকে ভালবাসার কথা বলেছিল, কিন্তু এমন করে বলার সাধ্য ওর ছিল না। সেইসব কথা তখন শুনতে বেশ ভাল লাগতো, কিন্তু এখন ফখরুলের কথা শুনে মনে হয় কি অবান্তর পানসে কথা ছিল সেগুলো। মনে করলে হাসি আসে। এখন আপন মনে হেসে নিজেকে করুণা করে। শুধু এটুকু নয়, করুণা করার আরও একটি জায়গা আছে ওর। কলেজে পড়ার সময়ই দুর্ঘটনাটি ঘটে।

সেবার কলেজ বন্ধ ছিল। নানার অসুখের খবর শুনে ওর মা ওর কাঁধে সংসারের দায়িত্ব দিয়ে তড়িঘড়ি বাবাকে দেখতে যায়। ছোট পাঁচ ভাই বোনের দায়িত্ব নিয়ে সে বেশ হিমশিম খাচ্ছিল। একদিন রান্না করার সময় জামা এবং ওড়নায় আগুন লেগে ওর দু'হাত এবং ঘাড়-গলা পুড়ে যায়। বেঁচে থাকার কি দীর্ঘ সাধনা করতে হয়েছিল ওকে। এখন ভাবলে শরীর হিম হয়ে যায়। শারীরিক এবং মানসিক যন্ত্রণার ভিতরে দুঃসহ দিনরাতের কথা এই মানুষটির সান্নিধ্যে আসার পরইতো ভুলতে পারছে। মানুষটি ওকে এই সবকিছুর বাইরে নিয়ে যায়। বলে, জীবনের কোন পরাজয় নাই। সবটাই অভিজ্ঞতার সঞ্চয়। এইসব সঞ্চয় তিল তিল করে মানুষের বেঁচে থাকার নানা অর্থ তৈরী করে।

তনুশ্রী আচমকা প্রশ্ন করে, যে ছেলেটি আমাকে ভালবাসার কথা শুনিয়েছিল সে তো একদিনও আমার সঙ্গে দেখা না করে বিনা দ্বিধায় আমাকে ছেড়ে চলে গেলো।

তাতে তোমার কোন পরাজয় নেই। লজ্জা ওর। ছোট হলে ও হয়েছে। ও নিজের কাছ থেকে পালাতে পারবেনা শ্রী। যে আগুনে তুমি পুরে গেছ তারচেয়েও কঠিন আগুনে ও নিজেকে দহন করবে।
সত্যি? ও এমন শাস্তি পাবে?

একদম সত্যি। শাস্তি ও পাবেই শ্রী। তখন তনুশ্রীর মুহূর্তটি হাওয়াই বাজির ফুলকিতে ঝলসে উঠে। সেইসঙ্গে মানুষটির কণ্ঠে শ্রী ডাক ওকে বিমোহিত করে। নিজেকে ধরে রাখা কঠিন হয়ে পড়ে। লোকটার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে নিজেকে হালকা করার সাধ জাগে। কিন্তু কাজটি কঠিন। লোকটি ওই দূরত্ব রাখে।

একদিন তার সঙ্গে একটি পুরো দিন কাটিয়ে বাড়ি ফিরলে মা প্রশ্ন করে, কোথায় ছিলি তনু?
বান্ধবীর বাড়িতে।
কোন বান্ধবী? সবাইকেইতো আমি চিনি।
তুমি কি আমাকে সন্দেহ করছো?
সরাসরি কথা বলছিস না কেন?
মা প্লিজ, এভাবে আমাকে জেরা করবে না।
একটা ছোট বিষয় জানতে চাওয়া কি জেরা হলো?

তনুশ্রী মায়ের দিকে তাকাতে পারে না। ঘরে ঢুকে দরজা আটকায়। যে ঘরে ওরা চার বোন থাকে। বোনেরা ড্রইংরুমে টেলিভিশন দেখছে। আপাতত কেউ ওকে বিরক্ত করবে না। কিন্তু ওর ভয় করে। মায়ের কাছে ও আজ ধরা পড়েছে। মা যখন জানবে যে, এমন একটি অসম সম্পর্ক নিয়ে ও মেতে আছে তখন মা কি করবে? বলবে কি, একবার পুড়ে গিয়ে লজ্জা হয়নি? আবার আগুনে ঝাঁপ দিয়েছো?

এমন প্রশ্নের উত্তর কি হতে পারে তা ওর মাথায় আসে না। ও বালিশে মুখ গোঁজে। আজ একটি স্বপ্নের দিন গেছে। কাজের লোক দু'টিকে ছুটি দেয়া হয়েছিল। ও রান্না করেছে। মানুষটিকে ভাত মাখিয়ে খাইয়েছে। কত খুনসুটি, কত কথা। কেমন হলো ব্যাপারটা? ও উঠে বসে। পায়চারি করে। দরজাটা হাট করে খুলে দেয়। বাইরে বাবার কণ্ঠ শুনতে পায়। ক্লান্ত এবং বিধ্বস্তকণ্ঠ। ওর সঙ্গে ইদানীং খিটখিটে আচরণ করে। তেমন কোন কারণ নেই। পুড়ে গিয়ে সে তার জীবনের বোঝা বাড়িয়েছে এটিই কারণ।

নিম্নবিত্তের সংসার ওদের। টেনেটুনে দিন যাপন মাত্র। যে মানুষ উপার্জন করতে পারে না সে ছেলেমেয়ের বোঝা বাড়ায় কেন? ও বাবার মুখোমুখি হবে না বলে বাথরুমে ঢুকে। বাবার প্রতি প্রবল বিতৃষ্ণায় মন ভরে যায়। খিটখিটে মেজাজের মানুষটির চক্ষুশূল এখন ও। বাবাওতো পুরুষ। জন্ম দেয়ার সময় ফলাফল মনে রাখেনি। এখন সন্তানের উপর পৌরুষের দাপট প্রদর্শন! যে দুর্ঘটনার জন্য ওর কোন দায় নেই সেটিকে ধরেই ওর জীবনে নরক গুলজার করছে। ও নিজেকেই বলে, প্রতিশোধ নেবো। একদিন এই বাড়িতে ঘোষণা দেবো যে বাবার চেয়ে দ্বিগুণ বয়সী পুরুষকে আমি স্বামী বানাতে পারি। বয়সে কি এসে যায়। হাঃ!

তনুশ্রী ভুলে যায় ওর দগ্ধ শরীরের কথা। মানুষটির পাশে শুয়ে একদিন ও অনুভব করেছিল, জীবনের কষ্টগুলো অনায়াসে দূরে ঠেলে দেয়া যায় যদি ঠিক জায়গা খুঁজে নেয়া যায়। মানুষটি কি প্রবলভাবে বুঝেছিল যে শারীরিক আনন্দ কি। বয়স কোন বাঁধা হয়নি। বার্ধক্য অতিক্রম করার এই জাদুকরী শক্তি ওকে স্তম্ভিত করার পর সেই অঙ্গাকৃতিক শক্তির কাছে নিজের আনন্দ নিবেদন করেছিল ও। বলেছিল, যে সৌন্দর্য আমার কেড়ে নিয়েছ তা আবার অন্যভাবে ফেরত দিয়েছে। আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ।

মানুষটি একদিন সন্ধ্যার অস্পষ্ট আলোয় ধানমণ্ডি লেকের জলের ধারে বসে কণ্ঠে অনেক অনুরাগ ছড়িয়ে বলেছিল,
তোমার জীবনে আমিই তো প্রথম পুরুষ শ্রী?
হ্যাঁ।
ওহ, কি আনন্দ! মনে হচ্ছে আমার সামনে নয়জন মিউজের একজন বসে আছে। আমি কি ভাগ্যবান।

তনুশ্রীর মন খারাপ হয়ে যায়। মানুষটির কণ্ঠে পুরুষের আধিপত্য অনুভব করে ও। বলতে চেয়েছিল, আমি তোমার জীবনে প্রথম নারী নই। তাই তোমাকে নিয়ে আমার সেই আনন্দও নেই। আমি সেই আনন্দ পেতেও চাই না।
কি হলো, তুমি এমন শীতল হয়ে গেলে কেন তনুশ্রী?

আমি তোমার কণ্ঠে আমার বাবার কণ্ঠস্বর শুতে পাচ্ছি।
ওহ, ওই বাজে লোকটির কথা তুমি আমাকে বোল না। ও কোন মানুষই না।

বাবার রূঢ় আচরণের কথাতো ও নিজেই মানুষটিকে বলেছে। হাসপাতাল থেকে বাড়িতে আসার পরে বাবা ওকে তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলেছিল, তোকে নিয়ে আমি আর পারি না। তুই মরতে পারলি না। এত মানুষ মরে, আর জিব্রাইল তোকে চোখে দেখে না! তনুশ্রী দাঁত কিড়মিড় করে প্রতিজ্ঞা করেছিল, এই দগ্ধ শরীর নিয়েই নিজেকে দাঁড় করাবো। যতদিন সময় লাগে ঠিক ততদিন। তারপর একদিনও এ বাড়িতে না।

ওর এম এ ফার্স্ট পার্ট পরীক্ষা চলছে। ফাইনাল হলে কোন না কোন চাকরীতে ঢুকবে। চাকরী ? ভাবতেই শরীর শক্ত হয়ে যায়। একবার এক শিক্ষকের লিভ ভ্যাকেন্সিতে একটি স্কুলে চাকরী পেয়েছিল। দু'দিন পরই একজন অভিভাবক প্রিন্সিপালকে নালিশ দেয়, এই টিচারের ক্লাশ করতে আমার ছেলে ভয় পায়। এই টিচার থাকলে আমি স্কুলে ছেলে পাঠাবো না।

পরদিন প্রিন্সিপাল কয়েকদিনের বেতন দিয়ে ওকে বলেছিল, শিশুর দিকটিই আমাকে দেখতে হলো। আমি সরি।

তনুশ্রী কথা বলতে পারেনি। কাঁদতে পারেনি। শুধু বুঝেছিল, বাস্তব বড় নির্মম। এই নির্মমতার স্বরূপ ওকে বুঝতে হবে।

তখনও হাতের মুঠোয় ধরা ছিল কয়েকটি টাকা। রাস্তায় নেমে মিষ্টির দোকান থেকে মিষ্টি আর সিঙ্গারা কিনে ভাইবোনের জন্য। তরপর বাসস্ট্যান্ডে এসে দাঁড়ায়। পাশ থেকে কেউ একজন মৃদু ধাক্কা দেয় ওকে। তারপর ফিসফিসিয়ে বলে,কাকে ছ্যাকা দিয়েছিলেন যে এসিড খেতে হলো। তনুশ্রী লোকটির দিকে তাকালে লোকটি বলে, ভাগ্যিস আপনার মুখটা বেঁচে গেছে। ভারী সুন্দর দেখতে আপনি। এ ভাবেই মানুষের অনুকম্পা কখনো ওকে স্পর্শ করেছে, কখনো করেনি। বেশিরভাগ সময়ই ও কারও প্রশ্নের উত্তর দেয় না। প্রয়োজনই মনে করে না। ওতো নিজের ভেতরে জগৎ গড়েছে। কত উপকরণ সে জগতে আছে। কোনটা ছেড়ে কোনটা ও আঁকড়ে ধরবে।

কতদিন গড়ালো এভাবে মনে রাখেনি। একদিন পরীক্ষা শেষ হলো তনুশ্রীর। রেজাল্ট হলো। ছোটখাট একটি চাকরী পেলো। ভাবলো, এটুকু নিজের চলার জন্য যথেষ্ট। প্রথম মাসের বেতনটার অর্ধেকের বেশী বাবার হাতে তুলে দিয়ে বললো, এভাবে তোমার ঋণ শোধ করবো আমৃত্যু।
কি বললে? হুংকার দিয়ে উঠে ওর বাবা।
ধমক দিও না। যা বলেছি তুমি তা বুঝেছ।

সবার বিস্মিত-বিমূঢ় দৃষ্টির সামনে দিয়ে বেরিয়ে আসে তনুশ্রী। রিকশা ধরার জন্য রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে মনে হয়, একদিন এমন রূঢ় ভাষায় সেই মানুষটিকেও সে একটি কথা বলেছিল।

মানুষটি তনুশ্রীর মুখের দিকে এক পলক তাকিয়ে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। রূঢ় কথা শুনতে তো খারাপ লাগেই। তারপরও সেটা হজম করতে হয়।

তনুশ্রী কখনো নিজেকে প্রশ্ন করেছে, আমি যদি ওকে ভালবাসি তাহলে এমন রূঢ় হই কেন? পুরুষের আধিপত্য কখনো অসহ্য লাগে। ওরা যেটুকু তার চাইতে বেশি নারীর কাছে দাবী করে। ঠিক চিন্তা করেছি কি? বোধহয় ঠিক চিন্তাই করেছি। আমার অভিজ্ঞতা তাই বলে। বাবা আমাকে ভালবাসার চেয়ে মেজাজ দেখাচ্ছে বেশি। সম্পূর্ণ অযৌক্তিকভাবে। আমি তার সহানুভূতিই বেশি পেতে পারতাম। পাচ্ছি না । এই যুক্তিহীন রূঢ়তা দিয়ে তিনি আমাকে দমিয়ে রাখছেন। আমি যেন সন্তানের প্রতি তার দায়িত্ব নিয়ে প্রশ্ন না তুলি। আর এই মানুষটি কখনো নিজের পাওনাটুকু বড় কঠিনভাবে আদায় করে। সেখানে ভালবাসা খুঁজে পাওয়া যায় না। নিজের চিন্তাটুকু আত্মস্থ করে তনুশ্রী আকাশ দেখে। বুক ভরে বাতাস টানে। নিজের দগ্ধ শরীরের মতো নিজের দগ্ধ ভবিষ্যৎ অবলোকন করে। ছোট বোন বর্ণিতা মাঝে মাঝে বলে, আপু তোমার জন্য আমার খুব কষ্ট হয়। তোমার যদি বিয়ে না হয় তাহলে আমিও বিয়ে করবো না। আমরা দু'জনে একটা বাড়ি ভাড়া করে থাকবো। চাকরি করবো। আমরা দু'জনে দু'টো বাচ্চা পালক নেবো। এভাবে আমাদের একটা ফ্যামিলি হবে।

তনুশ্রী বলে, এটা কেমন ফ্যামিলি?

বর্ণিতা হেসে গড়িয়ে পড়ে। ও ভীষণ হাসতে পারে। হাসতে হাসতে চোখ বড় করে বলে,

ফ্যামিলিইতো। তবে মূল ফ্যামিলির মতো নয়। শাখা পরিবার বলতে পারো। মূল ফ্যামিলির ডালপালা আর কি। ব্রাঞ্চ ফ্যামিলি হয় না?

নিশ্চয়ই হয়। হবে না কেন? কতগুলো মানুষের একসঙ্গে থাকা। তাদের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোরা। ভালবাসা শেয়ার করা। ভালইতো। কিন্তু আমার জন্য তোকে ভাবতে হবে না। তোকে আমি মূল ফ্যামিলির বাইরে যেতে দেব না। তোর ভাবনা মতো আমিই একটা ফ্যামিলি করবো। তুই আমাকে তোর একটা বাচ্চা দিবি। দিবি না?

উঁহু ,না। তা হবে না। বাচ্চা যদি আমি জন্ম দেই সেটা আর কাউকে দিতে পারবো না। বলতে বলতে হা হা করে হাসে বর্ণিতা। তার চাইতে বাচ্চাই নেবো না। অন্যের বাচ্চা এনে ঘর বোঝাই করবো। যত খুশি তত। মানে আমাদের সামর্থে যে কয়টা পালতে পারবো সে কয়টা।

আবারও হেসে গড়িয়ে পড়েছিল বর্ণিতা। তনুশ্রী ওর কথায় খুব মজা পেয়েছিল। ভেবেছিল বর্ণিতা ওকে সতেজ বাতাস দিয়েছে। চমৎকার স্নিগ্ধ। এভাবে অর্থবহ বাঁচার ধারণা মন্দ নয়। কিন্তু পরক্ষণে নিজেকে প্রবল একটা ধাক্কা দিয়ে বলেছিল, আমি মূল পরিবার চাই। হোক না বিরাশি বছর বয়স। তাতে কি এসে যায়। ঘরের স্বাদ পাবে, প্রতিদিনের গৃহস্থালির ছবি মন ভরে দেখবে, মানুষটিকে ভাত মাখিয়ে দিলে মানুষটি ওকে এক লোকমা ভাত খাওয়াবে, ও মানুষটিকে এক লোকমা। প্রতিদিন বিছানায় নতুন চাদর পেতে দেবে। সঙ্গে তাজা ফুল। আর কি? ওর চোখ বুঁজে আসে। ও আবেশে দম বন্ধ করে।

দু'দিন পরে ও মানুষটির সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। মানুষটি তখন তার বাড়ির দক্ষিণের বারান্দায় রকিং চেয়ারে দুলতে দুলতে নোরা জোন্সের গান শুনছিল। ও নিঃশব্দে কাছে গিয়ে পাশে–চেয়ারের পাশে মেঝেতে পা গুটিয়ে বসে। রেলিংয়ের ওপাশ থেকে কামিনি ফুলের গন্ধ আসছে। পুরো পরিবেশ দেখে ওর মনে হয় সবটুকুই ওর অনুকূলে। ও আলতো করে হাত ধরলে মানুষটি চমকে উঠে বলে, তুমি।
আমি চলে এসেছি।

চলে এসেছো? মানে?

এখন থেকে আমি তোমার। তোমার কাছে থাকবো।

মানে? আমি তোমার কথা বুঝতে পারছিনা।

মানে তো একদম সোজা। আমার ভীষণ ইচ্ছে হয়েছে তোমার সঙ্গে সংসার করার। আমি ঘর চাই।

ঘর? লোকটা বিমূঢ়ের মতো উঠে বসে। মানে বিয়ে?

হ্যাঁ, তাইতো। বিয়েইতো হতে হবে।

আমি তো আর বিয়ে করবো না। বিবাহিত জীবন একবার যাপন করেছি। আর করতে চাই না। তোমাকে তো আমি শুরুতেই বিয়ে সম্পর্কে ধারণা দিয়ে দিয়েছি। এখন এসব কথা ওঠাচ্ছো কেন?

আমিতো বিবাহিত জীবন যাপন করিনি। আমি সে জীবন যাপন করতে চাই, সে জন্য কথা উঠেছে।

ওহ, শ্রী তুমি আমাকে পাগল বানিয়ো না।

আমি বুঝে শুনে ঠাণ্ডা মাথায় কথা বলছি।
আমি সরি।
মানুষটি চেয়ারের গায়ে মাথা হেলিয়ে দেয়।

হঠাৎ উত্তেজিত হয় তনুশ্রী। চেঁচিয়ে বলে, তুমি এতদিন তাহলে আমার সঙ্গে প্রতারণা করেছো।

আমি তোমার সঙ্গে কোন প্রতারণা করিনি। তুমি নিজের ইচ্ছায় আমার কাছে এসেছো। এখন তুমি লোভী হয়ে উঠেছো।

লোভী ? তনুশ্রী বিস্ময়ে, অপমানে গলা ফাটিয়ে বলে, লোভী? কিসের লোভ?

বিয়ে মানে আমার সঙ্গে তোমার একটি আইনগত ভিত্তি লাভ করা এবং আমার সম্পত্তি দখল।
ওহ, গড!

মানুষটি আকস্মিকভাবে রেগে গিয়ে বলে, তুমি কি আমাকে ব্ল্যাকমেইল করছো?
না।
তবে?

তোমার মুখোসটা তোমাকে ধরিয়ে দিতে চাই।

স্টুপিড মেয়ে, তুমিই আমার কাছে এসেছো।

আর তুমি আমাকে প্রশ্রয় দিয়েছো। ভাল করেছো। অভিনয় করেছো। তোমার প্রতি আমার আবেগ মিথ্যে নয়। তোমারটা কতটা এখন আমার সন্দেহ হচ্ছে।

তুমি যদি আমাকে অপদস্ত করার চেষ্টা করো তবে আমি বাধ্য হবো থানায় ডায়রী করতে।

এটাও তুমি ভেবে রেখেছো ?

কোন কোন নারীর কাছ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য তো ভেবে রাখতেই হয়।

তনুশ্রীর সামনে পৃথিবীটা প্রবল বেগে নড়ে ওঠে। ও মানুষটিকে দেখতে পায় না। দেখতে পায় তার কুৎসিত নগ্ন শরীর, পোকায় খাওয়া এবং দুমড়ানো।

নুরহাসনা লতিফ*

রোদেলা জীবন

'বর্ণালী ভিলায়' আয়োজন চলছে মিলাদ শরীফের।

প্রয়াত রায়হান চৌধুরীর কারণেই এই আয়োজন। শ্বেত-শুভ্র বসনে বসেছিলেন পিনাকী রায়হান। আত্মীয়-স্বজন-বন্ধুরা প্রায় সবাই এসেছে। এমন একটা দিনে ওর কাছে থাকা দরকার। পিনাকী রায়হান বসেছিলেন শ্বেত পাথরের মত। তিনি নির্বাক। কিছুটা এলোমেলো। পিনাকীর পাশেই বসেছিল মোনালিসা। মোনার সাথে বয়সের ব্যবধান অনেক হলেও ওরা বন্ধু। সবসময় যাতায়াত আছে। ফোনে কথা হয়। মোনালিসার স্বামী বিদেশে থাকে। পিনাকীর স্বামী রায়হান চৌধুরী অসুস্থ ছিলেন অনেকগুরো বছর। এ সময়টা পাশে থেকেছে মোনালিসা। মোনা ভাবছে, আজ থেকে পিনাকী আপার কাজ নেই। শেষ যেন হয়ে গেল কষ্টের জীবনটা। পিনাকী মাঝে মাঝেই কাঁদছেন আর বলছেন –

এত অবসর আমি কাটাবো কিভাবে? এত কাজ ছিল, এখন যে কিছুই নেই।

মোনালিসা মনে মনে ভাবে, বার বছর সেবা দিয়ে ভরিয়ে রেখেছিলেন দুলাভাইকে পিনাকী আপা। এও ছিল এক শান্তির জীবন। সেই তুলনায় নিজের জীবনটা কি?

ভালবেসে আদিত্যকে বিয়ে করেছিল মোনালিসা। পাঁচটি বছর ছিল সুখের নদীতে অবগাহন। স্বামীর মত ভাল মানুষ আর হয়না। স্বপ্নের ফাঁক গলিয়ে আলো ঝরেছে ওর জীবনে। ওর কোল জুড়ে এসেছে ছেলে। মৌসুমী আর মোনালিসা দুই বোন। মুক্তিযুদ্ধে শহীদ হয়েছেন ওদের বাবা-মা আর ছোট ভাই। সমস্তসম্পত্তির মালিক ছিল ওরা দুই বোন। বাবা-মা বেঁচে থাকাকালীন বিয়ে হয় মৌসুমীর। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার অনেক পরে মোনালিসার বিয়ের দায়িত্ব পালন করে বড় বোন মৌসুমী।

আদিত্যের সাথে মোনার জানাজানি শৈশব থেকে। থাকতো ওরা পাশাপাশি বাড়িতে। ওদের মেলামেশায় যেমন কেউ বাধা দেয়নি তেমনি বিয়েতেও আপত্তি

---

* কথা সাহিত্যিক, গবেষক, প্রাবন্ধিক।

করেনি কেউ। পাঁচ বছরের বিবাহিত জীবনে ছিল মুঠি মুঠি আনন্দ। এলিফ্যান্ট রোডের একটা ফ্ল্যাটে থাকতো ওরা।
একদিন মোনালিসা বলল, চল আমরা একটা ফ্ল্যাট কিনে ফেলি। উত্তরে আদিত্য বলেছিল, ফ্ল্যাট কিনে টাকা বন্ধ করা যাবেনা এখন। ব্যবসায় টাকাটা খাটাচ্ছি।

আদিত্য একটা এনজিও'র সাথে জড়িত ছিল। মোনালিসা নিশ্চিন্ত ছিল স্বামীর হাতে সমস্তটাকা-পয়সা তুলে দিয়ে। মোনা পড়াতো একটা মেয়েদের কলেজে।

আদিত্য একদিন চট্টগ্রাম যাওয়ার নাম করে চলে গেল অষ্ট্রেলিয়া। ওর সাথে চাকরী করতো মিনা নামের মেয়েটিকে সাথে নিয়ে। সে বিয়ে করেছে মিনাকে। সেই সাথে মুক্তি দিয়েছে মোনাকে। মোনালিসার সমস্তটাকা-পয়সাও সে করেছে আত্মসাৎ। মোনার ছেলের নামে কিছু সঞ্চয়পত্র ছাড়া আর কিছুই নেই এখন ব্যাংকে। মোনার পৃথিবীতে স্বামী ছিল মহামানব। মিনার সাথে প্রেম করেছে সে কথাও জানতো না মোনা। ওর সরল বিশ্বাসের উপর হামলা চালিয়েছে আদিত্য। দিন বসে থাকে না। বয়ে যায় নদীর মতো তরতর করে। আদিত্য চলে যাবার পরও মোনা বেঁচে আছে দু'বছরের স্বপ্নকে নিয়ে। চাকরিটা চালিয়ে গেছে সে।

বাঁচবার অবলম্বন তার আরও একটি আছে। সে তার লেখনি শক্তি। পত্রিকায় নিয়মিত লেখে সে। কবিতার শরীরে পেঁচিয়ে দেয় ওর জীবনের ঘটনাবহুল শাড়ী। গল্পের অবয়বে তুলে ধরে ওর ফেলে আসা প্রেম আর ছন্নছাড়া জীবনের কাহিনী। এতকিছুর পরও মোনা ভুলতে পারেনি আদিত্যকে। আজও আদিত্যের নামে কেউ কিছু বললে সরে যায় সে নিশ্চুপে। নিজের কথায় গল্পের শরীর সাজিয়ে এক সময় কান্নায় ভাসে। তবে মনের সরোবরে পদ্ম ফোটায় স্বপ্নকে ঘিরে। একদিন মনের মতো মানুষ হবে স্বপ্ন। স্বপ্ন'র সুখের 'মা' ডাক মোনার কাজের প্রেরণা।

একজন মেয়ের একা থাকা এ সমাজ গ্রহণ করে না। মোনাও পারেনি একা থাকতে। আদিত্য চলে যাবার পর সে বড় বোনের বাসায় একটা রুম ভাড়া নিয়ে থাকে। ভাড়া দেয়া নিয়ে আপা আপত্তি জানালেও মোনার উত্তর, "অন্য কোথাও থাকলে এর চেয়ে অনেক বেশি ভাড়া দিতে হতো আপা। তার উপর পেতাম না নিরাপত্তা। তুমি আপত্তি করো না আপা। প্লিজ।"

দুলাভাই মানুষটাও ভাল। কখনো আপত্তি করেনি। আপার ছেলে-মেয়েরাও ভালবাসে ওকে। স্বপ্নকে। স্বপ্ন বড় হয় এই পরিবারের স্নেহছায়ায়, পরিবারের সদস্য হয়ে। স্বপ্ন'র কোন আবদার নেই, কোন জেদ নেই। পড়াশুনায় অসম্ভব ভাল সে। স্বপ্নকে নিয়ে মোনার শান্তি অনেক।

জীবনে আরও একজনের ভালবাসা পেয়ে আসছে মোনা। সে এই পিনাকী আপা। দুলাভাই মারা যাওয়ার পর এ বাসায় মোনা বেশি এসেছে পিনাকীকে সঙ্গ দিতে। আপার ছেলেমেয়েরা বাইরে থাকে। আপা অনেক সময় বলেন, ইচ্ছে হয় তোকে

আমার কাছে রেখে দেই। কিন্তু তোর একটা নিজস্ব স্বত্বা আছে। তা নষ্ট হতে দেয়া যায় না। আমারতো সময় শেষ। আল্লাহ আমাকে দিয়েছে অনেক। সে তুলনায় মোনা তুই কিছুই পেলিনা। আদিত্য তোকে ঠেলে দিয়েছে এক অন্ধকার জীবনের দিকে। তবুও যদি ছেলেটা না থাকতো তাহলে হয়তো –
পিনাকীর কথা শেষ না হতে দিয়েই মোনা বলল,

ও কথা বলোনা আপা। আমার জীবনের যে অন্ধকার, তার মাঝে বেঁচে থাকার যে আলোটুকু আমি পাই সে আমার স্বপ্ন'র জন্যই। আমার চলার পথে ও এখন সত্যিই আমার স্বপ্ন। ওর ফুলের মতো মুখটা প্রতিনিয়ত স্বপ্ন দেখায় আমাকে। খুঁজে পাই বেঁচে থাকার অর্থ।

স্বপ্ন'র ভাল নাম অনীত রহমান। বাবার নামের সাথে নাম মিলিয়ে সোমাই ওর এই নাম রেখেছিল।

পিনাকী বলেন, সে যাক। তোকে অন্য রকম কিছু একটা বলতে চাই আমি।

সেটা কি আপা?

বলবো। তবে আরও কিছুদিন পরে। একটু পর্যবেক্ষণ করে।

মোনালিসা ভাবে, ওকে কি বলতে চায় পিনাকী আপা। মোনার ধারণা, পৃথিবীর তাবৎ ওয়েল উইশারদের একজন এই পিনাকী আপা। সে কি তার খারাপ কিছু চাইবেন? প্রতিদিন নামাজের পর একটা দোয়া পড়েন তিনি। মোনা জানতে চেয়েছিল,
এ দোয়ার মরতবা কি আপা?

এটা এমন একটা দোয়া যা পড়লে মানুষ কু-প্রবৃত্তি থেকে দূরে থাকবে। করবে না কারো অনিষ্ট।

সেদিনই মোনা বুঝেছিল আপা কত মহান। নিজে ভাল থাকার জন্য, অন্যের ভালর জন্য কি সাধনাই না তিনি করেন।

সেদিন ভোরবেলা মোনাকে ডাকলেন আপা। "আজ ছুটির দিন স্বপ্নকে নিয়ে চলে আয়। আমার একজন মেহমান খাবে। ভালমন্দ কিছু রান্না করেছি।"– ভদ্রলোকের সাথে পরিচয় হলো। বাইরে থাকেন তিনি।

আপা বলেন, ইনি সাজিদ সাহেব। অনেক বছর আছেন আমেরিকায়। সম্প্রতি ফিরেছেন দেশে। পরদিন আসল কথা বললেন আপা। "সাজিদকে তুই বিয়ে কর মোনা।"

এটা কি বলছো আপা?

আমি তোকে একদিন বলেছিলাম, একটু পর্যবেক্ষণ করে তবে তোকে একটা কথা বলবো। আমি ওকেই গত এক বছর ধরে পর্যবেক্ষণ করছিলাম। ওকে জানি আমি

ছোটবেলা থেকে। খুব ভাল মনের ভাল একটা ছেলে। তোর কাছে লুকোবার কিছু নেই। আমেরিকায় থাকা কালে একটা বিদেশী মেয়ের সাথে ওর পরিচয় হয়। ভাল লাগে দু'জনার। বিয়ে করে ফেলে ওরা। কিন্তু অল্পদিনেই ভেঙ্গে যায় ওর সংসার। একটা ছেলে আছে ওর। মায়ের সাথেই থাকে সে। দীর্ঘদিন বিদেশে একা কাটানোর পর সেদিন দেশে ফিরেছে। গুলশানে একটা ফ্ল্যাটও কিনেছে। এখানেই সে আবার বিয়ে করে সংসারী হতে চায়। আমি তোর কথা বলেছি ওকে। ওর অমত নেই। স্বপ্নকে নিতে ওর আপত্তি নেই।

কিন্তু আপা, স্বপ্ন এখন বড় হয়েছে। সে কি তা মানতে পারবে?

সে তুই চিন্তা করিসনে। সে ভার আমার। স্বপ্নকে কাল আমার কাছে রেখে যাবি।

স্বপ্নর সাথে কথা বলেছে পিনাকী। মা'র বিয়েতে স্বপ্নর কোন আপত্তি নেই। বিষণ্ন ভাবে পরিণত বয়সের রূপ নিয়ে স্বপ্ন বলে, মা বলে বাবা বিদেশে থাকে। তিনি বিদেশে আছেন এ কথা যেমন সত্য তেমনি সত্য তিনি আর কখনো আমাদের কাছে আসবেন না। মা এ ব্যাপারে আমাকে কিছু না বললেও আমি বুঝি। অনেকেই মাকে আর আমাকে নিয়ে নানা কথা বলে, হাসাহাসি করে। আচ্ছা আন্টি, মা আরেকটা বিয়ে করেনা কেন?

মা যে তোমার কথা চিন্তা করে বাবা।

আমিও মার কথা ভাবি। মা লুকিয়ে কাঁদে। মাকে আমি সারাক্ষণ হাসিখুশি দেখতে চাই।

তোমার মাকে আবার বিয়ে দিতে চাই।

সত্যি বলছেন আন্টি! আমি আবার বাবা পাবো?

তোমার কোন আপত্তি নেই তাহলে?

মোটেই না। আমি খুশি। খুবই খুশি।

মোনালিসার আবার বিয়ে হয়। অনাড়ম্বর বিয়ে। সাজিদের নতুন কেনা ফ্ল্যাটে স্বপ্নকে নিয়ে নতুন সংসার মোনালিসার। স্বপ্নর স্কুলও পরিবর্তন করে ফেলেছে মোনালিসা। মোনা চায়না স্বপ্ন নতুন করে কোন প্রশ্নের মুখোমুখি হোক। স্কুলে যায় স্বপ্ন সাজিদের গাড়িতে। সাজিদের ব্যবহারে মা ও ছেলে দু'জনই মুগ্ধ। মোনা স্বপ্নকে শিখিয়েছে সাজিদকে আংকেল ডাকতে। বিয়ের পর ওরা অনেক জায়গায় বেড়াতে গেছে। সাথে স্বপ্নও থেকেছে। স্বপ্নর খুব ভাল লাগে। ওর বুকের ভেতরের বাবা না থাকার হাহাকার ভাবটা দূর করে দিয়েছে সাজিদ। স্বপ্নের যেন অনেক দিনের চেনা এই সাজিদ আংকেল। মায়েরও কোন পরিবর্তন হয়নি। আগের মতই মা তাকে সময় দেয়।

পিনাকী আন্টিও ওদেরকে দেখে গেছেন কয়েকবার। সাজিদের আত্মীয়-স্বজনরাও আসে এ বাসায়। ওরাও সবাই স্বপ্নকে খুব আপন করে নিয়েছে। ভালও বাসে ভীষণ। বিশেষ করে সাজিদের মা যখনই আসে স্বপ্নর জন্য নতুন নতুন গিফট নিয়ে আসে। আদর করে বলেন, "দাদু ভাই কেমন আছ।"

স্বপ্ন অবাক হয়। ওর এত বছর বয়সে কেউ ওকে এমন করে আদর করেনি। মাকেও ওরা ভালবাসে–বুঝতে পারে স্বপ্ন। হঠাৎ করে ওদের জীবনে আসা সাজিদ আংকেলকে ভালবেসে ফেলে স্বপ্ন। অবশ্য সাজিদকেও বুঝতে চেষ্টা করে স্বপ্ন। এরই মধ্যে সাজিদের খুশি হওয়ার এবং অখুশি হওয়ার কারণগুলো বুঝে ফেলেছে স্বপ্ন।

মা কলেজে গেছে। এস এস সি পরীক্ষা চলছে স্বপ্নর স্কুলে। তাই স্কুল বন্ধ। সাজিদ ড্রয়িং রুমে বসে পেপার পড়ছিল। কাছে এসে দাঁড়ায় স্বপ্ন। সাজিদ জানতে চায়,
কিছু বলবে স্বপ্ন?

আমি তোমাকে একটা কথা বলবো।

স্বপ্নকে টেনে কাছে বসিয়ে হেসে সাজিদ বলে,
বল কি বলবে।

আমি যদি তোমাকে বাবা ডাকি তুমি রাগ করবে? কেঁদে ফেলে স্বপ্ন।

সাজিদের মনে হলো তার ছেলে 'হার্ট' বুঝি তার পাশে এসে বসেছে। অনেক দিন হার্টকে দেখেনা সাজিদ। খুব দেখতে ইচ্ছে করে। কিন্তু দেখার উপায় নেই। এ্যানির কাছে সে আছে। আনন্দে সাজিদ স্বপ্নকে বুকে জড়িয়ে ধরে। প্রচণ্ড আবেগ ভরে বলে,

হ্যাঁ। আজ থেকে তুই আমাকে বাবা বলেই ডাকবি। আমি যে সত্যি তোর বাবা। আল্লাহ-ই এই সম্পর্ক আমাদের মাঝে গড়ে দিয়েছেন। কেউ কোনদিন ভাঙ্গতে পারবেনা আমাদের এই সম্পর্ক। আমি যে তোর বাবা।

মোনা কখন এসে পেছনে দাঁড়িয়েছে ওরা জানেনা। ওদের সব কথাই শুনেছে মোনা। মোনার ভেতরে বয়ে যায় একটা প্রশান্তির জলধারা। কেটে গেছে ওর জীবনের মেঘ।

রোদেলা জীবনের এই উত্তাপ ওকে কি ভরিয়ে দেবে কানায় কানায়। জীবনের বাকী সময়টা।
ভাবে মোনা।

জে আলী*

আগন্তুক

আর মাত্র তিনজন, এর পরেই ডাক পড়বে আলীমের। আলীম রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একাউন্টিং-এ এম বি এ। গতানুগতিক সুদর্শন ওকে বলা যায় না। লম্বায় পাঁচ ফিট সাত ইঞ্চি, গায়ের রং উজ্জল শ্যাম, হাতুড়ী পেটানো মাংশল শরীর আর চোখে মুখে প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসের ছাপ। আলীম বসে আছে ৩০/৩ (মতিঝিল বা/এ) এ.এন্ড.এস ডাইং কোম্পানীর এম.ডি'র কক্ষের সামনে। ওর মতো আরও জনা তিরিশেক অপেক্ষায় রত। গত মাসে অর্চনা টেক্স-এর চাকরিটা চলে গেছে বসের সাথে বনিবনা না হওয়ায়। বাবা মারা যাওয়ার পর মা ও ছোট বোন লিপির দায়িত্ব এখন ওর উপর। চাকরি নেই এটা মাকে এখনও জানায়নি। শুধু শুধু বাড়তি একটা চিন্তা মায়ের উপর দিতে চায়নি ও। মাসের পনর তারিখের মধ্যে ওকে বাড়িতে খরচ পাঠাতে হবে। ভার্সিটিতে পড়ার সময় থেকেই ওকে টিউশনি আর নানা ধান্দা করে পড়াশোনার খরচ চালাতে হতো। ছোট বোনের পড়ার খরচও পাঠাতে হয়েছে নিয়মিত। একপেট-আধাপেট খেয়ে দিব্যি কাটিয়ে দিয়েছে কতদিন। আগাঁরগাও এ 'শান্তিনীড়' নামে যে মেসে ও থাকে সে মেসের ম্যানেজার এ মাসেই মেস ছাড়ার নোটিশ দিয়েছে। একটার পর একটা দুঃশ্চিন্তা পাক খাচ্ছে আলীমের মাথায়।

এই যে ভাই 'রা.বি' কি ভাবছেন? এর পরইতো আপনার ডাক পড়বে। পাশে বসা খাটো মতো লোকটার ডাকে চিন্তায় ছেদ পড়ে আলীমের। এইমাত্র যে ভাইভা বোর্ড থেকে বের হলো কয়েকজন তাকে জেঁকে ধরেছে। "কি কোশ্চেন করলো ভাই", "ভাইভা বোর্ডে কয়জন"–ইত্যাদি ইত্যাদি। একজনের প্রশ্ন শেষ না হতেই আরেকজন জানতে চাইল–"ভাইজান মাল-পাত্তি কত ঢালছেন"। প্রশ্নকর্তা আশেপাশে তাকিয়ে কারো সাড়া না পেয়ে খানিকটা লজ্জা পেলো। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে উত্তরদাতা বললো, ভাইরে চাকরী হবেনা। ম্যাডামের যেই অবস্থা।

---

* প্রভাষক-স্কুল অব বিজনেস, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ।

চাকরিটা পেলেই শালার মিতুকে বিয়েটা করে ফেলবো –বলল আলীমের পাশের জন।

ভাইভা বোর্ডের প্রধান একজন মহিলা কথাটা আলীমের জন্য মোটেও সুখবর নয়। "চুনে মুখ পুড়ে দৈ দেখে ভয়"–কথাটা শুনে এই অবস্থা এখন আলীমের। আলীম নিশ্চিত, আজকের ভাইভা বোর্ডে ঠিকমতো উত্তর করতে পারবে না সে। অথচ চাকরিটা ওর ভীষণ ভীষণ প্রয়োজন। আপনা থেকেই বুক খালি করে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে গেল আলীমের।

ডাক পড়লো আলীমের। কোন রকমে নিজেকে সামলে নিয়ে পা বাড়ালো সে। যেহেতু আলীম ধরেই নিয়েছে চাকরিটা ওর হচ্ছে না কাজেই কিছুটা স্বস্তি বোধ করছে সে। যে কোন কঠিন সমস্যারই পরিণতি মনে মনে মেনে নিলে সেটা থেকে অনেকটা স্বস্তি পাওয়া যায়–ধারণা আলীমের। ভাইভা বোর্ডের ডানদিকে বসে আছে লম্বা গোঁফ ওয়ালা কোম্পনীর দুইজন কর্মকর্তা, বামদিকে ফাইলপত্র সহ একজন এক্সপার্ট। টেবিলের অপর পাশে বসা কোম্পানীর এমডি'র সাথে চোখাচোখি হতেই মাথায় বিদ্যুৎ খেলে গেলো আলীমের। নিজেকে সামলে নিয়ে আসন গ্রহণ করলো আলীম।

আপনার নাম? জানতে চাইলেন একজন কর্মকর্তা।

আবদুল আলীম মণ্ডল। যন্ত্রবৎ উত্তর আলীমের।

এরই মধ্যে এম.ডি খানিকটা অসুসথ বোধ করছেন। একজন জানতে চাইলেন–ম্যাডাম,এ্যানি প্রবলেম? দু'হাতে মাথাটা চেপে ধরে অবসন্নভাবে এম.ডি বললেন, "হঠাৎ মাথাটা কেমন করে উঠল। আচ্ছা ঠিকআছে, আজকের মতো ভাইভাবোর্ড ক্লোজ করে দিন রফিক সাহেব।"

এ.সি রুমেও এ.ডি'র কপালে বিন্দু বিন্দু ঘামের চ্ছটা। দ্বিতীয়বার এ.ডি'র দিকে দৃষ্টি পড়তেই লক্ষ্য করলো আলীম। অসমাপ্ত ভাইভা বোর্ড থেকে বের হয়ে অন্যান্য চাকরি প্রার্থীদের সাথে পায়ে পায়ে বড় রাস্তায় পা রাখলো সে। পকেটে হাত দিয়ে হিসেব করতে চাইলো শেষ সম্বলটুকু। বাহাত্তুর টাকা পঞ্চাশ পয়সা। পাশের গলিতে ঢুকে একটা নেভি সিগারেট ধরালো। খিধেয় পেট চোঁ চোঁ করছে। আরেকবার পকেটে হাত দিলো আলীম। না উপায় নেই। হোটেলে ঢুকে পর পর দুই গ্লাস পানি ঢাললো পেটে। তলপেটে গুড়গুড় ডাক দিতেই চেয়ার টেনে বসে পড়লো। পুরাতন আমাশয় কদিন থেকেই নতুন করে জানান দিচ্ছে। খাওয়ার অনিয়মে গ্যাষ্ট্রিকও বাড়ন্ত প্রায়। বিচ্ছিন্ন কিছু প্রাসঙ্গিক সৃতিতে ভেসে যাচ্ছে আলীম। হোটেলের যান্ত্রীক শব্দগুলো থেকে সে এখন তিরোহিত। নিজস্ব ভাবালুতায় মগ্ন। মাত্র কয়েকটা বৎসরের ব্যবধান। সেই প্রথম যেদিন ভার্সিটির প্যারিস রোড দিয়ে সিনেট ভবনের

বারান্দায় ওকে নিয়ে বসলো জেনি। তারপর অনেক অ-নে-ক কিছু। ইচ্ছে করেই নিজের স্বাতন্ত্রকে জিইয়ে রেখেছে আলীম। মাত্র বাহাত্তুর টাকা পঞ্চাশ পয়সা পকেটে। ছন্নছাড়া বেকার জীবন। অথচ একটু ছাড় দিলেই - - - -। না। কোন আফসোস নেই। আছে শুধু প্রশান্ত চিত্ত আর নিশ্চিন্তে নির্ভর করার মত আত্ম বিশ্বাস। মেসের দিকে পা বাড়ালো আলীম।

গাড়ীর হর্ণ বাজার শব্দে সাত সকালে ঘুম ভেঙ্গে গেল শান্তিনীড় মেসের ম্যানেজার শহীদ মিয়ার। অসম্ভব বিরক্তি ভরে মুখটাকে যথাসম্ভব বিকৃত করে গেটের দিকে এগিয়ে গেল সে। গেট খুলে চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে জানতে চাইলো–"কারে চান?" ঘুমের রেশ তখনো পুরোপুরি কাটেনি হতভাগ্য শহীদ মিয়ার। অন্যথায় সে ভীমরি খেতো এই সকাল বেলা তারই সামনে দাঁড়ানো অসম্ভব সুন্দরী এই আগন্তুককে দেখে।

আলীম সাহেবকে একটু ডেকে দেয়া যাবে? বললো আগন্তুক।
আলীম স্যারের কাছে আইছেন? উনিত রাইতের বেলা গাট্টিবোচকা লইয়া মেস থেইক্যা ফুটছে।
মানে?

জ্বী ম্যাডাম। গত মাস থেইক্যা ওনার চাকরি নাই। অবস্থা কাহিল। পর পর দুই মাসের মেস ভাড়া বাকী। তাই এই মাসে মেস ছাড়ার নোটিশ দিছিলাম।
ওনি কোথায় গেছেন ঠিকানাটা যদি –

সরি ম্যাডাম। উনিত কোন ঠিকানা রাইখ্যা যান নাই। তবে চাকরি পাইলে মেসের ভাড়া দিতে আসবো। পয়সা না থাকলেও মানুষটা খাসা। নিরাসক্ত কণ্ঠে জবাব দিল শহীদ মিয়া।

জগতের সকল ঐশ্বর্য ও যাবতীয় সম্পদের চেয়েও মহামূল্যবান কোন একজন বেদনাময়ী প্রেমিকার একবিন্দু চোখের জল। আগন্তুকের চোখে মার্কারির সানগ্লাস থাকায় শহীদ মিয়া সেই ঐশ্বর্যময় দৃশ্য হতে দ্বিতীয়বার বঞ্চিত হলো।
শুধু চোখে পড়লো বেদনা সিক্ত কুকড়ে যাওয়া একটি মিষ্টি অবয়ব।

রিটা আশরাফ*

তূর্যকে লেখা মায়ের চিঠি

স্নেহের তূর্য /

আমার অনেক অনেক আদর নিও।
ভালবাসা নিও।
অনেক অনেক স্নেহাশিষ নিও।

কেমন আছো বাবা? বৌমা কেমন আছে। টুসি দাদুমনি আমার ভাল আছে তো? আমার বংশের একমাত্র প্রদীপ। আমাকে যুগান্তরে বয়ে নিয়ে যাবার একমাত্র বৈঠা। দাদুমনি আমার কখনো মন খারাপ করে থাকে নাতো? আমার হয়ে আমার দাদুমনির দু'গালে তুই আর বৌমা মিষ্টি করে দুটো চুমু খেয়ে দিস্।

বাবা তূর্য, আজ সকাল ছ'টায় তোদের সাথে কথা হলো। অনেকক্ষণ ধরে। কুশলাদি বিনিময় হলো। ভাল-মন্দ জানা হলো। সমস্যা-সমাধান নিয়ে আলোচনা হলো। তোদের ওখানকার আর আমাদের এখানকার নানা বিষয় নিয়ে জানাশোনা হলো। এখন বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা। না না, ঠিক সন্ধ্যা নয়। সন্ধ্যা বিকেলের মাঝামাঝি। গোধূলি লগন। পশ্চিমাকাশ লালচে রঙের উপর ছোপ ছোপ সাদা বুটিতে চমৎকার একটা শাড়ি পড়ে আছে। দক্ষিণধারের আম গাছের নীচে দোলনাটায় বসে সে দৃশ্য দেখছি আর ভাবছি তোর কথা। সকালবেলা তোদের সাথে টানা এক ঘন্টা পাঁচ মিনিট পয়তাল্লিশ সেকেন্ড কথা বলার পর এখন বেলা ছ'টা বেজে পঁচিশ মিনিট পার হয়ে যাচ্ছে। সময়টাকে বিকেল কিংবা সন্ধ্যা বললাম না। কারণ এখন সন্ধ্যাও নয়, বিকেলও নয়। এখন গোধূলি লগন। আর সময় উৎক্ষেপণের বেলায় আমরা এখনও গোধূলি লগন বলে অভ্যস্ত নই। তাই অভ্যস্তহীনতার বাক্য কিংবা শব্দ উচ্চারণকালে ব্যবহারের সময় আমরা যথেষ্টই জড়তা বোধ করি। তাছাড়া, গোধূলি লগন শব্দটি আমাদের শহুরে জীবনে তেমন প্রযোজ্যও নয়। এখানে বিকেল কিংবা সন্ধ্যা বললেও সময়ার্থের কিংবা বাক্যার্থের তেমন হেরফের হবে বলে আমার মনে হয় না।

---

* কথা সাহিত্যিক ও সহকারী অধ্যাপক, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অ বাংলাদেশ।

মনে আছে তোর, তুই তখন সে-ই ছোট্টটি ছিলি। কোন ক্লাশে পড়িস তখন? সপ্তম কিংবা অষ্টম শ্রেণীতে। ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি হাইস্কুলে। আমরা তখন ইউনিভার্সিটির শিক্ষক কোয়ার্টারে থাকতাম। তোর বাবা একদিন ইউনিভার্সিটির ক্লাশ শেষ করে ঘরে ফিরতেই তুই দাদু বাড়ি যাবার বায়না ধরলি। পরেরদিন ক্লাশ আছে বলে তোর বাবা তোকে এ বায়না থেকে নিবৃত করার চেষ্টা করলেন নানাভাবে।

কিন্তু নাছোড়বান্দা তুই। কেঁদে কেঁদে একাকার করে ফেললি। পরে বাধ্য হয়ে সেদিনই চারটার দিকে আমরা রওনা হলাম। যাত্রা বেশি সময়ের ছিলনা। বাসে উঠে মাত্র এক ঘন্টার পথ। বাস থেকে নেমে আর কোন যানবাহনের পথ ছিল না। পুরু পৌণে এক মাইল হেঁটে গিয়ে তোর দাদুর বাড়ি। আমরা হাঁটা ধরলাম। গ্রামের আঁকাবাঁকা পথ ধরে। বন্ধুর সে পথ। তুই বারবারই হোঁচট খেয়ে পড়ে যাচ্ছিলি। তোকে টেনে তুলতে গিয়ে দু'বার আমার হাত থেকে ব্যাগ পড়ে গিয়েছিল। উঁচু রাস্তা থেকে একেবারে নীচে। ক্ষেতের মধ্যে। তোর পা-ও বেশ কয়েক জায়গায় ছিলে গিয়েছিল। রাস্তার দু'ধারে সদ্য কাটা ধানক্ষেত। দেখতে খোঁচা খোঁচা দাড়ি গজানো মুখের মতো। দিগন্ত প্রসারিত সে ফাঁকা মাঠ। হাঁটতে হাঁটতে বেলা পড়ে আসছিল। পশ্চিমাকাশ রাঙিয়েছিল ঠিক এই মুহূর্তের আকাশের মতো। মাঠে ছড়ানো ছিটানো গরুর পাল। সাথে রাখাল।

রাখালরা সব তখন গরুর পাল পেছন থেকে ধাওয়া করে ঘরে ফিরছিল। গরুর পালের খুড়ের আঘাতে মাঠের ধুলো উড়ে চারপাশটা কেমন ধোয়াটে হয়ে গিয়েছিল। মনে আছে সে দৃশ্য তোর খোকা? তুই আমাকে বলেছিলি,
মা, দেখ দেখ কি সুন্দর!
তোর বাবা তখন তোকে বলছিলেন,
এ সময়টাকে কি বলে জান তূর্য?
তুই বলেছিলি,
কি বলে বাবা?
গোধূলি লগন।
তুই আবার জানতে চাইলি-
গোধূলি লগন কি বাবা?

তোর বাবা তখন ইউনিভার্সিটির শিক্ষকের মতই তোকে বোঝাতে লাগলেন, গোধূলি লগন হচ্ছে সন্ধ্যা বিকেলের মাঝামাঝি একটা সময়। তবে সন্ধ্যাও না বিকেলও না। গোধূলি হচ্ছে সায়ংকাল। অর্থাৎ সূর্যাস্তকাল। যখন গরুর পাল ধূলি উড়িয়ে ঘরে ফিরে। আর লগন হচ্ছে সূর্যের এক রাশি থেকে আরেক রাশিতে গমনের কাল। ঐ যে দেখছো, রাখালেরা গরুর পাল নিয়ে ঘরে ফিরছে, চারপাশ কেমন ধোঁয়াটে হয়ে

গেছে গরুর খুরের আঘাতে ধুলা উড়ে উড়ে, পশ্চিমাকাশ কি অদ্ভুত সুন্দর রঙে রাঙিয়ে উঠেছে, এই সময়টাই হলো গোধূলি লগন।

গোধূলি লগন পার করে সন্ধ্যার সময় আমরা গিয়ে উঠলাম তোর দাদুবাড়ি। আর সে কি হৈ-চৈ পড়ে গেল সারা বাড়িময়। আমাদের সাথে দু'দণ্ড কথা বলার সময় পেলো না কেউ। তোর দাদু আমাদের ঢুকতে দেখেই মোরগের খোঁয়ার থেকে মোরগ ধরতে গেল। তোর দাদা গেল ডিম খুঁজতে। তোর বড় চাচী মাটির চুলায় ভাত চড়িয়ে আগুন জ্বেলে দিল। তোর ছোট চাচীর তখন প্রচণ্ড জ্বর। সেই জ্বর নিয়েও সে উঠে এসেছিল অতিথি আপ্যায়নে। তারপর ওকে জোড় করেই আবার শুইয়ে দিয়েছিলাম আমি আর তোর বাবা। তবুও ওর সে কি আপত্তি। জ্বর নাকি তেমন একটা নেই গায়ে। অথচ আমি ওর গায়ে হাত দিয়ে দেখেছিলাম জ্বর তখন একশ তিন কি সাড়ে তিনেরও বেশি হবে। সবাই আমাদের খাবার-দাবার নিয়েই মহাব্যস্ত হয়ে পড়ল।

মনে আছে তোর তূর্য, সেদিন তোর দাদু মুরগীর খোঁয়ারে মুরগী ধরতে গেলে কি এক মজার কাণ্ড ঘটেছিল। প্রথম সব মুরগীগুলো একসাথে কুক-কুক-কুককুরু-ও-ও-ও কুও, কুককুরু-ও-ও-ও কুও ডাক ছেড়ে সন্ধ্যার শান্ত পরিবেশটাকে এক্কেবারে গরম করে তুলেছিল। তোর দাদু কিছুতেই পারছিল না একটা মুরগী ধরতে। ওরা যেন সব পরামর্শ করে গোল্লাছুট খেলছিল তোর দাদুর সাথে। তারপর তোর দাদুর হাতের ফাঁক গলে একে একে সবকটা মুরগীই বেরিয়ে গিয়েছিল বাইরে। তারপর সেকি হুলুস্থুল! কখনো মনে হচ্ছিল ঈদ বাড়ি, কখনো মনে হচ্ছিল ঝগড়াটে বাড়ি। সে রাতে আমাদের জন্য আর মুরগী ধরা গেল না। এজন্য তোর দাদুর যে কি হাপিত্যেস! রাত দশটার দিকে ভাত খেতে বসলাম আমরা। ডিম ভূণা, মাখা ডাল, করলা ভাজি আর বেগুনের সাথে পুঁঠি মাছের ঝোল দিয়ে। ঘুমাতে গেলাম আমরা অনেক রাতে। অবশ্য সে গ্রামের হিসেবে। শহরেতো রাত এগারটা বাজলে রাত তখন সবে শুরু হয়। আর তোদের গ্রামে তখন ছিল মধ্যরাত। নিশুতি রাত। কোথাও থেকে ভেসে আসছিল শিয়ালের কোরাস, আবার কোথাও থেকে ভেসে আসছিল কুকুরের মিহি সুরের গান। কিন্তু মানুষের কোন সাড়াশব্দ আসছিল না কোথাও থেকেই।

আকাশে সেদিন জ্যোৎস্না ছিল। স্নিগ্ধ আলোর বন্যায় ভেসেছিল চারদিক। তোদের গ্রামে তখন বিদ্যুৎ ছিল না। কিন্তু জ্যোৎস্নার আলোতে বিদ্যুতের অভাব তেমন

অনুভূত হয়নি। আমি, তোর বাবা আর তুই যে ঘরটাতে শুয়েছিলাম সে ঘরটা ছিল টিনের। টিনের চালের মাঝে মাঝেই ফুটা ছিল। সিলিং ছিল না। চালের সেই ছিদ্র দিয়ে জ্যোৎস্না এসে পড়ছিল আমাদের চোখে, মুখে, গায়ে। বাতাসের দোলায় সেই বুটি বুটি আলোও দোল খাচ্ছিল এধারে-ওধারে। কি যে অদ্ভুত সুন্দর! সেই সুন্দরের মাঝে ঘুমিয়ে ছিলাম আমরা। কাকডাকা ভোরে ঘুম ভেঙ্গেছিল আমাদের। টিনের বেড়ার ফাঁক-ফোকর দিয়ে আলো এসে ঘরের অন্ধকার ধুয়ে নিয়ে গিয়েছিল। বালিশের নিচ থেকে ঘড়ি টেনে দেখি মাত্র সাড়ে পাঁচটা বাজে। দরজা খুলে বাইরে এসে আরো অবাক হলাম। চারপাশে তখন দুপুরের ইমেজ। হাসি পেয়েছিল বড্ড আমার। আমাদের ঢাকায় তখন সকাল হতে শুরু করত আটটার পরে আর রাত হতে শুরু করত দশটা-এগারটার পরে। যা এখনও বর্তমান।

রান্নাঘরের দিকে গেলাম। ঘরের দরজায় দাঁড়িয়েই আমার দুই চোখতো চড়কগাছ। তোর দাদু আর বড় চাচী মিলে তখন এক বল তেলের পিঠা ভেজে ফেলেছেন। ভাঁপা পিঠা, চিতই পিঠা আর মেড়া পিঠা হয়ে গিয়েছিল সাতটা বাজার আগেই। আমিও গিয়ে বসেছিলাম ওদের পাশে। কিন্তু তোর বড় চাচী আর দাদু আমাকে কিছুতেই হাত দিতে দিলেন না। তুইও সেদিন ঘুম থেকে উঠেছিলি অনেক আগেই। যে তোকে ঢাকায় আটটার আগে কখনোই ঘুম থেকে তোলা যায়নি, সে-ই তুই-ই সেদিন ছ'টা বাজার আগেই ঘুম থেকে উঠে সারা বাড়িময় মাতিয়ে তুলেছিলি লাফালাফি করে।

তোর দাদু বাড়িটা তখন কেমন ছিল মনে আছে তোর খোকা? তিনটে ঘর ছিল তিনদিকে। তার মাঝে একটা ঘর পুরোটাই টিনের ছিল, আর দু'টো ছিল টিনের চালের নিচে চারদিকে মুলির বেড়া। রান্না ঘরের চালটা ছিল ছন দিয়ে তৈরী। আর চারদিকের বেড়া ছিল শোলার। লেট্রিনটা ছিল বেশ দূরে। জঙ্গলের ভেতর। ঐ লেট্রিনটা ঘিরেও কিন্তু তোর একটা মজার ঘটনা আছে। ভুলে গেছিস্ খোকা? টিনের বেড়ার ভেতর দু'পাশে দু'টো কাঠের তক্তা মাটি থেকে বেশ একটু উপরে শুইয়ে দেয়া হয়েছিল খুঁটিতে ভর দিয়ে। তার মাঝখান থেকে চারপাঁচ হাত লম্বা টিনের টুই পেছন দিকে বিরাট এক গর্তের মুখে নিয়ে লাগিয়ে দেয়া হয়েছিল। বিশাল একটা গাছের গুড়ি ফেলে সিঁড়ির কাজটা সারা হয়েছিল। সকালবেলা সেই লেট্রিনে গিয়ে তুই টিনের টুই সহ ভেঙ্গে পড়েছিলি নিচে। মনে আছে খোকা তোর ? আর সে কি হুলুস্থুল কাণ্ডটাই না ঘটে গিয়েছিল সকাল বেলাতেই। তোর দাদা বাড়ি ছিল না। সাত সকালবেলা নামাজ পড়েই ব্যাগ হাতে বের হয়ে গিয়েছিল বাজারে। আমাদেরকে নদীর টাটকা মাছ খাওয়াবে বলে।

বাড়ির দক্ষিণ দিকে বেশ একটু দূর দিয়েই বয়ে গিয়েছিল ব্রক্ষপুত্রের একটি শাখা নদী শীর্ণ শরীর নিয়ে। নদীটা কি এখনো আছে খোকা? জানিস্ তুই? মনে হয় নেই। ভরাট হয়ে গিয়েছে। সেই নদীতে খড়া পাতা থাকতো। খুব সকালবেলা সেই খড়া থেকে পাওয়া যেত নানা ধরনের ছোট ছোট টাট্কা মাছ। একেবারে প্রাণসহ তাজা মাছ। তোর দাদা সেই মাছ আনার জন্যই বেরিয়ে গিয়েছিল সাত-সকালবেলা।

এদিকে তুই কি কাণ্ডটাই না বাধালি। জামায়, গায়ে এক্কেবারে বিতিকিচ্ছিরি অবস্থা। সবাই তখন পিঠা বানানোর কাজ রেখে তোকে নিয়েই ব্যাস্তহয়ে পড়েছিল। তোর দাদু সাবান নিয়ে এল। তোর বড় চাচী গামছা, বালটি নিয়ে এল। আর তোর বড় চাচাতো তোকে পাঁজাকোলা করে নিয়ে এক্কেবারে পুকুরঘাটে দাঁড় করালো। পুকুরের খোলা জলে তোকে ধুইয়ে শুদ্ধ করে নিয়ে এলো। অসুখ শরীর নিয়ে ছুটে এসেছিল তোর ছোট চাচীও। আর তোর চারটে চাচাতো ভাইবোনদের কাণ্ড কি ছিল মনে হলে এখনো হাসিতে দম আটকে আসে আমার। তুই বাড়িতে যাবার পর ওরা শুধু লুকিয়েই থাকতো। লজ্জায়, জড়তায় একেবারে গুটিসুটি মেরে। তোকে ওরা সহজভাবে গ্রহণ করতে পারছিল না। তুই যেন ভিণ্ কোন গ্রহ থেকে ওদের মাঝে গিয়ে পড়েছিস্। আর সেই ওরা তোকে লেট্রিনের ভেতর ওভাবে পড়ে যেতে দেখে এক্কেবারে হেসে কুটিকুটি। অবশ্য তাও ছিল আড়াল থেকেই। আর খানিক পরপর এসে মার কানেকানে কি যেন গোপন কথা। আমরা ওদের জন্য নতুন জামা কিনে নিয়ে গিয়েছিলাম। আমাদের সামনে ওরা লজ্জায় সেসব ধরলই না। আর যেই আমরা আড়াল হই অমনি চার ভাই-বোনের নতুন জামা নিয়ে সেকি আনন্দ।

তোর বাবাও যেন সেদিন গাঁয়ের সাথে মিশে গিয়েছিল। সকালবেলা উঠেই বের হয়ে গিয়েছিল পাড়া-পড়শিদের কুশলাদি জানার জন্য। সারা গ্রামটা ঘুরে দশটার দিকে বাড়ি ফিরে এল। পাঁচ রকমের পিঠা নিয়ে সামনে দিতেই বললো, আমিতো খেয়ে এসেছি। ছলিম চাচার বাড়ি থেকে শুটকি ভর্তা দিয়ে খুঁদের ভাত। আনিস চাচার বাড়ি থেকে পুলি পিঠা, আরো অনেক বাড়ি থেকে অনেক কিছু। শুনেই আমার গাটা জ্বলে উঠল। তোর দাদু তোর চাচী আযানের সময় উঠে যে পরিশ্রম করলো তার কোন মূল্যই দিলনা তোর বাবা। তোর দাদু কিন্তু একদম রাগ করলেন না। তোর বাবাকে কিছু বললেনও না। আমাকে রাগ করতে দেখে শুধু বললেন, থাক মা। এতদিন পড়ে গ্রামে এল। গ্রামের সবার সাথে কুশলাদি বিনিময় করতে গেলে কিছু না খেলে হয না। এটা আমাদের গ্রাম্য রীতি। একটু পরে না হয় খাবে।

দশটা বাজার খানিক পরেই বাজার থেকে এলেন তোর দাদা। হাতে পেট ফুলানো ব্যাগ। ভেতর বাড়িতে ঢুকেই উঠোনে ব্যাগটা উপুড় করে ঢেলে দিলেন। সে কি দৃশ্য! পুঁঠি, কৈ, টেংরা, ভেড়া, বাইম, চিংড়িসহ আরো বেশ কয়েক রকমের মাছ ভীষণভাবে ছট্ফট্ করছিল। এ যেন ওদের বাঁচার আকুলতা। ভীষণভাবে। কিন্তু

ওরা আসছেই জবাই হতে। বাঁচাবে কে? তোর দাদাতো বাড়ির ভেতরে ঢুকেই তূর্য তূর্য করে এক্কেবারে একাকার। তোকে সেই মাছের পাশে দাঁড় করিয়ে চিনাতে লাগলেন কোনটা কোন মাছ।

আমার যে কি ভাল লাগছিল সেই দৃশ্য। তোর আব্বুর আড়াইটায় ইউনিভার্সিটির ক্লাশ ছিল একটা। সেজন্য এগারটার দিকেই রওনা হবার কথা ছিল আমাদের। কিন্তু সেই মাছ কাটা, ভাজা, পোলাও রান্না করা, মুরগীর কোরমা এসব করতে করতেই তোর দাদু আর চাচীর বেলা হয়ে গেল প্রায় তিনটে। তার উপর তোর দাদা, দাদু, চাচী সবার বারণ।

সেই ভাজা মাছ খাওয়ার কথা ভুলে গেছিস্ খোকা? রান্নাঘরের বাইরে একটা দুই মুখওয়ালা চুলা ছিল। খোলা আকাশের নিচে। মাথার উপর ঝাঁঝাঁলো রোদ ছিল তখন। সেখানে বসে এক চুলাতে তোর চাচী ভাত, পোলাও, কোর্মা এসব রান্না করছিল আর অন্য চুলায় তোর দাদু পুঁঠি মাছ, ভেড়া মাছ ভাজছিল। একটাই মোড়া ছিল তখন তো দাদুর বাড়িতে। সেই মোড়াটা তোর চাচী এনে দিল আমাকে বসার জন্য। কিন্তু তুই দিলিনে। শেষে তুই বসলি মোড়াতে আমি পিড়িতে। তোর বাবাকে আশেপাশে অনেক ডাকাডাকি করেও কোথাও পাওয়া গেল না। আবার বেরিয়েছিল গ্রাম্য সংযোগ সাধন করতে। ঝাঁঝাঁলো রোদের নিচে সেই চুলার পাড় বসে গরম গরম ভাজা মাছ খাওয়া। আহঃ! এখনো জিভে পানি এসে যাচ্ছে। তুই সেদিন কয়টা ভাজা মাছ খেয়েছিলিরে খোকা? মনে আছে তোর? আমার কিন্তু আজও মনে আছে। বলব? লজ্জা পাবি নাতো! সেদিন তোর একের পর এক ভাজা মাছ খাওয়ার হিসেবটা শুধু আমিই করেছিলাম হয়তো। তোর চাচাত ভাই-বোনগুলোও করেছিল কি? ওরাতো অবশ্য তখন ধারে কাছে ঘেঁষতেই সাহস পায়নি। যদি লুকিয়েও আশপাশে সেদিন ওরা থেকে থাকে তাহলে আজও ওরা নিশ্চয়ই হেসে কুটিকুটি হয়। বলেই ফেলি সেদিন কটা ভাজা মাছ সেদিন তুই খেয়েছিলি। পুঁঠি মাছ খেয়েছিলি বাইশটি, ভেড়া মাছ পাঁচটি, টেংরা মাছ এগারটি। দেখিস্ বাবা, এ হিসেব কিন্তু আবার আমার দাদুমনিকে জানাস্নে যেন। তাহলে তোর আর রক্ষে থাকবেনা। সবচেয়ে মজার ব্যাপার কি জানিস্, তোর দাদু যখন বারবার তোকে বলছিল, আরেকটা খাও দাদুমনি। এই যে, এই শের পুঁঠিটা খাও। ঢাকায় এমন মাছ পাবে কোথায়? ঢাকায় এমন তাজা মাছ পাওনা বলেই তো এখানেও খেতে পারছনা। তুমিতো খাচ্ছই না দাদুমনি। শুধু শুধুই তোমার জন্য কষ্ট করছি। এই যে এই ভেড়াটা নাও।

আমি তখন মনে মনে আল্লাহর কাছে দোয়া চাচ্ছিলাম, তোমার পেটটা যেন খারাপ না করে। আর তোমার দাদুর এই ভালবাসার আবদারের মুখে তোমাকে আর খেতে মানা করতেও পারছিলাম না। আমার দোয়া বোধহয় আল্লাহ শুনেছিলেন। তাই

তোমার পেট অবশ্য খারাপ করেনি তবে ফল হয়েছিল একটা। সেটা হল সেদিন দুপুরে আর তুমি ভাত খেতে পারোনি এতটুকুও। সবাইতো অস্থির । কেন খেতে পারছোনা। আর আমি মনে মনে আল্লাহকে ডেকে অস্থির, তুমি যেন আর কিছু না খাও এ বেলা।

তোমার বাবা ঘরে এলেন দুপুর দু'টোর পর। ভাত খেতে খেতে আমাদের তখন চারটা বেজে গেল প্রায়। তোমার বাবা তৈরী হবার জন্য তাড়াহুড়ো শুরু করে দিলেন। পরদিন সাতটায় নাকি তোমার বাবার ক্লাশ আছে। কোন রকম আধা খেচড়া করে গুছিয়ে ভেতর বাড়ি থেকে বের হয়ে আসলাম আমরা। সবার মন খারাপ। তোমার দাদুতো তোমাকে ধরে কেঁদেই ফেললেন। সবাই রাস্তায় উঠার মুখ পর্যন্ত এল আমাদের এগিয়ে দিতে। তোমার দাদা, দাদু, চাচা, চাচী, চাচাত ভাই-বোনেরা সবাই। তোমার ছোট চাচীও এল। তোমার জন্য তোমার দাদু ভাজা মাছ পুঁটলি বেধে সাথে দিয়ে দিল। পিঠা দিল। নারকেল, খুঁদ, গাছের কলা আরো কত কি দিল। তোমার চাচাত দু'ভাই অতি উৎসাহে সেসব বয়ে নিয়ে আসতে লাগলো আমাদের সাথে সাথে।

দিগন্ত প্রসারিত মাঠের মাঝে রাস্তার মুখে এসে দাঁড়ালাম আমরা। এখান থেকেই বিদায় যাত্রা। একটু দূরেই রাস্তার দু'পাশে থেকে থেকে গরুর পাল। লাঠি হাতে রাখাল। বাঁশিও আছে কারো কারো হাতে। সেই বাঁশিতে উঠছে তাদের কষ্টের সুরের মূর্ছনা। সেদিকে তাকিয়েই লাফিয়ে উঠলে তুমি। আজও গোধূলি লগন দেখবে বলে। না দেখে যাবেই না তুমি। তোমার আব্বুতো রেগে-টেগে আগুন। রাগে ফুঁসে উঠে বললেন –

ঠিকআছে। তুমি তোমার আম্মুর সাথে থাকো। আমি দু'দিন পর এসে নিয়ে যাবো। আর দাদা চাচাতো আছেই। ওদের সাথেই দেখতে পাবে গোধূলি লগন।

বেঁকে বসলে তুমি। বললে,
তোমাকেও থাকতে হবে। থাকতেই হবে। নইলে ঢাকায়ও যাব না আমি। গোধূলি লগনও দেখবো না। ভাত খাব না। কিচ্ছু করব না। কিচ্ছু করব না আমি।

কেঁদে কেঁদে একাকার করলে তুমি। তোমার চাচাতো ভাই-বোনেরা তোমার কান্না দেখে যেন মজাই পাচ্ছিল খুব। ওরা হয়ত তখন ভাবছিল, এত্ত বড় পোলা কেমনে কান্দে। শরমও নাই।

তোমার দাদা-দাদু, চাচা-চাচী সবাই পক্ষ নিল তোমার। শেষে পণ্ড হলো আমাদের ঢাকায় ফেরা। জিত হলো তোমারই। আবার ঘরে ফিরে গেলাম আমরা। বিকেল তখন প্রায় সাড়ে পাঁচটা। তোমার বাবা ঘরে ঢুকেই রাগের চোটে শুয়েই এক্কেবারে

ঘুমিয়ে পড়লো। গভীর ঘুম। তুমি আমাদের সাথে ঘরে ফিরলে না। দাদুর হাত ধরে বেরুলে জনসংযোগে। তোমার দাদুর বাড়ির পেছনে পুকুর ছিল একটা। চারপাশে আম, কাঁঠাল, তাল, কদম, কড়ই, লিচুগাছ সারি সারি। তার কিছুদূর পরেই অন্য একটা পাড়া। মাঝের ফাঁকা জমিতে তখন সরষে ফুলের বাগান। সরষে চাষের সময় ছিল না তখন। তবুও ওগুলো বেশ চমৎকারভাবে বেড়ে উঠেছিল কৃষকের অতি যত্নে। হলুদ চাদরে ঢাকা মাঠটাকে কি যে সুন্দর লাগছিল তখন। তোর দাদু, চাচী আর আমি পুকুর পাড়ে দাঁড়িয়ে দেখছিলাম সে দৃশ্য।

জানিস্ তূর্য, সেই তখন-তোদের সারা গ্রামে একমাত্র তোর বাবাই ছিল উচ্চ শিক্ষিত। বড় চাকুরিওয়ালা। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক। গ্রামের মানুষ তাই তোর দাদাকে অতিমাত্রায় ভক্তি শ্রদ্ধা করতো। গ্রামের যে কোন শালিসে তোর দাদা না থাকলে বিচারের রায় ওদের শুদ্ধ হতো না। তোর দাদাও পড়াশুনা জানতেন। তবে মেট্রিকের উপরে নাকি আর যেতে পারেননি। দু'বার পরীক্ষা দেয়ার পর সংসারের হালকেই আঁকড়ে ধরেছিলেন। তোর দাদার তিন ছেলের মাঝে একমাত্র তোর বাবাই উচ্চশিক্ষার নাগাল ধরতে পেরেছিলেন। অবশ্য সেজন্য নাকি তোর দাদার বাড়িতে কিংবা তোদের গ্রামে তোর বাবার প্রতি সবার ভালবাসাই ছিল অন্য রকমের। সবাই আদর করে তোর বাবাকেই বেশি কাছে ডাকত। কথা বলত। তোর বাবাই এসব বলেছিল আমাকে।

আমার কি মনে হয় জানিস্ খোকা, এই যে তোর বাবা এত মেধাবী ছাত্র ছিল এর পেছনে পুরুটাই ছিল আল্লাহর সু-দৃষ্টি। নইলে যে গ্রামে একটা ভাল স্কুল ছিল না, কলেজ ছিল না, শিক্ষিত মানুষ ছিল না, সেই গ্রাম থেকে কেমন করে, তোর বাবা পঞ্চম শ্রেণীতে, অষ্টম শ্রেণীতে টেলেন্টপুলে বৃত্তি পেয়েছিল। এস এস সি এবং এইচ এস সি তে প্রথম বিভাগ পেয়ে একেবারে একলাফে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে গিয়েছিল। তারপর কেমন করে একেবারে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক। একেই কি গোবরে পদ্মফুল ফোটা বলে? তুই আবার কিছু মনে করছিস্ নাতো খোকা? তবে তোর ব্যাপার কিন্তু আলাদা। তোর বাবা মেধাবী, তোর মা-ও কম যায় না। হেসে ফেললি নাতো আবার!

সেদিন তারপর সেই পুকুর পারে দাঁড়িয়ে যখন দেখলাম পশ্চিমাকাশ লাল বধূ হ'তে শুরু করেছে তখনি ওখান থেকে তোর দাদুকে, তোর চাচীকে নিয়ে ঘরে ফিরে এলাম। এসে দেখি তোর বাবা তখনো রীতিমতো নাক ডেকে ঘুমাচ্ছে। আমরা এসে দাঁড়াতেও পারিনি। এমনি সময় তুই এলি হন্তদন্ত হয়ে। এক্কেবারে ঝড় তুলে।

এসেই তোর বাবার ঘুমন্ত শরীরে এক ধাক্কা মারলি। সেই ধাক্কায় তোর বাবা আচম্বিত উঠে একেবারে বসে পড়লো। লাল লাল চোখ তোর বাবার। এরই মাঝে তুই বললি,

ঘুমাচ্ছো কেন? গোধূলি লগ্ন যে চলে যাচ্ছে। রাখালেরা সব গরুর পাল নিয়ে ঘরমুখো হয়ে গেছে। ধোঁয়াটে হয়ে গেছে চারপাশ। জলদি চল।

তোর বাবা ঠাস্ করে তোর গালে এক চড় বসিয়ে দিলেন। আর সাথে সাথেই আবহাওয়া গেল এক্কেবারে পাল্টে। তোর দাদা দাদু তোর বাবার উপর বকুনির ঝড় বইয়ে দিলেন। তোর কান্না থামছে না। শেষে তোর দাদা তোকে নিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন। সেদিন তারপর তোর আর গোধূলি লগ্ন দেখা হয়েছিল কিনা জানিনা, তবে গুমোট আবহাওয়া আর স্বাভাবিক হলো না। তুই ভাত খেলিনা রাতেও। এরপর তোর বাবাও নরম হয়ে গেল খুব। কিন্তু তোকে আর স্বাভাবিক করা গেল না। তোকে অনেক আদর করলো তোর বাবা। সবাই। কিন্তু সেই যে অফ হলি তুই আর অন হলি না। পরদিন খুব ভোরে উঠেই আমরা চলে এলাম ঢাকায়।

আজ এই গোধূলি লগনের সামনে বসে সেদিনের সেই স্মৃতিগুলো এমন স্পষ্ট হয়ে ভেসে উঠছে চোখের সামনে। মনে হচ্ছে স্মৃতি নয়, আমি তুই তোর বাবা যেন এখনি ফিরে এলাম সেই ঝুরনিকান্দা অজপাড়া গ্রাম থেকে। যেখানে তোর দাদুর বাড়ি।

বেলা অনেক গড়িয়ে গেল। এখন সন্ধ্যা প্রায় সাড়ে সাতটা। গোধূলি লগনে যখন শূন্য বাড়িটা ঘুরে গিয়ে বসলাম দোলনায়, মৃদু-মন্দ বাতাসের ঢেউয়ে যখন আপনা থেকেই হালকা দোল খাচ্ছিলাম, চোখ বুজে ভাবছিলাম জীবনের পাওয়া না পাওয়ার অসমাপ্ত অধ্যায়, এরই মাঝে কখন যে চোখ খুলে তার দৃষ্টি চলে গেল পশ্চিমাকাশে। আর সেদিকে তাকিয়েই বুকের ভেতরটা কেমন জানি হু হু করে উঠল তোর জন্য। মনটাকে কিছুতেই নিজের মাঝে ধরে রাখতে পারলাম না। উঠে গিয়ে বেডরুম থেকে কাগজ কলম এনে আবার গিয়ে বসলাম দোলনায়। ওখানে বসেই চিঠিটা শুরু করেছিলাম। এরই মাঝে গোধূলি লগ্ন কেটে সন্ধ্যা নেমে এল। তখন উঠে এলাম কাগজ কলম সহ। নামাজ পড়লাম। তজবিহ্ জপ করলাম। তারপর আবার বসলাম চিঠিটা নিয়ে।

এখন সন্ধ্যাও প্রায় শেষ হয়ে এল। বাইরে রাতের ইমেজ। খোকা, তুই কি করছিস্ রে এখন? বড্ড দেখতে ইচ্ছে করছে তোকে। ছোট্টবেলাটির মতো তোর মুখে ভাতের লোকমা তুলে দিতে ইচ্ছে করছে। বহুদিন থেকেইতো একাই আছি। কিন্তু আজ যে বড় বেশি নিঃসঙ্গ লাগছে। ঐ গোধূলির আকাশটাই কি আমাকে আজ এমন

ছন্নছাড়া উদাস করে তুলল কিনা বুঝতে পারছিনা। তোর বাবা নেই আজ বত্রিশটা বছর হয়ে গেল। মুক্তিযুদ্ধের সময় ওরা তোর বাবাকে বাসা থেকে ডেকে নিয়ে গেল। সেই যে গেল আজও ফিরে এলো না। তুই তখন সবেমাত্র ক্লাশ নাইনে পরিস্। তারপর আজ এতটা বছর। তোকে মানুষ করার অঙ্গিকার নিলাম। সফল হয়েছি রে খোকা? জীবনের উপর দিয়ে কত যে ঝড় বয়ে গেল। তারপরও শক্তহাতে এই ছোট্ট বুকটার মাঝে চেপে ধরে আগলে রেখেছি তোকে।

খোকা, আজ আমার এমন লাগছে কেন রে? মনে হচ্ছে কতদিন, কতযুগ ধরে যেন কাঁদিনা। তুই ছোট বেলায় কাঁদলে আমি যেমন করে তোকে বুকে জড়িয়ে ধরে তোর কান্না থামাতাম, আমারও আজ খুব, খু-ব, খু-উ-ব ইচ্ছে করছে আমি কাঁদি, অঝোর ধারায় কাঁদি। আর তুই ঠিক তেমনি করে আমাকে তোর বুকে জড়িয়ে ধরে আমার কান্না থামিয়ে দে। তূর্য রে। বাপ আমার। আমার জীবনের অনেক ত্যাগের পরিণাম তুই। কোনদিন কোন মুহুর্তেও ভুল করেও তুই কখনো আমার সেই ত্যাগকে অসম্মান করিসনে রে খোকা। আমি, তোর বাবা, তোর জন্মের পর পুরু একটি বছর তোর নাম খুঁজে বেড়িয়েছি। সেই এক বছর তোকে আমরা খোকা বলেই ডাকতাম। তারপর অনেক খুঁজে খুঁজে তোর নাম রেখেছি তূর্য। তুই কি তোর নামের অর্থ জানিস খোকা? তূর্য মানে কি জানিস? তূর্য হচ্ছে প্রাচীন রণবাদ্য। শুধু একটা কথা মনে রাখিস, আধুনিক শিক্ষা কিংবা আধুনিক বিজ্ঞান আমাদেরকে যতই ঐশ্বর্য দিয়ে থাক না কেন প্রাচীনত্বের হাত ধরেই তা এসেছে, আসবে। কাজেই নতুনকে পেয়ে পুরাতনকে, পুরাতনের প্রচীনত্বকে মুছে ফেলিস না যেন।

তোর শুনে খুব মন খারাপ হবে হয়ত, আমাদের সেই খুশির মা আজ দুপুরে মারা গেছে। তোর বড় হওয়ার পেছনে খুশির মার খুব অবদান রয়েছে। তোর মনে আছে কিনা জানিনা, তোর বাবা নিখোঁজ হওয়ার পর ছ'মাসের মতো আমরা ইউনিভার্সিটির কোয়ার্টারে ছিলাম। স্বাধীনতার পর স্বাধীন দেশের সরকার অসহায় এই আমাকে আর তোকে করুণার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল। আত্নসম্মানে লেগেছিল খুব আমার। জানিনা কেন। কেন জানি মনে হচ্ছিল এ দান নিলে তোর বাবাকে অসম্মান করা হবে। আল্লাহর উপর ভরসা করে তোকে নিয়ে খোলা আকাশের নীচে এসে দাঁড়ালাম। অবশ্য তোর দাদুর বাড়ি চলে গেলেও পারতাম। তোর চাচা, দাদা, দাদু ওরা যে কেউ চায়নি তা নয়। তবু গেলাম না আমি। আসলে ওখানে গিয়ে হয়ত আমি মানিয়ে নিতে পারতাম কিন্তু তোকে মানুষ করার অঙ্গীকার কিভাবে পুরণ করতাম আমি। আমাকে ভুল বুঝিসনে যেন বাবা।

আমি ছোটবেলা থেকেই বেড়ে উঠেছি শহরে। মরুভূমির গাছকে যদি সবুজ ঘেরা পৃথিবীর মাটিতে এনে লাগিয়ে দিস তাহলে সে কি তার প্রাণ ধরে রাখতে পারবে? কিংবা সবুজ ঘেরা পৃথিবীর মাটি থেকে যদি কোন গাছ তুলে নিয়ে মরুভূমিতে

লাগিয়ে দিস তাহলে সেটাই বা কি তার প্রাণ নিয়ে বেড়ে উঠতে পারবে? পারবে নারে খোকা। মাঝখান থেকে শুধু শুধু দোষ হয় গাছ বেচারার। আমিও পারলাম না। অবশ্য কিছুদিনও যে তোর দাদুর বাড়ি ছিলাম না তা নয়। বছর খানেকেরও বেশি ছিলাম। কিন্তু বুঝতে পারছিলাম আমার প্রাণ তখন কেবলি শরীর ছেড়ে বেরিয়ে যাবার জন্য আকুলি বিকুলি করতো। শেষে একদিন তোকে নিয়ে বের হয়েই পড়লাম। তোর বাবার পরিচয়ে ইউনিভার্সিটির প্রায় সব শিক্ষকের সাথেই আমার ভাল পরিচয় হয়ে গিয়েছিল। তাদেরই একজনের কাছ থেকে একটা রুম চেয়ে নিয়েছিলাম। কয়েকজন শিক্ষকের চার-পাঁচটা ছেলে মেয়েকে পড়ান শুরু করলাম। আর সাথে সাথে শুরু করেছিলাম তোকে মানুষ করার অক্লান্ত চেষ্টা। সেই বাসাতেই একদিন খুশির মা এলো। কাজের খোঁজে। পরপর চার পাঁচদিন এলো। জীবনের কষ্টের উপাখ্যান শোনাল। স্বামী তার একটি মাত্র মেয়ে খুশিকে রেখে ওকে বের করে দিয়েছে বাড়ি থেকে। বিয়েও করেছে। তবে তালাক দেয়নি খুশির মাকে। দেনমোহরের অংকটা নাকি ওর স্বামীর নাগালের বাইরে ছিল।

শেষে রেখে দিয়েছিলাম আমি খুশির মাকে। সেই থেকে সে আমাদেরই কাছে। আমি তুই আর খুশির মা। সপ্তাহ খানেক আগে খুশির মা ওর স্বামীর বাড়ি গিয়েছিল। খুশির খবর জানতে। জীবনের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে হয়তবা পৃথিবীতে তাকে ধরে রাখার একমাত্র বৈঠাটিকে দেখার জন্য মন ছটফট করে উঠেছিল। আমিও মানা করিনি। মেয়ের জন্য বেচারী চারটা শাড়ী কিনে নিয়ে গিয়েছিল। সেই যে গেছে তারপর আজ দুপুরে একজন লোক কোথা থেকে ফোন করে জানাল খুশির মা মারা গেছে। স্বাভাবিক এই খবরটা শোনার পরও মনের কোথায় যেন চিনচিন করে একটা অস্বাভাবিক প্রশ্ন খেলে গেল, খুশির মা কি সত্যিই মারা গেছে! নাকি অন্য কিছু।

যাক ওসব। সংবাদটা শোনার পর থেকেই মনটা বিষণ্ণতায় ছেয়ে আছে। কেবলি থেকে থেকে তোকে মনে পড়ছে। বৌমাকে মনে পড়ছে। টুসি দাদুমনিকে মনে পড়ছে। আমারতো এই সংসারে একেবারে নিজের বলতে আর কেউ নেই রে। অনেক কষ্ট করে যে আমি গড়েছি তোকে। তোকে ডাক্তার বানিয়েছি।

আর তুইওতো আমার চেয়ে কম যাসনে। এক্কেবারে মা কা বেটা। আমার এতটুকু কষ্টের অবকাশ রাখছিস না। ধানমণ্ডিতে বাড়ি করে দিয়েছিস। প্রতি মাসে টাকা পাঠাচ্ছিস। প্রায় প্রতিদিন ফোন করছিস। প্রতিবছরই দেশে এসে বাড়িঘর পরিষ্কার করে দিয়ে যাচ্ছিস। বাকী থাকলো শুধু আমার একাকীত্বটুকু। সে আমি মেনে নিয়েছি খোকা। আমরা জীবনে পেট পুরে না খাওয়ার কষ্ট অনেক করেছি। এখন পৃথিবীর যে কোন প্রান্তে থেকেও যদি পেট পুরে খেতে পাওয়া যায় তাতে অন্তত

আমার কোন মন খারাপের কিছু নেই। তাছাড়া আমরাতো সবাই একই পৃথিবীর অধিবাসী।

আজ যে আমার কি হয়েছে রে খোকা। বুঝতে পারছিনা। মনটা ভীষণ এলোমেলো। গতবার ঢাকায় এসে গেটের দু'পাশে যে দুটো মুছান্দা আর রঙ্গন ফুলের চারা লাগিয়ে গেছিস মনে আছে তোর? সে গাছ দুটো বেশ ঝাকড়া হয়ে উঠেছে এখন। আজ সকালবেলা সবগুলো গাছের পরিচর্যা করলাম একটু। বারান্দার টবের গোলাপ গাছগুলোতে বেশ কটা গোলাপ ফুটেছে। সাদা গোলাপ ফুটেছে চারটি, গোলাপী তিনটি আর কাল একটি। সেদিকে তাকালে মন কেমন হয়ে যায়।
আজ যদি তোর বাবা বেঁচে থাকতেন কি যে খুশি হতেন। ঠিক এমন একটা স্বপ্নের কথা তিনি শোনাতেন আমাদের সবসময়। তোর বাবা কি জানে খোকা, তোর বাবার স্বপ্ন যে আজ আর স্বপ্ন নেই। একেবারে জলজ্যান্ত বাস্তব। তোর বাবাকে তোর কতটুকু মনে আছে খোকা? তুইতো তখন মাত্র নাইনে পড়তিস। আমার খুব ইচ্ছে ছিল তুই আর্টর্স নিয়ে পড়াশুনা করবি। সাহিত্যকে লালন করবি। কিন্তু তোর বাবার জন্য হলো না।

তোর বাবার সাফ কথা, সাহিত্য ব্যাপারটা পড়শুনা করে হয় না। ওটা অন্তরাত্মা থেকে আপনা থেকেই বের হয়ে আসে। অবশ্য যার আসে। আর যার না আসে ওটা কোন ভাবেই তার মাঝে আনা সম্ভব নয়। সাহিত্য ব্যাপারটা পুরুটাই আত্মিকতার সাথে জড়িত। গড গিফটেড আমরা যাকে বলি। ওটা যার ভেতরে বাস করে সে বিজ্ঞান পড়লেও বের হয়ে আসবে। আবার না থাকলে কলা নিয়ে পড়াশুনা করলেও আসবেনা। মানুষের অন্তরাত্মার সাথে এর সম্পর্ক।

তুই সাহিত্য-টাহিত্য কিছু পড়িসরে খোকা? নাকি মানুষের শরীর কাটাকুটি করতে করতে মনটাও ওরকম বানিয়ে ফেলেছিস। সাহিত্য পড়িস। যে মানুষ জীবনে একটিও সাহিত্য পাঠ করেনি সে মানুষের চেয়ে পঙ্গু জীবন বুঝি সত্যিকার পঙ্গুত্বের জীবনও নয়। সবচেয়ে বেশি পঙ্গু সে_তার নিজের মনের কাছে। তুইতো দেশে থাকতে যথেষ্টই সাহিত্য নিয়ে নাড়াচাড়া করেছিস। আমার রিডিং রুমে বই এর যে মস্তবড় সংগ্রহ রয়েছে সেখানেতো অনেক বই-ই তোর কেনা। পেট ভরে ভাত খেতে, মাকে খাওয়াতে আমেরিকা গিয়েছিস। ওখানকার তোর মনের কাছাকাছি তো আমি নেই। সাহিত্যটা ছেড়ে দিস না বাবা। তাহলে যে পাথরের সাথে তোর মনের কোন পার্থক্য থাকবে না আর। পেটের ক্ষুধা মেটাতে গিয়ে মনকে মরুভূমি করে ফেলিস না। বিশ্বের যত বড় বড় লেখক রয়েছেন তার বেশির ভাগটাই কিন্তু জন্মেছে তুই এখন যেখানে রয়েছিস সেখানে।

রাত অনেক হয়ে এল। বারটা বেজে দশ মিনিট হয়ে সাত সেকেন্ড পার হচ্ছে। ঘুমুচ্ছিস রে তূর্য। আমার ঘুম আসছে না। তোকে লিখতে লিখতে আজ রাতের খাবারও খাওয়া হয়নি। আজ আর খাবনা। এত রাতে খেলে হজম হতে সমস্যা হয় বড্ড। টুসিটা কি ঘুমিয়ে পড়েছে এখন? কতদিন যে তোর ঘুমন্ত মুখটাকে দেখিনারে খোকা। ঘুমিয়ে পড়লে তোর মুখটা কি সেই আগের মতই থাকে? বড্ড দেখতে ইচ্ছে করছে। তুইতো বিদেশ যাওয়ার আগের দিনও ঘুমুতে যাওয়ার আগে আমার মুখ না দেখে ঘুমুতে পারিসনি। এখন কি করিস রে খোকা? আর ছোট্টবেলায় তুই যতক্ষণ না ঘুমাতি ততক্ষণ আমাকে তোর মুখের দিকে পলকহীন ভাবে তাকিয়ে থাকতে হতো। হঠাৎ তুই চোখ খুলে যদি দেখতে পেতিস কখনো, আমি চোখ বুঁজে আছি কিংবা অন্যদিকে তাকিয়ে আছি তাহলেতো আর রক্ষে ছিল না। একেবারে চিৎকার করে কেঁদে কি কাণ্ডটাই না বাঁধিয়ে ফেলতিস।

সেই খোকা আজ আমার তার খুকির বাবা।

তোর ঘুমন্ত মুখটা আজ খুব, খু-ব দেখতে ইচ্ছে করছে রে খোকা। জানিস, আজ সকালে দাড়োয়ানকে দিয়ে ছোট মাছ আনিয়েছিলাম। আমি নিজেই রান্না করেছি। দুপুরবেলা যখন খেতে বসেছি কেন যে খেতে পারলাম না জানিনা। তুই খুব পছন্দ করতিস ছোট মাছ। যেদিন টেবিলে ছোট মাছ থাকতো সেদিন ভাত কম পড়তো। বেশি ভাত খেতিস সে বেলা তুই। ওখানে কি ছোট মাছ পাওয়া যায় রে খোকা? বৌমাকে বলিস তোকে ছোট মাছের ঝোল করে দিতে।

তূর্য। আমার তূর্য। আমার বড় আদরের তূর্য। আমি পৃথিবীতে হয়ত অনেক ব্যাপারেই সার্থক নারী হতে পারিনি। কারণ, একজন মানুষের পক্ষে জীবনের চারদিকেই সার্থক হয়ে উঠা সম্ভব নয়। মানুষকে সে সুযোগ বিধাতাই দেননি। তবে আমি সার্থক মা হয়েছি। আমার যে আজ কেনো এমন অগোছালো লাগছে আমি বুঝতে পারছিনা। গোধূলি লগনের সেই লাল শাড়ি পড়া আকাশটাই আজ আমাকে আমার ভেতর থেকে বের করে এনেছে। আমার মনটাকে ভীষণ এলোমেলো করে রেখে গেছে। ভাবছি কটাদিন তোমার দাদুর বাড়ি গিয়ে থাকবো। সেই ঝুরনিকান্দা গ্রামে। কিন্তু গ্রাম হয়তো এখন ঠিকই আছে, শুধু বদলে গেছে শহরের মতো গোধূলি লগন। রাখাল, রাখালের মন উদাস করা বাঁশীর সুর, গরুর পাল, গোধূলি লগনে ঘরমুখো গরুর পালের খুরের আঘাতে ধুলা উড়ে চারপাশ ধোঁয়াটে হয়ে যাওয়া, আঁকাবাঁকা পথ কিছুই হয়তো এখন আর নেই। হয়তো নেই সারা গ্রাম জুড়ে তোমার বাবার মতো মাত্র একজন শিক্ষিত মানুষ। তবু যাব। শুধু যাব সেখানে তোমার বাবা ছিল। এইজন্য। তোমার শেকড়ও যে সেই ঝুরনিকান্দা গ্রামেই। শুধু এইজন্য যাবো।

তুমি ভাল থেকো বাবা। খুব, খু-ব, খু-উ-ব ভাল থেকো। টুসি দাদুমনিকে আমার আদর দিও আবারও। বৌমার প্রতি যত্ন নিও। বৌমাকে কখনো অবহেলা করোনা। কষ্ট দিও না। মনে রেখো, জীবনের দ্বিতীয় ভাগে একজন পুরুষকে কিন্তু কিছুই ছাড় দিতে হয় না। আর একজন নারীকে তার জীবনের প্রথম ভাগকে এক রকম ভুলে যাওয়ার অঙ্গীকার করতে হয়। শুধু সেখানেই শেষ নয়, স্বামীর সব কিছুকে সে যদি স্বামীর পছন্দ অনুযায়ী মেনে নিতে না পারে তাহলেই ওর হয় হার। জীবনের কাছে চরম পর্যায়ের এক হার। যা তাকে তার সামাজিক অবস্থান থেকেও বিচ্যুত করতে পিছ পা হয় না। অবশ্য এ রীতি আমাদের সমাজ ব্যবস্থার জন্য। আমি চাই আমি যেমন একজন সার্থক মা হয়েছি, তুমি হয়েছো সার্থক সন্তান, ঠিক তেমনি তুমিও হবে একজন সার্থক স্বামী, সার্থক বাবা।

বৌমাকে আমার দোয়া রইল। বৌমা আমার খুব লক্ষ্মী মেয়ে।

রাত সাড়ে বারটা পার হয়ে গেলরে খোকা। আমার জন্য মোটেও দুশ্চিন্তা করিস না যেন। ঐ গোধূলি লগনটাই যত্তোসব গোলমাল বাধালো। নইলে কি সকাল ছ'টায় পুরো একঘন্টা পাঁচ মিনিট আমার খোকার সাথে গল্প করার পর গোধূলি লগনের সাড়ে ছ'টা না বাজতেই তোর কাছে আবার হৃদয়ের ঝাপি খুলে বসি। পাগলিনী মা তোর। ভাল থাকিস্ খোকা। আবারও-

আমার স্নেহাশীষ নিস্।
আমার ভালবাসা নিস্ ।
আমার অনেক অনেক আদর নিস্।

তোর মা।

মোঃ শহিদুল ইসলাম*

কনসার্ট

দেহটা ক্লান্ত হয়ে পড়লেও হৃদয়ের মধ্যে যে বরফের পাহার বেঁধেছিল সেটাকে গলিয়ে নিয়ে এলাম।

বেশ ক্লান্ত লাগছে। কিন্তু মনে যেন আনন্দের জোয়ার বয়ে চলছে। তা না হলে এ ক্লান্ত শরীরে কেন নাচের ঝুমকা বেজে উঠবে। দেহের সাথে মনের একটা সম্পর্ক থাকে। দেহ ক্লান্ত থাকলে মনের স্বাদও কমে আসে। কিন্তু আমার ক্ষেত্রে ঘটেছে উল্টো। দেহটা ক্লান্ত বটে কিন্তু মনটা চাঙে উঠে বসে আছে।

আসলে মনটা আমার অবাধ্য। কোন কথা শোনে না। কথা শুনলে হয়ত চাঙে না রেখে মেঝেতেই রাখতাম। চাঙে উঠে সে যেন লাফাতে শুরু করেছে। থামানোর কায়দা পাচ্ছি না। তাই অপারগ হয়ে ছেড়ে দিয়েছি। নেচে মরুক। গতকালও মনটা বিষণ্ন ছিল। কিন্তু সন্ধ্যার পর থেকে সে হয়ে উঠেছে দুরন্ত অশ্বের মতো। থাক সে কথা। মনটাকে মুক্ত ভাবে ছুটতে দেখেছি। তাই ধন্য।

গতকাল দিনের শেষে আড্ডা দিচ্ছিলাম বন্ধু মহলে। অনেক আলাপের মধ্যে হঠাৎ কেউ মাঝখান থেকে বলে উঠল, আগামীকালের কনসার্টটা বেশ জমে উঠবে। কনসার্টের কথা আমাদের জ্ঞাত ছিল। তাই অনেকে বলে উঠল, কনসার্টের কথা বলতে হয় নাকি। ওটা ক'জনে মিস করে। তার মধ্যে আবার নগর বাউল।

এতক্ষণ চুপ করেই ছিলাম। কিন্তু কথাটা শোনার পর মনে যেন বসন্ত বয়ে এল। তাই বলে উঠলাম, তোরা সবাই যাবি? একসাথে অনেকে বলে উঠল – যাবো না মানে!

আমি আবার চুপ করে বসে রইলাম। ওরা যাবার সময় নির্ধারণ করল। আমার বোধহয় যাওয়া হবে না। নগর বাউল যে আমার প্রিয় নয় তা নয়। পরশু টিউটোরিয়াল থাকায় আমার যাওয়া হচ্ছে না। তাই মনের কাটাটা আঘাত করলেও সহ্য করছিলাম। চারদিকে অন্ধকার হয়ে আসছিল। কাজেই আলোচনার সমাপ্তি

*শিক্ষার্থী, ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগ, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ।

ঘটিয়ে বাড়ির দিকে রওনা হলাম। কিন্তু কনসার্টের চিন্তা এখনও মাথা থেকে যায়নি।

এতক্ষণ যেটা থেকে বিরত থাকার চেষ্টা করেছি সেই চিন্তাই যেন মনের জায়গা দখল করে নিল। শত চেষ্টা করেও তা ঘোরাতে পারলাম না। প্রশ্ন করে উঠল, "তুমি যাবে না কেন? নগর বাউল আসবে। তাকে তো একবার দেখতে যাবে।" আমি মনের বিরুদ্ধে চলতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু বার বার সেই-ই জয়ী হয়ে উঠছে। সে কত কি ভাবছে। কাল কনসার্টে যাবে, গান শুনবে। এমনি করে বাড়ি ফিরে এলাম।

বিলম্ব না করে পড়ার টেবিলে বসলাম। ইতিমধ্যে পড়াও শুরু করলাম। কিন্তু কখন যেন অবাধ্য মন পড়ার গণ্ডি পেরিয়ে চলে গেছে কনসার্টে। মনকে বেঁধে রাখতে পারলাম না। যদি বাধা যেত তাহলে বড় একটা তালা ঝুলিয়ে বন্দি করে রাখতাম।

কিন্তু তা সম্ভব নয়। সে চলে তারই ইচ্ছা মতো। চলে যায় তাজমহলে, কখনো নদীর ধারে। আবার কখনো সুন্দর বনের রয়েল বেঙ্গলের পিঠে চড়ে ঘুরে বেড়ায়। তাই সে নিজেই একটা কনসার্ট তৈরী করে গান শুনছে। সে গানের গায়ক জেমস্।

কনসার্টের শেষের দিকে একটা গানের কলি টান দেওয়ার সময় আমার মনও সুর মেলাতে গিয়েছিল তার সাথে। সেই টানই যে তার শেষ টান হবে তা কে জানতো। টানের সাথে বসে থাকা চেয়ারটাও উল্টে পড়েছিল পেছন দিকে। আমি তখন টের পেলাম যখন চেয়ার সমেত মাটিতে লুটিয়ে পড়লাম। বুঝলাম,মন আমার সাথে রসিকতা করল।

বেশ রেগে পড়তে শুরু করলাম। পরশু আমার পরীক্ষা। সন্ধ্যা থেকে রাত বারটা পর্যন্ত যা পড়লাম তার ফলাফল দাঁড়িয়েছে শূন্য।

বাঙালী হয়ে বিদেশী গানের প্রতি এত ঝোঁক। কনসার্টেতো একটাও বাঙালী অনুকরণে গান গাওয়া হয় না। যদি হতো তাহলে বিদেশী মিউজিকে গড়া গানের দিকে কান যেত না। আমরা আধুনিক হতে যেয়ে গিটার হাতে নিয়ে বিদেশীদের মতো বাজাতে পারি বটে কিন্তু সেই মিউজিকে নিজের দেশের গানের সুর তাল মিলাতে না পেরে হয়ে যাচ্ছে বিকৃত। ফলে আমাদের গানের সুর হারাচ্ছে নিজস্বতা। হারমোনিয়াম,তবলা, একতারা আজ ব্যাকডেটেড। এ রকম আরো অনেক কথাই নিজের মনকে শুনালাম।

তারপর অনেকক্ষণ ভেবে বললাম, এ জন্য তো নগর বাউল বা অন্য কোন ব্যাণ্ড শিল্পী দায়ী নয়। দায়ী আমাদের রুচি। বাঙালী হয়েও আমাদের রুচিবোধ বিদেশী। বিদেশীদের অনুকরণ করতে গিয়ে আমরা আমাদের সংস্কৃতিকে ঠেলে দিচ্ছি রসাতলে। বিদেশীদের চুল কালো করার তেল আমরা চুলের সাথে শরীরেও মাখি। ফলে চুলের সাথে আমাদের শরীরটাও হয়ে যায় কালো।

অনেক রাত হলো। চারদিক নিস্তব্ধ। চোখের পাতাও ঘুমে বন্ধ হয়ে আসছে। কাজেই ওসব চিন্তা বাদ দিয়ে বালিশে মাথা রাখলাম।

খানিক বাদেই হারিয়ে গেলাম ঘুমের দেশে।

হিরন্ময় হিমাংশু*

সেদিন আকাশ মেঘলা ছিল

শরীরটা একটু মৃদু ঝাঁকানি দিয়ে অসার হয়ে পড়ে থাকা হাত দুটো মুষ্টিবদ্ধ হতে হতে চোখের পাতা কাঁপতে থাকে শিমুনার। পাশে দাঁড়িয়ে ডা. মিত্র আর সহকারী নার্সটি প্রচণ্ড উৎকণ্ঠা নিয়ে শিমুনার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। শিমুনার চোখের পাতা কাঁপতে কাঁপতে সামান্য ফাঁক হয়। ডা. মিত্র'র সাদা পোশাক শিমুনার চোখে পুরোপুরি ভাসতে না ভাসতে আবার তার চোখ বুজে আসে । সাদা হাল্কা লালের সাথে মিশাল হয়ে আকাশের নীল আর কালো মেঘের মিশ্রণ স্মৃতিপটে হজবরল হিজিবিজি কাটে অনেকক্ষণ। অতঃপর মুষ্ঠিবদ্ধ হাত মেলান হয় শিমুনার। ডা. মিত্র একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ওসিসি ওয়ার্ডের বাইরে বেরিয়ে আসে। রামিজ আর তার স্ত্রী প্রচণ্ড উৎকণ্ঠা নিয়ে ডাক্তারের মুখোমুখি হয়। জিজ্ঞাসা করে, স্যার আমার -। কথা মুখেই থেকে যায় ওদের। জবাবে ডা. মিত্র 'জ্ঞান ফিরেছে তবে এখনো আশঙ্কা মুক্ত নয়' বলেই তার অফিস রম্নমে ঢুকে যায়। উদ্বিগ্ন পিতা-মাতা শিমুনার রুমে যায়। ততক্ষণে নার্স ঘুমের ইনজেক্শন দিয়ে আবার ঘুম পাড়িয়ে রেখেছে শিমুনাকে। শিমুনার নিস্তেজ দেহটা হাসপাতালের বেডে বাবা-মা সনাক্ত করে। স্নেহের সন্তানকে তারা জড়িয়ে ধরতে চায়। নার্স বাধা দিয়ে বলে- এখন কান্নাকাটির সময় নয়, বাইরে যান প্লীজ। সন্তানের কল্যাণার্থে তারা সংযত হয়ে বেরিয়ে আসে ওসিসি ওয়ার্ড থেকে।

জ্ঞান ফিরেছে ঠিকই কিন্তু ডাক্তারের কথায় যা বুঝা গেল এখনো স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসেনি শিমুনা। তাহলে কি মেয়েটা - - আর ভাবতে পারেনা তারা। শুধু শিমুনার অতীতের দিকে তাকিয়ে অনুশোচনায় বুক ভরে যন্ত্রণা অনুভব করে। হয়তো মেয়েটা আর কখনোই স্বাভাবিক হবেনা। আর হলেও কি ও স্বাভাবিক ভাবে বেঁচে থাকতে পারবে? চলতে পারবে সমাজে আর দশটা সাধারণ মেয়ের মত? ও হয়তো চেষ্টা করবে কিন্তু সমাজ মানবে না। এই অনিয়মের সমাজটা কখনোই মানেনা, মানেনা মনুষ্যত্ববোধের স্বাভাবিক নীতিগুলো। দ্রব্যমূল্যের পঙ্খিরাজে চাপা দেশের মধ্যবিত্তের যন্ত্রণায় বেড়ে উঠা শিমুনার একটা ছোট্ট আশা ছিল, ও নার্স

---

* শিক্ষার্থী, বাংলা বিভাগ, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ।

হবে। আর্তপীড়িত মানুষের সেবা করতে করতে উদ্দেশ্যহীন নিরর্থক জগতে বেঁচে থাকার অর্থ খুঁজবে। অনিশ্চয়তার জ্বলন্ত সমকালে আশাটা জ্বলতে থাকে রামিজের হৃদপিন্ডে। কারণ মেয়ের আশাটা হৃদয়ে পুরে অর্থবোধক করে তুলেছিল সে। এ মুহূর্তে এই যন্ত্রণা তাকে বেশি পোড়ায়। একটা একান্ত আশা যখন সমকালের বন্ধুর পথে হোঁচট খায় তখন উদ্দেশ্যহীন যন্ত্রণায় ও জ্বলতে থাকে। রামিজ ভাবতে ভাবতে ভাবনা সাগরের তল খুঁজে ফিরে। কিন্তু পায়না, যেমন ও পায়না নিঃস্পাপ মেয়েটার এই পরিণতির কারণ। মেয়েটা তার অন্তরঙ্গ বন্ধু। কোথাও থেকে বাড়িতে এলেই গলা জড়িয়ে ধরে বলত- আমার সোনা বাবা কোথায় ছিলে এতক্ষণ।

রামিজ কোলে নিয়ে বলত লক্ষ্মী মা আমার, এই তো তোমার পাশে আছি। বাবা-মেয়ের মধ্যে ভালবাসা ছিল অত্যন্ত নিখুঁত। মাঝে মাঝে শিমুনার মা বিরক্ত হয়ে বলতো আদর দিয়ে দিয়ে মেয়েটাকে মাথায় তুলছ। এর ফল ভাল হবে না কিন্তু।

এইতো গত বছরের ঘটনা। শিমুনাকে না জানিয়ে ও এক আত্মীয়র বাড়িতে বেড়াতে যায় দু'দিনের জন্য। সে দু'দিনই শিমুনা পানি ছাড়া কিছুই মুখে দেয়নি। তার মায়ের শত অনুনয় বিনয় কোন কাজে আসেনি। শুধু একটাই অভিযোগ, বাবা কেন তাকে বলে গেলনা? অবশেষে লোক পাঠিয়ে রামিজকে নিয়ে আসা হয় এবং রামিজ নিজের হাতে শিমুনার মুখে ভাত দিয়ে অনশন ভঙ্গ করে। অতঃপর বাবাকে জড়িয়ে ধরে কি যে কান্না শিমুনার!

আজ শিমুনার শরীরটা নিথর হয়ে বিছানায় পড়ে আছে। একটু স্পর্শ পর্যন্ত করতে পারছে না সে। বুকটা তার মোচড় দিয়ে ওঠে, হাহাকার করে ওঠে। মেয়েটা বেঁচে আছে তারপরও কি যেন হারানোর যন্ত্রণায় তার মন বিষণ্নতায় ভরে থাকে সারাক্ষণ। সেই নরপশুদের প্রতি তীব্র ক্ষোভে ও জ্বলতে থাকে। যারা তাঁর আদরের মেয়েটার সব কিছু কেড়ে নিল, যারা তার আশার ছেদ টানল। তার তীব্র ক্ষোভ হয় সেই সাংবাদিকদের উপর যারা ঘটনাটা বুঝে উঠার আগেই বস্তাপচাঁ খবরের কাগজগুলোকে সংক্রমিত করল। যারা নাম ধাম বিবরণ ছেপে দিল। তাদের ব্যবসা বাড়ানোর জন্য মেয়েটার ভবিষ্যৎ নষ্ট করল।। খবরের কাগজগুলো মনে করল সমাজের প্রতি তাদের দায়িত্বপালন করল। কিন্তু দায়িত্ব পালন করতে যেয়ে কি যে তারা সর্বনাশ করল তা বুঝেও বুঝলনা। তারা মেয়েটাকে বাঁচিয়ে ঘটনাটা প্রকাশ করতে পারতো। অন্যভাবে। কিন্তু তা না করে তারাও নরপশুদের ভূমিকায় অবতীর্ণ হলো। মেয়েটার ভবিষ্যৎ গায়ে মেখে চার-পাঁচ দিন ধরে ওরা হৃষ্ট-পুষ্ট হল। আমরা যতই নিজেকে সভ্য বলে দাবি করিনা কেন, আসলে সভ্যতার কোন ছোঁয়াই আমাদের স্পর্শ করেনি। পারবে আমাদের সভ্য পরিবারের কেউ মেয়েটাকে মেনে নিতে? জানি তাতে খটকা বাঁধবে মনে, পরিবারে, সমাজে। কিন্তু আমাদের খটকা

বাঁধেনা অযৌক্তিক ভুল ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে যখন সমাজপতিরা বিধানের ব্যাখ্যা প্রদান করে। কি সহজেই আমরা মেনে নিই নির্বোধের মতো।

এমন সময় নার্স ওসিসি ওয়ার্ড থেকে বেরিয়ে দ্রুত অফিসের দিকে গেলে রামিজের ভাবনায় ছেদ পরে। কিছু বুঝে উঠার আগেই ডাক্তারকে নিয়ে নার্স ওসিসি ওয়ার্ডে ঢুকে। রামিজ আর শায়লা উৎকণ্ঠা নিয়ে রুমের বন্ধ দরজার দিকে তাকিয়ে থাকে। তাদের মনে শত অজানা আশঙ্কা ভর করে।

ভিতরে ডা. মিত্র তন্ন তন্ন করে নিরীক্ষণ করে শিমুনার আপাদমস্তক। চোখের পাতা একটু একটু করে মৃদু কাঁপতে থাকে শিমুনার। ডা. মিত্র ঝুকে আসে শিমুনার মুখের কাছে। একটু পর চোখের পাতা খুলে আসে শিমুনার। প্রথমেই ডাক্তারকে দেখে মনে হোঁচট লাগেওর। তারপর নিজেকে সামলে নিতে গিয়েই সর্বশরীরে তীব্র ব্যথা অনুভব করে। অতঃপর গত রাতের বিভৎস টানাহেঁচরা স্মৃতিপটে ভেসে ওঠে, হাউমাউ করে কেঁদে উঠে শিমুনা।

ডা. মিত্র নার্সকে সামলাতে বলে বেরিয়ে আসে রুম থেকে। মুখে প্রশান্তির ছোঁয়া। রামিজ একটু এগিয়ে এসে তার মুখোমুখি হতেই ডা. মিত্র বলল- জ্ঞান ফিরেছে। এখন আশঙ্কামুক্ত। দু-চার দিনের মধ্যেই সুস্থ হয়ে উঠবে। এখন আপনারা ভিতরে যেতে পারেন।

রামিজ শায়লা শিমুনার রুমে যায়। শিমুনার দৃষ্টি তখন উদাস। বোবা কান্নার মত বাঁধভাঙ্গা অশ্রু গড়িয়ে পরে দু'চোখ দিয়ে। ভিজতে থাকে বালিশ, বিছানা। শায়লা শিমুনার উপর হুমড়ি খেয়ে পরে যেতে চায় কিন্তু নার্স বাঁধা দিয়ে আগলে ধরে বলে- এখন কান্নাকাটির সময় নয়। কান্নাকাটি করলে বিপদ হতে পারে। ওর মনের অবস্থা বিশেষ ভাল না। পারলে ওকে শান্তনা দিন, ওকে স্বাভাবিক করার চেষ্টা করুন।

শায়লা নিজের আবেগকে বহু কষ্টে সংযত করে শিমুনার শিয়রে বসে। মাথায় হাত বুলিয়ে দেয় মেয়ের। শিমুনার চোখের অশ্রু আরো বেগবান হয়। শায়লা স্বাভাবিক কণ্ঠে বহু কষ্টে বলতে থাকে- লক্ষি মা আমার, কেঁদোনা। কিচ্ছু হয়নি সোনা মা আমার। শিমুনা বহু কষ্টে হাত দুটো উপরে তুলে মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে।

দৃশ্যটা রামিজকে পীড়িত করে, তার তীব্র ক্ষোভ যন্ত্রণাময় হয়। সে শিমুনার পায়ে হাত বুলাতে থাকে অতি সযত্নে। অজানা নরপশুদের মুখাকৃতি তার কল্পনায় ভেসে ওঠে গায়ে দ্বিগুণ বল অনুভব করে। ছিন্ন বিছিন্ন করে ফেলতে চায় তাদের।। গতরাতে অনেক খোঁজ খবর নিয়ে যখন শিমুনার সন্ধান মিলল বেড়িপাড়ার প্রাইমারি স্কুলের ভাঙ্গা রুমে, তখন শিমুনার নিথর কাটা ছেড়া দেহটাকে খুব সযত্নে তুলে

আনে হাসপাতালে সে। তখন থেকেই রামিজ কল্পনায় কল্পনায় কতবার হত্যা করেছে, কতবার রক্তাক্ত করেছে নরপশুদের, তার অন্ত নেই।

দিন সাতের মাথায় শিমুনা একটু সুস্থ একটু স্বাভাবিক হল। ওকে বাবা মা বাড়ি নিয়ে এল। পড়শিরা একে একে এসে দেখে যাচ্ছে। যে যেভাবে পারছে সহানুভূতি জানাচ্ছে। কেউ আবার অশ্লিল ভাষায় গালি গালাজ করছে তাদের, যারা শিমুনার এ অবস্থার জন্য দায়ী। কেউ তাদের কঠিন শাস্তি দাবি করছে, যেন জন্মের মত বাপের নাম ভুলে যায়। শিমুনা শুধু ফ্যালফ্যাল করে ওদের মুখের দিকে চায়, কষ্টে ওর বুক ফেটে যায়। নিজেকে সামাল দিতে বিছানায় শুয়ে বালিশে মুখ বুজে দেয়। অঝোর ধারায় কান্না আসে, ও নিজেকে সামলাতে পারেনা। ঘন ঘন হেঁচকি আসে। বালিশ ভিজে যায় তার, এক সময় ভেজা বালিশেই তন্দ্রা আসে।

সেদিন আকাশ মেঘলা ছিল। দুপুর থেকে বিকালের আগেই এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেলে আকাশটা একটু ফর্সা হয়। শিমুনা তার ছোট ভাই সাজু আর চাচাতো ভাইয়ের ছেলে রবিকে নিয়ে ঘুরতে বের হয়।

ওরা হাঁটতে থাকে শেনুয়া নদীর ধার ঘেঁষে নরম ঘাসের উপর দিয়ে। সাজু ভাঙ্গা হাড়ির খলাগুলো কুড়ে নিয়ে পানির উপরে ঢিল মারে আর হাঁটতে থাকে। শিমুনা রবির হাত শক্ত করে সাজুর পাশে পাশে হাঁটতে থাকে। ওরা হাঁটতেই থাকে। কলাগাছগুলো পেরিয়ে মাকলা বাঁশ, জেওঠ্যা বাঁশ, বড়বাঁশের ঝাড়গুলো ডিঙিয়ে। আখ ক্ষেতের ধার ঘেঁষে নদীর ভাঙ্গা পাড়ের কিনারে কিনারে। শিমুনার মনে আসে বিভিন্ন গানের ভাঙ্গা ভাঙ্গা কলি। সেসব গুনগুনিয়ে ওঠে আবার নদীর মরা স্রোতে মিশে মরে যায় অকালে। ও গুনগুনাতে থাকে মনে মনে। চার বছরের রবি শুধু শিমুনার মুখের পানে তাকিয়ে হাঁটতে থাকে। ঢিল ছুড়ে দেখতে দেখতে সাজু পিছনে পড়ে যায়। শিমুনার ধমকি খেয়ে আবার দৌড় দেয় পিছু পিছু। শিমুনার গুনগুনানি থামে আবার শুরু হয়। নদীর পানির মৃদু টান দক্ষিণে নেমে যায় ধীরে ধীরে। ওরাও এগিয়ে যায় সময়ের সাথে পানির সাথে শেনুয়া নদীর কিনার ঘেঁষে ঘেঁষে। এক সময় পাকা রাস্তায় এসে উঠে। পিছনে বরুনাগাঁও মোড়, গোটা পঁচিশেক দোকান, আর কোয়ার্টার কিলোর মতো সামনে হাঁটলে কাজী পল্ট্রি ফার্ম। সাজু এরই মধ্যে বায়না ধরে বসেছে ও পল্ট্রি ফার্ম দেখবে। বলে, আপু চলনা ফার্মটা দেখে আসি। আজ কতদিন দেখিনা। শিমুনা আকাশের পানে তাকায়। মেঘলা আকাশ, বেলা বেশি নেই। তাছাড়া আষাঢ়ের আকাশকে বিশ্বাস করা যায় না। কবে কখন নেমে পরে তা বলা ভার। সে বলে, নারে আজ বেলা নেই। ফিরে চল। সাজু বলে- তাহলে তুই যা, আমি পরে যাব। শিমুনা বলে- অন্যদিন, আজকে ফিরে চল।

সাজু পূর্বের ভূমিকায় অটল থাকে। ওর আজকে ফার্ম দেখা চাই। শিমুনার মনটা কোমল হয়। ছোট ভাইএর আবদারটা ও পূরণ করতে চায়। ওরা হাঁটতে থাকে

ফার্মের অভিমুখে। ওরা হাঁটতে থাকে পাকা রাস্তার কিনার ধরে সারি সারি মেহগনি, শিশু, নিম গাছ এড়িয়ে। এগিয়ে যায় ফার্মের দিকে। আর কিছুদূর হাঁটলে রাস্তার বাঁক। বাঁকটাকে কেন্দ্র করে গোটা পাঁচেক দোকান আর একটু সামনে চার মিনিটের পথ। তারপর কাজী ফার্মের মেইন গেট।

ওরা হাঁটতে হাঁটতে বাঁক পর্যন্ত এল। আকাশে তখন উত্তর পশ্চিম কোণ থেকে ঘণকালো মেঘ তাবৎ আকাশ ছেয়ে ফেলেছে। আর ভূ-পৃষ্টে নেমে আসছে দ্রুত অন্ধকার। যদিও সন্ধ্যা হতে তখনো অনেক বাকি। মানুষজন গন্তব্যে পৌঁছার জন্য ছুটাছুটি করছে। বাঁকটাকে অতিক্রম করে শিমুনারা ফার্মের দিকে এগিয়ে যেতে চায়। এমন সময় ‘মালটা যায় কোথায়’ শব্দটি কানে এলে শিমুনা থমকে দাঁড়ায়। কথাটার উৎসের সন্ধানে ওর দৃষ্টি গিয়ে আঘাত হানলো পাশের দোকানে। কাঠের বেঞ্চে ছয়জন বখাটে ছেলে বসে নিকোটিন পুরাচ্ছে। ওর চোখ পরতেই ওরা মিটিমিটি হাসে। শিমুনার অনুমানটা সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে বাঁকি রইলনা যে, এদেরই কেউ বলেছে কথাটা। তাই তাদের উদ্দেশ্যে চেঁচিয়ে বলল- কি বললি হারামজাদারা, তোদের মা- বোন নেই?
বখাটেদের একজন বলে- মাগি কারে কি কস, খবর কইরা দিমু কইলাম।
কি খবর করবি! হু! শয়তানের বাচ্চা শয়তান। বলে শিমুনা ওদের দিকে পায়ের জুতা উঁচিয়ে ধরে আবার বলে, পিটিয়ে চ্যাপটা করে দিব হারামির দল।

বখাটেরা নিশ্চুপ থাকে। রাস্তার লোকেরা মীমাংসা করে দেয়। শিমুনারা ফার্মের দিকে এগিয়ে যায়। গেটের দাঁড়ওয়ানের সাথে কথা বলে ভিতরে যায়। অতি উৎসাহে সাজু ফার্মের ভিতর ঘুরে দেখতে থাকে। আর অজানা আশংকায় শিমুনার মন ভরে থাকে। সাজু আর রবির নানা প্রশ্নের দায়সারা ভাবে হ্যাঁ আর না জবাব দেয় মাত্র। ফার্ম দেখা শেষ হলে ওরা গেটের বাইরে আসে। তখন সন্ধ্যা আসন্ন। মাথার উপর গম্ভির আকাশ। যে কোন মূহুর্তে নামতে পারে। ওরা আর সময় খরচ না করে দ্রুত হাঁটতে থাকে বাড়ির অভিমুখে। যে পথে আসছিল, রাস্তায় সেই বাঁকে বরাবর যেতে না যেতেই গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি নামতে শুরু করল। ততক্ষণে বাঁকের বাকি দোকানগুলোও বন্ধ হয়ে গেছে। শুধুমাত্র বখাটেরা যে দোকানে বসে আছে সেই দোকানটা ছাড়া। আশে পাশে কোন বাড়ি-ঘর নেই।। তাই উপায় অন্তর না পেয়ে ওই দোকানেই আশ্রয় নেওয়ার জন্য ওরা ছুটে গেল। ভাবল, কিছুক্ষণের মধ্যেই বোধ হয় বৃষ্টি থেমে যাবে। কিন্তু মন্দ কপাল, বৃষ্টি আরো জোরে নামতে শুরু করল সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে। দোকানে বখাটে ছয়জন ছাড়াও আরো একজন পথচারি আছে। এরই মধ্যে বখাটেরা দু-একটা অশ্লিল ভাষা ছাড়তে শুরু করেছে। শিমুনা তার অন্তর্যামীর কাছে প্রার্থনা করে চলছে যেন বৃষ্টি থেমে যায়। কিন্তু প্রকৃতি যেন বিমুখ, ছাড়তে চায় না। এরই মধ্যে আশ্রিত পথচারীটি ভিজে ভিজে চলে গেছে।

সেও চলে যেতে পারত শুধু পারেনা সাজু আর রবির জন্য, বৃষ্টিতে ভিজলে ওদের শরীর খারাপ করতে পারে তাই। ততক্ষণে বখাটেরা আরো অশ্লিল শব্দ ছাড়ছে বেশি মাত্রায়। কিন্তু শিমুনার কিছু বলার নেই। বহু কষ্টে নিজেকে সংযত করে ধরে রেখেছে।

একটা বখাটে ছেলে এসে সামনে দাঁড়ালো। শিমুনা ওর আপদমস্তক তাকাতে না তাকাতেই ছেলেটা জাপটে ধরল শিমুনাকে। শিমুনা প্রচন্ড শক্তি দিয়ে ছুড়ে ফেলে দিল দোকানের বাইরে তাকে। তারপর আরো দু'জন ছেলে এসে শিমুনাকে জাপটে ধরে জোর করে দোকানের ভিতরে নিয়ে গেল। দৃশ্যটি দেখে সাজু আর রবি কান্নাকাটি শুরু করল। ওদেরও দোকানের ভিতর নিয়ে গিয়ে দোকানের ঝাপ ফেলে দিয়ে আটকিয়ে দিল ওরা। দোকানের ভেতর প্রদীপের মৃদু আলোয় শিমুনা দেখতে পেল, দোকানের গোডাউনে সাজু আর রবিকে নিয়ে গিয়ে দরজা আটকে দিল ওরা। তখন তারা জোরে কান্নাকাটি শুরু করে দিল। শিমুনা ওদের দিকে ছুটে যেতে চাইলে একজন ওকে জাপটে ধরে মেঝেতে ফেলে দিল। তারপর শুরু হল শিমুনাকে নিয়ে টানা হেঁচড়া। তার মনে হচ্ছিল দানব যেন তাকে খাবলে খাচ্ছে। সে শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে ওদের প্রতিহত করার চেষ্টা করে বার বার ব্যর্থ হলো। একসময় জ্ঞানহীন নিথর হয়ে পড়ল তার শরীর। তারপর যখন জ্ঞান হল চারিদিকে অন্ধকার। অতঃপর অন্ধকার। কে যেন ওকে কাঁধে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে আর ওর মাথাটা ঝুকে আছে তার পিঠে দিকে। তারপর স্কুলের বারান্দায় এনে তার নিথর দেহটা নামালো। অতঃপর আবার অসহ্য যন্ত্রণা।

আবার মৃত্যুর যন্ত্রণা। আবার শিমুনার শরীর নিয়ে দানবের খেলা।
শিমুনার তন্দ্রা ভেঙ্গে যায়। সে হাঁপাতে থাকে একাকি বিছানায়।

এরই মধ্যে থানায় মামলা হয়েছে। পুলিশ প্রথম অভিযানেই দোকানদার সহ আরো একজনকে গ্রেফতার করেছে। এরপর দ্বিতীয় আর তৃতীয় অভিযানের ফল শূন্য। এর দু'দিন বাদেই অভিযুক্ত বাকি পাঁচজন আদালতে আত্মসর্মপণ করেছে। পাড়ায় বহু আলোচনা সমালোচনার ঝড় বয়ে যাচ্ছে। সবারই উক্তি এর একটা উপযুক্ত শাস্তি চাই, যেন আর এরকম ঘটনা না ঘটে। কারণ সবারই মা-বোন আছে। বহু প্রতীক্ষার পর একদিন আদালত বসল। এলাকার অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি আদালতে এলো। এদের মধ্যে কেউ কেউ সাক্ষ্য দেবে।

আসামী সাতজনকে কাঠগাড়ায় দাঁড় করানো হলো। আসামী–বাদী দু'পক্ষের লোক ছাড়াও সাংবাদিকও রয়েছে। শিমুনা মাথা নীচু করে এক কিনারে বসে আছে। আদালতের আনুষ্ঠানিকতা শেষ করে একজন আইনজীবি উঠে দাঁড়ালো এবং খুব বিনয়ের সাথে বলতে লাগল- মহামান্য আদালত, একটা নিরীহ অসহায় মেয়েকে

পেয়ে আসামী সাতজন তাকে ধর্ষণ করেছে। তার উপযুক্ত প্রমাণসহ এলাকাবাসী অনেকেই সাক্ষ্য দিতে প্রস্তুত রয়েছে। আর সাতজন ছেলেই এলাকায় বখাটে বলে পরিচিত। মহামান্য আদালত আমি সেই দুর্বিসহ ঘটনার পুনরাবৃত্তি করতে চাইনা। আমি চাই এমন শাস্তি হোক যেন আর সমাজে এ ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটে। আমি এর যথাপোযুক্ত সাক্ষ্য প্রমাণসহ ....

কথা আর শেষ হতে দেয় না অন্য একজন আইনজীবি। এর প্রতিবাদ করে বলতে থাকে, মহামান্য আদালত, আমার প্রতিপক্ষ বন্ধু হয়তো ভুলে গেছেন, ঘটনা ছিল তার সম্পূর্ণ বিপরীত। আমি এর যথোপযুক্ত প্রমাণসহ একটা নষ্ট মেয়ের চরিত্র আপনার সামনে তুলে ধরব। তার আগে আমি বাদিনীকে কিছু জেরা করার অনুমতি চাই।

এরই মধ্যে আদালতে একটা প্রচন্ড হট্টগোল শুরু হল। শিমুনাকে নষ্ট মেয়ে বলার জন্য এলাকার সবাই প্রতিবাদ জানাতে শুরু করল।

মহামান্য আদালত টেবিলে জোড়ে শব্দ করে সবাইকে নিরবতা পালন করার জন্য আদেশ দিলেন এবং বাদিনীকে জেরা করারও অনুমতি দিলেন।

শিমুনা এসে কাঠগড়ায় দাঁড়ালো। অতঃপর জেরার আগের অনুষ্ঠানিকতা সারা হলে বিজ্ঞ আইনজীবি জেরা করবার জন্য সামনে এসে দাঁড়ালো। শিমুনার কঠিন দৃষ্টি আইনজীবির রহস্যময় দৃষ্টিতে হোঁচট খায়। ও কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে মাথা নীচু করে আইনজীবির সম্ভাব্য প্রশ্নের জবাব দিতে নিজেকে শক্ত করে। আইনজীবি প্রথমেই জিজ্ঞাসা করলো, ওরা কতজন ছিল?

শিমুনা মাথা নিচু করেই জবাব দিল, সাতজন।
আচ্ছা, তুমি কি করে জানলে সাতজন, তোমারতো তখন জ্ঞান ছিল না।

তরপর মুখ ফিরিয়ে বলতে লাগল, মহামান্য আদালত,জ্ঞানহীন একজন মানুষের পড়্গে কি করে বলা সম্ভব সাতজন ছিল, নাকি দশজন ছিল। এটা সম্পূর্ণ একটা বানোয়াট বা অযৌক্তিক কথা। তাছাড়া দোকান পাকা রাস্তার ধারে। দোকানের মধ্যে চিৎকার করলে নিশ্চয়ই আশেপাশের লোকজন ছুটে আসত। এর মানে হল ও চিৎকার করতে চায়নি। তাছাড়া সেদিন বিকেল থেকেই আকাশ মেঘলা ছিল। ওই অবস্থায় ও বাড়ি থেকে এক কিলোমিটার দূরে ফার্ম দেখতেই বা গেল কেন? মহামান্য আদালত, এর যোগফল অতি সোজা। আর তা হচ্ছে বাদী একটা নষ্টা মেয়ে। ওদের আগেই কথা হয়েছিল এবং পনেরশত টাকা রফা হয়েছিল আর .... আইনজীবীর কথা শেষ হতে দেয় না শিমুনা। তার আগেই না না ধ্বনিতে আদালত

প্রকম্পিত করে। মহামান্য আদালতের বোধকে গভীরভাবে নাড়া দেয়। কিন্তু প্রচলিত আইনের কাছে নিজেকে অসহায় মনে হয় তার।

আইনজীবি আবার জিজ্ঞাসা করে, আপনার নিশ্চয়ই আপত্তি ছিলনা।
শিমুনা আর কথা বলতে পারেনা। তার অশ্রুশূন্য চোখে ক্রোধানল জ্বলে উঠে। আদালতকে ওর আর একজন ধর্ষক মনে হয়। ও আর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে পারেনা। মাথাটা ঝিম ঝিম করে শরীরটা অসার হয়ে আসে।

আসামীদের জামিনের মধ্য দিয়ে সেদিনের মত আদালত মুলতবি হয়। মামলা চলতে থাকে অমরত্বের বর পেয়ে। নিম্ন আদালত থেকে উচ্চ আদালতে গড়ায়।

যেদিন আদালতে তারিখ থাকে সেদিন শিমুনার বিরক্ত লাগে। মাঝে মাঝে মনে হয় মামলা না করলেই ভাল হত। তাকে বারবার আদালতে উপস্থিত হয়ে অত লোকের সামনে সেই বিভীষিকাময় ঘটনাটা বর্ণনা করতে হতোনা। সেই নরপশুদের সামনা সামনি দাঁড়াতে হত না। হয়তো অনেক লোকেই ঘটনাটা কোনদিন জানতে পারত না। আর এখনতো মুল্লুকসুদ্ধ সবাই জানে। বাড়ি থেকে মোটেও বাইরে বেরোতে ইচ্ছে করে না শিমুনার। পাড়ার দু-চারটা মানুষ কোথাও জটলা হয়ে আলাপ করলে মনে হয়, যেন সে বিষয়েই আলাপ করছে। কেউ কেউ আবার করুণা করতে আসে, সহানুভূতি জানাতে আসে। আর ঠিক তখনি মনের ক্ষতটা দাউ দাউ করে জ্বলে উঠে। কখনো কখনো মানুষের কটুক্তি কানে আসে, কানে আসে ব্যঙ্গ। সেদিন বিজয়ের বাবা একটা সম্বন্ধ নিয়ে এসেছিল। পাড়ার কে যেন সেই ঘটনা বলে দেয়ায় বরপক্ষ আর শিমুনাদের বাড়ির আঙ্গিনায় পা দেয়নি। শিমুনার বাবা তাদের বাড়িতে আসার অনুরোধ করলে তারা মুখের উপর বলে দিয়েছিল, একটা নষ্টা মেয়েকে ছেলের বৌ করে নিয়ে যেতে পারব না বাপু। কথাটা শিমুনাকে ভাবিয়ে তোলে। এ সমাজের যত দোষ মেয়েদের। মেয়েরা নষ্টা হয়, ছেলেদের কিছু যায় আসে না। ওদের সাত খুন মাফ, কারণ ওরা ছেলে। বিয়ের আগে মেয়ের চরিত্রটাকে দেখা হয়, কিন্তু ছেলেদের যাচাই করা হয় না। মাঝে মাঝে মনে হয়, মেয়ে হয়ে জন্মানোটাই পাপ। মহাপাপ। সে কি মেয়ে হয়ে জন্মেছে, নাকি সমাজ-পরিবার তাকে ক্রমে ক্রমে মেয়েতে রূপান্তরিত করেছে। তাকে ছোট বেলায় বলা হতো এটা করোনা, ওটা করোনা, এটা মেয়েদের মানায় না। এখনো একটা ব্যাপার বুঝে উঠতে পারেনা শিমুনা। মা প্রায়ই বলত, মেয়েদের আগে খেতে নেই, আগে ভাই খাবে তারপর। এই বৈষম্যটা কখনোই মানতে পারতো না সে। তাই প্রায়ই খেয়ে ফেলতো আগে আগে। একদিন মার হাতে ধরা পরে কি মারটা না খেয়েছিল এইজন্য।

শিমুনা হালের অবস্থান থেকে তার নির্মল অতীতের দিকে তাকায়। কোন অন্যায় তার স্মৃতিপটে ধরা পরেনা। তাহলে কেন এমন হল তার? কেন একটি ঘটনা

ভবিষ্যৎটাকে মাটি চাপা দিল তার? যার অপবাদ তাকে সারা জীবন বয়ে বেড়াতে হবে। সেদিন তো মরে গেলেই ভাল হতো। কি করে বেঁচে গেল সে, আর এখন তো কুয়াশাচ্ছন্ন ভবিষ্যৎ তার, তারপরও কেন বেঁচে আছে সে? এই নিরর্থক জীবনে বেঁচে থাকার অর্থই খুঁজে পায় না শিমুনা। এই অভিশপ্ত জীবন তাকে বয়ে বেড়াতে হবে ভাবতেই কেমন যেন অবাক লাগে। ঘুম আর নির্ঘুমে দিন রাত্রির তফাৎ খুঁজে পায়না সে। কখনো মনে হয়, যেন অনন্ত রাত। আবার কখনো মনে হয় অনন্ত দিন। এক সময় যে বান্ধবীদের সাথে বিকেলে পুকুর পাড়ের কদম তলাটায় বসে ঘন্টার পর ঘন্টা আড্ডা দিত এখন তাদের যেন কেমন পর পর মনে হয়। তাদের সাথে কথা বলে আর তেমন আনন্দবোধ হয়না তার। কিংবা ওদের আড্ডায় নিজেকে তার অবাঞ্চিত মনে হয়।

অথচ শিমুনা ছাড়া যেন আড্ডাই জমত না ওদের। আগামী দিন বিটিভিতে কি অনুষ্ঠান আছে ? কোন অভিনেতার সাথে কোন অভিনেত্রীর বিয়ে হওয়ার কথা চলছে ? 'আশা' হলে কোন ছবিটা চলছে ? কিংবা বিবিসির সংবাদ শিরোনামে কোন দেশের ঘটনা এল? তা সবই যেন তার হাতের মুঠোয়। একটার পর একটা ঘটনা জোড়াতালি দিয়ে একাই ঘন্টার পর ঘন্টা কাটাতে পারতো ওদের মাতিয়ে রেখে।

আজ সকাল থেকেই শরীরটা ভার ভার লাগছে শিমুনার। চোখে মুখে পানি দিয়েও যেন তার ফ্রেশ লাগছে না। বারান্দার পাশে পেয়ারা গাছটার তলায় এসে দাঁড়ায় সে। বারান্দার ধারে লাগানো পাতাবাহার গাছগুলো কেমন যেন ঝিমিয়ে গেছে। আজ অনেকদিন গাছগুলোর গোড়ায় পানি দেওয়া হয়না। বড় মায়া লেগে হয় বেচারা গাছগুলোর জন্য। শিমুনা টিউবয়েল থেকে পানি এনে গাছগুলোর গোড়ায় ঢালে। আগাছা পরিষ্কার করে দেয়। হঠাৎ মাথাটা কেমন ঝিমঝিম করে শিমুনার। বারান্দার খুটিটা ধরে সোজা হয়ে দাঁড়াতে চায়। পারে না। মাগো বলে আঙ্গিনায় লুটিয়ে পড়ে।

শিমুনার মা রান্না ঘর থেকে ছুটে এসে মেয়েকে তুলতে চায়, কিন্তু মেয়ের জ্ঞানশূন্য নিথর দেহটা দ্বিগুণ ভারী মনে হয় তার কাছে। তারপরও কোনরকমে জাপটে ধরে কোলে তুলে নিয়ে বিছানায় শুইয়ে দেয় শিমুনাকে। রামিজ ডাক্তার নিয়ে আসে। ডাক্তার শিমুনাকে ভাল করে দেখার পর রামিজের দিকে তাকায়। রামিজ জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ডাক্তারের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। ডাক্তার বলে, রামিজ, আরেকটা অঘটন ঘটে গেছে। শিমুনা মা হতে যাচ্ছে। হঠাৎ কালবৈশাখীর হোঁচট যেন রামিজের বুক ছুঁয়ে শায়লার বুকে গিয়ে লাগে। শায়লা ডুকরে কেঁদে ওঠে। শিমুনা মা হতে যাচ্ছে-কথাটা একই ভাবে শিমুনার বুকেও আঘাত করে। ও কিছু বলার জন্য বিছানায় উঠে বসতে চেয়েও পারেনা। কেবল দু'চোখ দিয় অশ্রু বাঁধভাঙ্গার

মত গড়িয়ে পড়ে। ও শত চেষ্টা করেও আর কিছু বলতে পারে না। বাকশক্তি হারিয়ে ফেলে।

আপাতত শিমুনাকে সান্তনা দিয়ে রাখার পরামর্শ দিয়ে ডাক্তার চলে যায়। তাদের বোবা কান্নার পর্বটা দীর্ঘায়িত হয় সেদিন। যেদিন মামলাটা অমরত্বের বর পেয়ে নিম্ন আদালত থেকে উচ্চ আদালতে গড়ায়। যৌক্তিক অযৌক্তিক অপব্যাখ্যার মধ্য দিয়ে বাঁধভাঙ্গা সময়ের স্রোতে শিমুনার পেটের ভ্রুণটা সময়ের টানে পাঁচ মাস পূর্ণ করে। ক্রমান্বয়ে মা হতে চলেছে শিমুনা।

সেদিন ডাক্তারের মুখে কথাটা শোনার পর থেকেই বাবা-মা কেমন যেন মুখ ভার করে কথা বলছে। সব কিছুতেই মা তার উপর রেগে যাচ্ছে। অথচ সেই দুর্ঘটনার পর থেকেই মা তার মাথায় প্রায়ই হাত বুলাত আর বলত- চিন্তা করোনা লক্ষী মা আমার। সব ঠিক হয়ে যাবে। সবই ঠিক হয়ে আসছিল কিন্তু ডাক্তারের মুখে "মা" কথাটা শোনার পর থেকেই যেন বাড়ির দৃশ্যপট পাল্টে গেল। কয়েক দিনের মধ্যেই আঙ্গিনায় মাচার উপর লাউ গাছটা কেমন যেন ঝিমিয়ে গেল। বারান্দার ধার দিয়ে লাগানো পাতাবাহার গাছগুলো আর তেমন সুন্দর লাগছে না। ঘরের চালের সাথে ঝুলানো খাঁচার কবুতরগুলো মাসে মাসে আর বাচ্চা দেয়না তেমন, হালের বলদ দু'টোকেও কেমন যেন হাড্ডিসার মনে হচ্ছে। আর বাবা কেবল হরিণ মার্কা বিড়ি একটা শেষ হতে না হতেই আর একটা জ্বালাচ্ছে- এসব পরিবর্তন অবাক হয়ে ভাবে শিমুনা।

শিমুনা মা হতে চলেছে, আজ সকাল থেকে হঠাৎ করেই কথাটা ভাবতে কেমন যেন মনটা জুড়ে আসছে তার। কেমন যেন পূর্ণতা লাগছে তার। নারী জীবনের সবচেয়ে সার্থকতা হল মা হওয়ার মধ্যে। সেই মা সে হতে চলেছে। কথাটা ভাবে আর পুলকিত বোধ করে শিমুনা। সৃষ্টি সুখের উল্লাসে মন তার ভরে থাকে সারাক্ষণ।

আচ্ছা, সন্তানটি জীবন বৃত্তান্তে কি লিখবে পিতার জায়গায়? নাকি সে নিয়ম ভেঙ্গে পিতার জায়গায় লিখবে 'পিতারা'। কারণ তারতো একাধিক পিতা। নাকি আবার ততদিনে সমাজের নিয়ম বদলে যাবে। মায়ের পরিচয়ে সন্তানের পরিচয় হয়ে দাঁড়াবে? কথাগুলো যত গভীর ভাবে ভাবিয়ে তুলে শিমুনাকে, তত গভীরে ভাবেনা সে, কিংবা ভাবতে চায়না।

শিমুনা নিজের মধ্যে অমরত্বের অস্তিত্ব অনুভব করে। অনন্তকাল বেঁচে থাকার অবলম্বন অনুভব করে সে। সে জানে এটা সমাজ মেনে নেবে না। কোন মতেই মেনে নেবে না। সমাজকে তার অর্থহীন মনে হয়। তার সর্বনাশ রোধ করতে পারেনি যে সমাজ। সে সমাজ শুধু তার সন্তানের অপবাদ দিতে পারবে। পারবে লাঞ্ছনা দিতে। এসব প্রতিকূলতাকে ডিঙ্গিয়ে মাঘের রোদ্দুর গায়ে মেখে ভোরের কুয়াশায়

হেঁটে বেড়াবার স্বপ্ন দেখে শিমুনা। সে স্বপ্ন দেখে, আষাঢ়ের কদম ফুলের মত পহেলা বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে স্নাত হবার।

সেদিন রাতের অন্ধকার জনপথে মিশেছে, নক্ষত্রের দুঃসময়, আকাশে মেঘের ঘনঘটা। শিমুনা বিছনায় শুয়ে শুয়ে হ্যারিকেনের কাঁপানো আলোয় চোখে বাইবেলের পাতার অক্ষরগুলো গিলছে। এমন সময় দরজা ঠেলে মা এলো ঘরে। আর যখন মা এলো তখন ও মঙ্গলগ্রহে কুমারী মায়েদের সন্তানদের নিয়ে একটা সভ্যতার কথা ভাবছে। ও ভাবছে, সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে মঙ্গলপৃষ্ঠ ফুলে ফেঁপে উঠবে মানুষে মানুষে। সেখানে নতুন প্রজন্ম বিকৃত ইতিহাস থেকে মুক্ত থাকবে, মুক্ত থাকবে আমাদের পরস্পর বিরোধী রাজনৈতিক মন্তব্য দূষণ থেকে। ওখানে হবে শুধু বিশুদ্ধ জ্ঞানের চর্চা। এ জগতের সব সংকট মুক্ত হয়ে মঙ্গল পৃষ্ঠ ভরে উঠবে এক বিশুদ্ধ মানব সভ্যতায়। প্ল্যাটো, এ্যারিস্ট্যাটল ও রুশোর স্ব-বিরোধী জগাখিচুরি এলোমেলো রাষ্ট্র চিন্তার বাইরে এক বিশুদ্ধ মানবিক রাষ্ট্র। যেখানে রক্ষিত হবে মানুষের অধিকার। মানবতার অধিকার।

মায়ের পায়ের শব্দে ওর স্বপ্ন ভঙ্গ হল। মায়ের হাতে গ্লাস ভরা দুধ, আর জগে পানি। বাইরে প্রকৃতির ছন্নছাড়া দিক ভুলানো অমানবিক বাতাসের ধ্বংসযজ্ঞ। মায়ের হাতে দুধ দেখে ও পুলকিত হল। কোন বাক্য বিনিময় ছাড়া মায়ের হাত থেকে দুধের গ্লাসটি নিয়ে এক ঢোকে খেল। তারপর মা একটা টেবলেট ওর হাতে দিয়ে বলল- খাও।

শিমুনা অবাক হয়ে মায়ের মুখের দিকে তাকায়। তারপর চোখ নিচে নামিয়ে বলে- আমারতো কোন অসুখ করেনি মা, আমি তো ভাল আছি।

শায়লা একটা মলিন হাসি দিয়ে বলে- মাঝে মাঝে অসুখ না করলেও ঔষুধ খেতে হয় মা।

শিমুনা কথা না বাড়িয়ে টেবলেটটা নেয় মার হাত থেকে। বলে, ঠিকআছে মা,একটু পড়ে খাবো। শায়লা চলে গেলে শিমুনা জানালা দিয়ে টেবলেটটা বাইরে ফেলে দেয়। মনে মনে বলে, মাগো, বাবাগো, তোমরা আমাকে ক্ষমা করো। আমি যে আমার ভেতর মায়ের অস্থিত্ব অনুভব করি প্রতি মুহূর্তে। মা হয়ে আমি কিভাবে আমার সন্তানের মৃত্যু চাইবো। তোমরাই বলো মা। বলো বাবা।   কোন অপরাধ না করেও এতো বড় শাস্তি আমি কেন পাবো। শাস্তি যদি দিতেই হয় তবে তাদের দাও, যারা সমাজে অগ্রহণযোগ্য সন্তানের জন্ম দেয়।

কিছুদিন বাদেই শিমুনা মা হয়। নতুন প্রজন্মের কান্না হাসি সারাক্ষণ আচ্ছন্ন করে রাখে শিমুনাকে।

সেই কান্নায় ভর করে সে ভেসে বেড়ায় তার স্বপ্নের মঙ্গল গ্রহে।

মোঃ আকতারুজ্জামান*

হে যুবক সাবধান

গ্রামের আঁকাবাঁকা রাস্তা দিয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা স্কুলে যাচ্ছে। হঠাৎ তাদের মধ্যে থেকে একটি ছেলে বলে উঠল –

আমি আর স্কুলে আসবোনা। কারণ, পড়াশুনা খুব কষ্ট। পড়া না পারলে স্যার কান ধরে দাঁড় করিয়ে রাখেন।

ছেলেটির কথা শেষ হতেই আরেকটি ছেলে বললো –

পড়া না পারলেত স্যার শাস্তি দিবেই। তাছাড়া স্যারতো আমাদের ভালর জন্যই এমন করে। শুনিস্নি, "লেখাপড়া করে যে, গাড়ি ঘোড়া চড়ে সে"–আর স্যারতো আমাদের গাড়িতেই চড়াতে চায়।

এসব কথা বলতে বলতে তারা স্কুলে পৌঁছাল এবং ক্লাশে গিয়ে বসল। অল্প কিছুক্ষণ পর স্যার ক্লাশে ঢুকল এবং জিজ্ঞাসা করলো –
তোমরা কেমন আছ?

আমরা ভাল আছি স্যার। আপনি কেমন আছেন?

আলহামদুলিল্লাহ্। আমি ভাল আছি। যা হোক – আজকে আমি তোমাদের সামনে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো। বিষয়টি হচ্ছে,"ধুমপান ও মাদক দ্রব্য" নিয়ে। যা আমাদের দেহ ও স্বাস্থের জন্য খুবই ক্ষতিকর। একটি সিগারেট গ্রহণে একজন মানুষের ৫.৩০ মিনিট আয়ু কমে। এছাড়াও যক্ষা, কাশি, হাঁপানি ও ফুসফুসের বিভিন্ন রোগ হয়।

তাই তোমরা কখনো ধুমপান করবে না ও মাদক গ্রহণ করবে না। এবং তোমাদের বাবা-মা, ভাই-বোন, বন্ধু-বান্ধব সবাইকে মাদক সম্পর্কে সচেতন করবে যাতে তারা মাদক দ্রব্য গ্রহণ না করে।

* শিক্ষার্থী, ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগ, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ।

ক্লাশ শেষে সুমন বাড়িতে গিয়ে দেখে তার বাবা বিড়ি টানছে। সে তার বাবাকে ধুম পানের কুফল সম্পর্কে জানাল এবং ধুমপান ছেড়ে দিতে বলল। কিন্তু তার বাবা শুনল না। যা হোক, এভাবে দিন চলতে লাগল। সুমন শত চেষ্টা করেও তার বাবাকে এই পথ থেকে ফিরাতে পারলো না।

সুমন এস এস সি পাশ করে কলেজে ভর্তি হলো। কলেজে তার অনেক নতুন বন্ধু-বান্ধব জুটল। তাদের মাঝে লাভলী নামের একটি মেয়েকে সুমনের খুব ভাল লাগে। এক সময় তাদের মধ্যে ভালবাসার সম্পর্ক গড়ে উঠে। সুমনের সময় এখন বেশ আনন্দেই কাটে। এরই মধ্যে সুমনের কিছু নতুন বন্ধু জুটে যায় যারা মাদকাসক্ত। তারা সুমনকে ধুমপানের জন্য উৎসাহ দেয়।

একদিন সুমন কলেজ থেকে বাড়ি ফিরছিল। এ সময় সে দেখল রাস্তার পাশে একটি গাছের নীচে বসে তার বন্ধুরা ধুমপান করছে। সুমনকে দেখে তার বন্ধুরা তাকে ডেকে নিয়ে সিগারেট খেতে বলল। বন্ধুদের চাপাচাপির মুখে সুমনের আপত্তি বাতাসে মিলিয়ে যায়। সিগারেট খাওয়ার মধ্যে লাভলীর ফোন আসে। সুমন কোথায় কি করছে জানতে চায় লাভলী। হকচকিয়ে যায় সুমন। সে একবার বলে সিগা খাচ্ছি এবং পরক্ষণেই তারাতারি করে বলে, না না-সেজান জুস খাচ্ছি।

এভাবে সুমন তার বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে একদিন পুরোপুরি মাদকাশক্ত হয়ে যায়। লাভলী জানতে পেরে সুমনকে বোঝাতে চেষ্টা করে। কিন্তু কোন কাজ হয় না। শেষে বাধ্য হয়ে লাভলী সুমনের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে। এ অবস্থায় সুমন আরো অস্থির হয়ে পাগলের মতো ঘুরতে থাকে। নেশার কাছে ভীষণ ভাবে আত্ম সমর্পণ করে সুমন। টাকার প্রয়োজন হয়। টাকার জন্য সুমন শেষ পর্যন্ত ছিনতাই শুরু করে।

একসময় সুমনের চেতন হয়। সে ভাবতে থাকে – "নেশার জন্য লাভলী আমাকে ছেড়ে চলে গেছে। আমি ছিনতাই শিখেছি। না, আর নেশা নয়। যারা আমাকে এ পথে এনেছে তাদের আমি ছাড়বো না। কখনো ছাড়বো না।"

নিজের মধ্যে পরিবর্তন অনুভব করে সুমন। একদিন রাতের বেলা সে একটি হকিষ্টিক আর কেরোসিন তেল নিয়ে রওনা হয় তার মাদক আস্তানার দিকে। দেখে, তার বন্ধুরা একেকজন নেশায় চুর। কেউ কেউ মাদক বেঁচাকেনাও করছে। সুমনের গরম মাথা আরও গরম হয়ে যায়। হকিষ্টিক দিয়ে সে এলোপাতাড়ি পেটাতে থাকে বন্ধুদের। এক পর্যায়ে কেরোসিন তেল ঢেলে আস্তানায় আগুন জ্বালিয়ে দেয়। ঘটনা নিয়ন্ত্রণ করতে পুলিশ আসে। সুমনকে ধরে নিয়ে যায় পুলিশ।

পরদিন এ খবর ফলাও করে ছাপা হয় পত্রিকায়। প্রধানমন্ত্রীর চোখেও পড়ে খবরটি। তিনি ভাবেন-“এসবের জন্যতো আমিই দায়ী। আমি নিজেইতো এই ব্যবসার সাথে জড়িত। আমার জন্যইতো দেশের নিস্পাপ যুব সমাজ আজ ধব্বংসের মুখে। অর্থের লোভে আমি একি করছি। আমি অন্যায় করছি। আমি অন্যায় করছি।”– বিবেকের কাছে জবাবদিহিতার মুখোমুখি হন তিনি। অনুশোচনায় ভোগেন। সিদ্ধান্ত নেন, আজই জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেবেন তিনি। সন্ধ্যা সাতটায়।

প্রধানমন্ত্রী তার ভাষণে বলেন, “মাদকের প্রভাবে দেশের নিস্পাপ যুব সমাজ আজ ধক্ষংসের মুখে। এ পরিস্থিতি রোধ করতে হবে। আমাদের জীবন দিয়ে হলেও। দেশে অবৈধ পথে মাদক দ্রব্য প্রবেশ বন্ধ করতে হবে। অপরাধী যেই হোক, তাকে শাস্তি পেতে হবে। যৌথ বাহিনীর কাছে আমার বিনীত অনুরোধ, তারা যেন এ ব্যাপারে আগামী বাহাত্তুর ঘন্টার মধ্যে অত্যন্ত সন্তোষ জনক সমাধান সম্পন্ন করেন। যুবকদের প্রতি আমার অনুরোধ,

‘হে যুবক, সাবধান’ –একমাত্র তোমরাই পারো একটি সোনার বাংলা গড়ে তুলতে। আল্লাহ্ হাফেজ।

অনুবাদক ঃ কাজী মহাম্মদ আশরাফ*

মূল ঃ মোহাম্মদ মনশা ইয়াদ

আমার পা

(মোহাম্মদ মনশা ইয়াদ। জন্ম ঃ শেখপেরা, পশ্চিম পাঞ্জাব। পেশা ঃ সিভিল ইঞ্জিনিয়ার। উর্দু ও পাঞ্জাবী সাহিত্যে এমএ। সাহিত্যকর্ম ঃ বন্দ মুট্টিও মে জুগনু, মাংস আওর মিট্টি, খলা অন্দর (উপন্যাস), খলা (গল্প সংকলন) ইত্যাদি। এছাড়াও কবিতা, চিত্রনাট্যও রচনা করেন তিনি। বর্তমান বসবাস ঃ ইসলামাবাদ,পাকিস্তান। 'আমার পা' গল্পটি ইংরেজী থেকে অনুবাদ করা হয়েছে। "খরঃবৎধঃঁৎব ওফবধং অৎঃং অ ঝধধৎপ ঔড়ঁৎহধষ ঠড়ষ . ২ ; ঘড়. ১ ; অঢ়ৎরষ ২০০৬চ সংখ্যায় "গু ঋড়ড়ঃ ! গধহংযধ ণধফচ এই শিরোনামে ইংরেজীতে অনুবাদ করেন আশফাক নাকভী। পত্রিকাটি সম্পাদনা করেছেন অজিত কোর।)

পরদিন আমাদের ফিরতে হয়েছে। বিকল্প হিসেবে সে চেয়েছে আমাদের গ্রামটি ঘুরে দেখতে। বুঝতে পারছিনা কোথায় নিয়ে কি দেখাবো। সে আমার রোমান্টিক গল্পগুলো পড়েছে। তার চোখ এখন ঘুরে ঘুরে খুঁজে বেড়াচ্ছে সেই কল্পিত দৃশ্যপট। ব্যাপারটা আমাকে বেশ লজ্জায় ফেলে দিয়েছে। এখন সে যা কিছু দেখছে সব অর্ধনগ্ন। রাস্তা অপরিচ্ছন্ন। নোংরা ছেলেরা খেলছে। ব্রিজের নীচে নোংরা পানিতে লাফাচ্ছে। নিজেকে ছোট লাগছে। কণ্ঠ শুকিয়ে আসছে।

আমাদের গ্রামটি সম্পূর্ণ বদলে গেছে। নোনা পানি ঢুকে সম্পূর্ণ এলাকা নিষ্ফলা করে দিয়েছে। যেসব বাগানে বন্ধুদের সাথে খেলতাম, গাছে দোলনা ঝুলিয়ে ঝুলতাম সেসব কিছুই নেই। এখন সেখানে পথের কুকুরের ঘেউ ঘেউ শব্দের সাথে ভাসছে আটার মিলের ক্রুদ্ধ আওয়াজ। নোংরা বিড়াল, মোষের ঢেকুর। যা আগে কিছুই ছিলনা। এখন পুরু হইচই।

শাকিলা উচ্চ সংস্কৃতিমান ও রুচিশীল। সারাজীবন রয়েছে পরিচ্ছন্ন পরিবেশে। আমিই তাকে গ্রাম দেখাবার আমন্ত্রণ জানিয়েছি। জানতাম না যে তা এমনিভাবে বদলে গেছে সময়ের উল্টো দিকে। আমার মনে হয়না এক সময় এখানে থেকেছি।

---

* শিক্ষার্থী, বাংলা বিভাগ, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ।

মানুষগুলোও বদলে গেছে। সেসব দিনের সেই পারস্পরিক সহযোগিতা, ভালবাসার কিছুরই অবশিষ্ট নেই। সবাই এখন বাস্তববাদী। টাকাই এদেরকে এমন বানিয়েছে। শাকিলা সম্ভবত আমার অস্বস্তি বুঝতে পারছে। "আমার কাছে লাগছে গ্রামটি খুব সুন্দর"–সে বলল। "এখানকার মানুষ দেখছি বাস্তবতা সম্পর্কে অনেক সচেতন। এই ক্রান্তিকাল একটি নতুন যুগের জন্ম দেবে"–সে আবার বলল।

"নরকের নতুন যুগ"। বিরক্তির সাথে বললাম। "সবার রক্ত যেন ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে। তারা সবাই যেন একটা মেলায় এসেছে। সবাই কথা বলে নৈমিত্তিক। এ যেন রোম পুড়ছে আর ওরা বাঁশি বাজাচ্ছে। দেখছোনা সবাই যার যার পথে চলছে? কেউ কারো ব্যাপারে মাথা ঘামায় না। নগর জীবনের নোংরা দিকগুলোই এখানে ভালভাবে দেখা দিয়েছে।"

"তা হতে পারে"–সে হেসে বলল। "কিন্তু আমি পাচ্ছি এখানে স্বাধীনতা ও বিস্তৃতির অনুভূতি। বিগত কয়েক মাস ধরে নিজেকে ঘৃণা করতে শুরু করেছি। জীবিত রয়েছি কিনা জানিনা। কিন্তু এখানে নতুন একটা দৃশ্যপথ খোলা দেখছি চোখের সামনে। আমি দেখছি পৃথিবী ও স্বর্গের মাঝে এক নতুন সম্পর্ক।"

তার কথাগুলো আমার লজ্জা দূর করতে সাহায্য করছে। তবে তার কথায় বাড়াবাড়ি আছে। আমি এখনও অস্বস্তিতে আছি।

যখন আমরা বাড়িতে ফিরলাম পিরানদিত্তা গলিতে এসে দেখা করলো। সে গ্রামের একমাত্র ভাড়ার গাড়ি চালায়। অর্থাৎ গ্রামে একটাই মাত্র গাড়ি। সেটা তার। আমরা তাকে আগেই আমাদের প্রোগ্রামের কথা জানিয়েছি যে, শনিবার সকালে সে আমাদের তুলে নেবে। বড় রাস্তায় বাস স্ট্যাণ্ডে পৌঁছে দেবে। এখানে তাকে দেখে প্রথমে ভাবলাম, সে আয়োজন নিশ্চিত করতেই এসেছে। কিন্তু সে যা বলল তা সম্পূর্ণ ভিন্ন।

"আপনারা অন্য কোনও গাড়ির ব্যবস্থ্ব করেন"–সে অনুনয় করে বলল।
"কেন, কি হয়েছে? তোমার ঘোড়া অসুস্থ ?"– জিজ্ঞাসা করলাম।
"না স্যার"–সে দ্বিধাগ্রস্তভাবে বলল। এইমাত্র খবর পেলাম চৌধুরী হক নওয়াজ সাহেবকে কাল সকালে শহরে যেতে হবে।"
"নো প্রোবলেম"–বললাম তাকে। "তিনিও আমাদের সাথে চড়বেন।"
"না না"–সে বলল। "বড়লোকেরা অন্যদের সাথে গাড়ি চড়ে না।"

"তিনি কি অনেক লম্বা?"–শাকিলা বিস্মিত হয়ে বলল। "নাকি তার সামনে আমাদের বামন দেখাবে।"

পিরানদিত্তা ভয়ার্ত চোখে চারদিক দেখল। “তিনি সবসময় গাড়ি ভাড়া করে একা চড়েন।”

“ঠিকআছে, এটাই যদি সমস্যা হয় তাহলে তোমার উচিৎ আমাদের নেওয়া। কারণ, আমরা তোমাকে আগে বলে রেখেছি।” কতৃত্বের সুরে শাকিলা বলল।

শাকিলাকে বোঝাতে চেষ্টা করলাম এটা বড় শহর না। এ গ্রামে অগ্রিম বুকিং কিংবা রিজার্ভ করার মতো কোনও ব্যবস্থা নেই। তাছাড়া চৌধুরী হক নওয়াজ সাহেব অত্র এলাকার দুই তৃতীয়াংশ জমির মালিক। পিরানদিত্তা কখনোই তার আদেশ অমান্য করতে সাহস পাবে না।

তবুও সে বলে চলেছে। আমাকে বলছে। “তুমি চৌধুরীর কাছে যাও। গিয়ে বলো যে আগামীকাল সকালে আমরা যাবো। এবং আমরা আগেই গাড়ি বুক করে রেখেছি।”

“তিনি খুব উদ্ধত ও বদ মেজাজী”–বললাম তাকে। “তিনি এটাকে অপমান হিসেবে নেবেন।”

“তুমি কি তাকে ভয় পাও ?”–শাকিলা ধারালো দৃষ্টিতে তাকালো। “আমাকে যেতে দাও। আমিই তার সাথে কথা বলবো।”
“এটা ঠিক হবেনা”–বললাম।

“ম্যাডাম”–পিরানদিত্তা বললো। “যার মান ইজ্জত আছে তার সাথে কথা বলতে ভয় পাবেই।”

“কি অদ্ভুত!”! সে বলল। “একজন মানুষকে অন্য মানুষ ভয় পায়। এটা অবিশ্বাস্য!”

“সব মানুষ যথাযথ মানুষ নয়”–পরিষ্কার ভাবে বোঝাতে চেষ্টা করলাম তাকে। “সে হতে পারে একজন ভাল ড্রাকুলা। সময়ে ড্রাগনও মানুষ রূপ ধরে। কিন্তু এটা যাই হোক। প্লিজ, তুমি সিনেমার নায়িকা হতে যেওনা। সব ভুলে যাও। আমরা অন্য ব্যবস্থা করবো।”

“কিন্তু আমি অন্যায় দেখলে বলবোই। এটা প্রচলিত রীতি-নীতির বাইরে”–সে বললো।

“হ্যাঁ ঠিকআছে”–মেনে নিলাম। “আমরা প্রতিদিন কি নীতি ভঙ্গের ঘটনা দেখিনা? কিছু করতে পারি আমরা? ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও পারিনা। প্লিজ, এ সামান্য ব্যাপারে মন খারাপ করোনা।”

“কিন্তু এটা কি আশ্চর্যের নয় যে একজন লোক প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত জমির শুধু মালিক হওয়ার কারণে গাড়িতে অন্যের পাশে বসতে চাইবে না? সে কি জানেনা কোন যুগে বাস করছে?”

“তিনি অত্র এলাকার নিয়ন্ত্রণভার নিয়েছেন। তিনি বাস করেন নিজের সময়ে। আর এটা ভুলে যেওনা যে, আমরা আছি তার রাজ্যে তার সময়ে।”

“বেশ ভালোই জানি”–সে উত্তরে বলল। “আর এটাও জানি এসব লোকের কারণে রুরাল এরিয়ার মানুষ পেছনে পড়ে থাকছে। তারা স্কুল চায় না, রাস্তা-ঘাট চায় না পাছে মানুষ সচেতন হয়ে যায়, তাদের আধিপত্য চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে।”

এতোক্ষণ সে বলেছে আমি ধৈর্য ধরে শুনেছি। আমি জানি সে কয়েকদিন ধরে নিজের শ্রেণীতে অবস্থান করছে না।

পিরানদিত্তা চলে গেলে আমরা বাড়ি ফিরে এলাম। তাকে শান্ত রাখতে চেষ্টা করলাম। যাতে সারারাত ধরে বাড়িতে বক্তৃতা দিতে না থাকে।
যেই আমরা বসছি পিরানদিত্তা ফিরে এলো।
“এখন কি হলো?” জিজ্ঞাসা করলাম তাকে।
“স্যার, অনুমতি পেয়েছি।”
“কিভাবে?”

“চৌধুরী সাহেবকে বললাম যে রাস্তা ভেঙ্গে-চুরে গেছে। আর ধুলার ঢেউ উঠছে। তার জামা-কাপড় নষ্ট হয়ে যেতে পারে।”
“তারপর?”
“তিনি কালুকে ডেকে ঘোড়া জুততে বললেন।”
“কোন ঘোড়া?”–শাকিলা জিজ্ঞাসা করলো।
“কেন তার নিজের ঘোড়া”–উত্তর দিলো পিরানদিত্তা। “তাদের পারিবারিক ঘোড়া একটা।”

পিরানদিত্তাকে ধন্যবাদ দিয়ে পরদিন সকালে যথাসময়ে আসতে বলে দিলাম। সে চলে গেল। কিন্তু শাকিলা এখনও উত্তেজিত। “তিনি ভাড়া গাড়িতে অন্যের সাথে শেয়ার করে উঠেন না।”–সে ঘৃণার সাথে বলল। “এটা নোংরা জমিদারী মনোভাব, ফু ঃ।”

“এখন রাগ কমাও”–হেঁসে বললাম তাকে। “সমস্যা হলো যে কখনো চৌধুরী সাহেব তোমাকে দেখেননি।”

সে অবাক চোখে আমার দিকে তাকলো। তার দিকে ফিস্ ফিস্ করে বললাম,"যদি তিনি তোমাকে দেখতেন, তিনি মনে করতেন তোমার পাশে বসা তার সৌভাগ্য।"

তার রাগ কমে যেতে লাগলো। ঠোঁটের কোনে হাঁসি দেখা গেল। তার মুখের কথা সরে গেছে। "আমার পা"–শুধু এটুকুই বলতে পারলো।

পরদিন সকালে যখন ভাড়া গাড়িটিতে চড়ে আমরা কিছুদূর গেলাম দেখতে পেলাম আমাদের সামনে ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছেন চৌধুরী হক নওয়াজ সাহেব। তার মাথায় মাড় দেওয়া রঙিন পাগড়ি। পেছনে তার চাকর কালু হেঁটে যাচ্ছে। তার শরীর ঘোড়ার খুরের ধুলোয় মাখামাখি অবস্থা। রাস্তার অন্যপাশের জমিতে কাজ করছিল যারা, চৌধুরী সাহেবকে চিনতে পেরে কাজ থামিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে সালাম জানাচ্ছে।

সকাল থেকেই রোদের তাপমাত্রা বাড়ছে। কড়া গরম পড়ার আগেই আমরা বাসস্ট্যাণ্ডে পৌঁছে যেতে চাইছি। কিন্তু পিরানদিত্তা তার টাট্টুঘোড়াকে টেনে রাখছে। চৌধুরী সাহেবকে ওভারটেক করার সাহস পাচ্ছে না।

কালুর জন্য দুঃখ হচ্ছে। সে ধুলায় সাদা হয়ে গেছে প্রভুর পিছু হাঁটতে হাঁটতে। স্বাভাবিক ভাবেই আমরা কেউ এ ব্যাপারে নাক গলাতে পারি না। তবে শাকিলার পীড়াপীড়িতে পিরানদিত্তা কালুকে বলল আমাদের গাড়ির জন্য জায়গা করে দিতে। চৌধুরী সাহেব এ কথা শুনে ঘাড় ফিরিয়ে আমাদের দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকালেন। এক নজর গাড়িটি দেখে কালুকে অনুমতি দিলেন আমাদের এগিয়ে যাবার সুযোগ দিতে।

সর্বশেষ সেতুটি পার হওয়ার সময় দেখি চৌধুরী সাহেব ঘোড়া থামিয়ে একজনের সাথে কথা বলছেন। আমাদের এগিয়ে যাবার পর্যাপ্ত জায়গা ছিল না। তবুও কোন রকমে পার হয়ে যাবার সময় আমরা সালাম বিনিময় করলাম।

"দেখতে তো বেশ সুশোভিত আর মর্যাদাবান বলেই মনে হলো"– বললো শাকিলা। কালুর উপস্থিতির ব্যাপারে ইঙ্গিতে তাকে সচেতন করে দিলাম। এরপরে সে আর কথা বলেনি। যা ভেবেছি তাই,এখনও সে ভাবছে সে বুঝি এখানে তার শ্রেণীতেই আছে।

বাসস্ট্যান্ডে স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি ভিড়। বাস চলাচল করছে প্রচুর কিন্তু থামছেনা। আবহাওয়া উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। সবাই যার যার গন্তব্যে দ্রুত যাবার জন্য অস্থির হয়ে উঠছে। এরমধ্যে চৌধুরী সাহেবও বাসস্ট্যান্ডে এসে পৌঁছেছেন। লাগামটি কালুর হাতে দিয়ে তিনি অপেক্ষমান যাত্রীদের মধ্যে মিশে গেলেন। অনেকক্ষণ পরে একটা বাস এলো। সবাই দৌঁড়াদৌঁড়ি শুরু করলো। কিন্তু বাসের কন্ডাকটর দরজা

বন্ধ করে রেখেছে। যাত্রীদের দু'হাতে ঠেলে রাখছে। শুধু যারা দূরে যাবে তাদের উঠতে দিচ্ছে। ভাগ্য ভাল আমরা চান্স পেলাম। চৌধুরী সাহেবসহ অন্যেরা পাচ্ছেন না। চাপ দিচ্ছে সবাই,পাল্টা ধাক্কাও খাচ্ছে। চৌধুরী সাহেবের পাগরী মাটিতে পড়ে গেল। দ্রুত তুলে নিয়ে আবার বাসের দিকে দৌঁড়ে এলেন।

দূরের যাত্রীরা যখন নিশ্চিন্তে বসতে পেরেছে তখন কন্ডাকটর অন্যদের ডেকে ডেকে ভেতরে দাঁড় করালো। বাস চলতে শুরু করলো। ঘুরে চেয়ে দেখি চৌধুরী সাহেব দাঁড়িয়ে যাচ্ছেন। পাগড়ি হাতে দাঁড়িয়ে তিনি। ঠেলে ঠেলে পেছনের দিকে চলে গেলেন। শাকিলার দিকে তাকালাম। মুচকি হাসছে। তার হাসি হাজার কথার চেয়েও বেশী অর্থবহ।

অন্যান্য

এম সাইদুর রহমান তসলিম*

হগো-পগো

লেখকের কথা ঃ বাংলাদেশের মঞ্চনাটকে এক দৃশ্যের নাটক বিরল। পেশাদার অভিনেতা অভিনেত্রী ছাড়া এ জাতীয় নাটক মঞ্চস্থ করা দূরুহ। একটানা সংলাপ ক্ষেপণ, বডিলি ও বার্বাল একশান প্রয়োগ করা যথেষ্ট কষ্টসাধ্য ব্যপার। রাজা হবু মন্ত্রী গবু'র সাথে গোপালভাঁড়ের কোন সম্পর্ক নেই– যেমনটি নেই নায়ের সাথে পচুর। মধ্যস্বত্ব ভোগীদের ষড়যন্ত্রে রাজার পরিবর্তন ঘটলেও হাজার বছর ধরে মধ্যস্বত্ব ভোগীদের কার্যক্রম প্রবাহমান। এ দুষ্ট কীটদের প্ররোচনায়, তোষামদে বিভ্রান্ত হয়ে শাসক হয় ক্ষমতাচ্যুত। নাটকটি মূলত হাস্য-রসের আড়ালে চলমান সংকট নিয়ে রচিত। আশা করছি ভাল লাগবে পাঠকের।

প্রথম দৃশ্য

(রাজা হবুচন্দ্র, মন্ত্রী গবুচন্দ্র, নায়েব পচুচন্দ্র, গোপালভাড় ও ৩ রক্ষী)

হবু ঃ কি হে গোপাল, অমন চুপচাপ বসে আছ কেন ! তোমার দুটো কথা শুনেইতো প্রতিদিন শাসন কার্যে হাত দেই। দেখছোনা সবাই কেমন ঘুমুচ্ছে – তাদেরকে জাগাও।

গোপাল ঃ না রাজা মশাই, আজ আমার মন ভাল নেই।

হবু ঃ একি শোনালে গোপাল! তোমার মন ভাল নেই কেন? তোমার মনে যদি অসুখ বাসা বাধে তবেতো জগৎ অসহায়। এই রাজ দরবারতো একেবারে অচল। মন্ত্রী গবু, নায়েব পচু- শোন তোমরা গোপালের কথা। আজ গোপালের মন ভাল নেই (হাসি)। "তোমার মন ভাল নেই" এই স্তবক দিয়েই শুরু কর আজকের সভা।

গোপাল ঃ আমার কেন মন ভাল নেই সেই কথা আমায় বলতে বাধ্য করবেন না রাজা মশাই। আমি সেই কথা বলতে পারবোনা।

পচু ঃ ন্যাকামি। ঢং না করে বল কেন আজ তোমার মন ভাল নেই।

গবু ঃ হ্যাঁ, নায়েবের সাথে আমি একমত। ভনিতা না করে সরাসরি বলে ফেল কেন তোমার মন ভাল নেই।

---

* শিক্ষার্থী, বাংলা বিভাগ, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ।

গোপাল ঃ বেয়াদবি নেবেন না মন্ত্রী মশায়। আপনি ও রাজা মশায় যদি আমাকে অভয় দেন তবেই কেবল বলতে পারি আমার মন ভাল না থাকার কথা।

হবু ঃ নিশ্চয়ই, আমি তোমাকে অভয় দিলাম। এবার বল তোমার কথা।

গোপাল ঃ একাদশী শেষে চান করে খেয়ে দেয়ে কাল যখন ঘুমুতে গেলাম, আর ঘুম আসছেনা– আসছেনা।

পচু ঃ তারপর!

গোপাল ঃ তারপর! তারপর অনেক কষ্ট করে চোখ বুজে রইলাম।

হবু ঃ তারপর!

গোপাল ঃ তারপর! জানেন রাজা মশাই, তারপর কখন জানি ঘুমিয়ে পড়লাম।

গবু ঃ এটাই তোমার কাহিনী? চোখ বন্ধ করলেতো সবাই-ই ঘুমিয়ে পড়ে– যত্তসব।

পচু ঃ রাজা বাহাদুর দেখেছেন তার দৃষ্ঠতা? সে ঘুমের কথা বলতে গিয়ে আমাদের কেমন মদন বানিয়ে ছাড়ল। এর একটা বিহিত করুন রাজা বাহাদুর।

হবু ঃ তোমার এই নিরস ঘুমের কথা শোনাতে আমাদের বসিয়ে রেখেছ গোপাল? আমি এইসব শুনতে চাইনা, চাই আরো ভালো কিছু। যাতে আমার মনের খোরাক হয়।

গোপাল ঃ বেয়াদবী নেবেন না রাজা মশাই। আমার কথা কিন্তু শেষ হয়নি।

গবু ঃ আমি জানতুম, গোপালের কথা শেষ হয়নি। কারণ, আমাদের পেটে খিল না ধরিয়ে গোপাল শেষই করতে পারে না।

পচু ঃ তোমার কথা শেষ কর দেখি একটু হাসতে পারি কিনা।

গোপাল ঃ আমি ঘুমিয়ে গেলাম। হঠাৎ ঘুমের ঘোরে দেখি, এক মুনিঋষি আমার পৌথানে বসে আছে। হাতে তার লম্বা এক তরবারী। সে আমাকে বলল, সে আমাকে বলল–

গবু ঃ কি বলল?

গোপাল ঃ আমি বলতে পারবো না হুজুর।

গবু ঃ বললেই হলো! তোমাকে বলতেই হবে সে কথা। শত হোক মুনিঋষি বলে কথা। মুনিঋষির কথা শুনতে আমরা সকল শর্ত মেনে নিতে রাজি আছি।

গোপাল ঃ রাজা বাহাদুর কি বলেন?

হবু ঃ গবুর কথায় একমত আমি। তোমার সকল শর্ত মেনে নেয়া হলো।

গোপাল ঃ মুনিঋষি ধমক দিয়ে বলল, তুই আর রাজ দরবারে যাবিনা।

পচু ঃ কেন? রাজ দরবারে আসতে বারণ করলো কেন?

গোপাল ঃ সে কথা মনে হলেইতো আমার কল্‌জে ছোট হয়ে যায়। আমি সেই কথা বলতে পারবো না রাজা বাহাদুর।

হবু ঃ কেঁদোনা গোপাল কেঁদোনা। যত কষ্টেরই হোক না কেন তুমি সব খুলে বলো। কল্‌জে শুকাবার কোন কারণ নেই। আমি অভয় দিলাম, তোমার কোন দণ্ড হবেনা।

গবু ঃ আমিতো আগেই বলেছি গোপাল, তোমার কথার জন্য তোমার সকল শর্ত মেনে নেয়া হলো। তা হলে আর ভয় কিসের।

গোপাল ঃ ঠিক বলেছেন মন্ত্রী বাহাদুর? আমার কোন দণ্ড হবে নাতো?

পচু ঃ কতবার বলতে হয় এক কথা। বল, তারপর কি বললো।

গোপাল ঃ তারপর বললো, রাজ দরবারের সভাসদ বিশেষ করে রাজা বাহাদুর, মন্ত্রী বাহাদুর আর নায়েব মশাই পচু এই তিনজন লোক নাকি বেশি ভালো না।

হবু গবু পচু একসাথে ঃ কি বলছ এসব?

গোপাল ঃ আমি কিন্তু শর্ত দিয়েছি।

হবু ঃ ও শর্ত। ঠিকআছে তারপর বলো।

গোপাল ঃ তারপর এক এক করে বয়ান শুরু করলো- কার নামের কি অর্থ।

গবু ঃ তা কি অর্থ বললো?

গোপাল ঃ প্রথমে বললো পচু নায়েবের কথা।

পচু ঃ নিশ্চয়ই খুব খারাপ কিছু বলেনি। তাইনা গোপাল!

গোপাল ঃ খারাপ কি ভালো তা আমি জানিনে। মুনিঋষি বললো- বললো- বলবো হুজুর?

হবু ঃ অবশ্যই বলবে।

গোপাল ঃ গম্ভীর হয়ে চোখ পাকিয়ে বললো, ওহে গোপাল। ঐ যে তোদের নায়েব, তার নামতো পচু। তাইনা? তুই কি জানিস্ , তার নাম ঈশ্বর প্রদত্ত। তুই দশবার রামনাম জপ। আমি দশবার রামনাম জপলাম। আপনারাও জপুন (সবাই জপবে)। যখন জপ বন্ধ হলো তখন ঋষি বললো, ঐ যে পচু তার নামের অর্থ হলো-অর্থ হলো-বলবো হুজুর?

হবু গবু পচু একসাথে ঃ অবশ্যই বলবে। আমরাও দশবার রামনাম জপেছি।

গোপাল ঃ বললো, পচু হলো– ‘প’তে পয়সা আর ‘চু’তে চুর। তার মানে হলো নায়েব মশাই পয়সা চোর।

পচু ঃ সাবধান গোপাল। হুজুর, এর একটা বিহিত করতেই হবে।

হবু গবু ঃ গোপন হাসি থেকে অট্টহাসি।

হবু ঃ তাইতো তুমি গোপাল। দেখলে গবু, স্বপ্নের মাঝেও গোপাল হাসির খোরাক যোগায়।

পচু ঃ আমি এসব বিশ্বাস করিনে। নিশ্চয়ই এটা গোাপলের চাল।

গবু ঃ থামোতো নায়েব, আর কি বললো ঐ ঋষি। খুলে বলো গোপাল।

গোপাল ঃ বলেছেতো অনেক কিছুই। তবে একটা সতর্ক বাণীও রয়েছে। এটা বললো সবার পর।

হবু ঃ খুব আনন্দদায়ক ঘটনার আচ করছি আমি। ভালো করে বসে নেই। গোপাল শুরু কর তুমি।

গোপাল ঃ তারপর ঋষি বললো, ঐযে তোর মন্ত্রী বাহাদুর গবুচন্দ্র। তার নামের অর্থ জানিস্? আমি বললাম, জানিনেতো! তুমিই বলো বাবা। আবার রামনাম জপের পর বললো, ঐ ব্যাটা গবু তার ছোট বেলায় গরুর দুধ খুব পছন্দ করতো।

গবু ঃ একদম সত্যি কথা। আমিতো এখনও গরুর দুধ ছাড়া খাবার কল্পনাই করতে পারি না। একদম খাটি কথা। আমি বুঝতে পারছি রাজা বাহাদুর, ঋষি কি বলেছে।

হবু ঃ কি বলেছে?

গবু ঃ ঋষি নিশ্চয়ই বলেছে ছোট বেলার সেই ঘটনাটা। একদিন দুধের ননী চুরি করে খেয়েছিলাম। পরেতো পেট ফেঁপে গামলা। কি যে কষ্ট হয়েছিল সেদিন। উ-ফ- -। সেই কথাই বলেছে ,তাই না গোপাল?

গোপাল ঃ না তো? এটাতো বলেনি যে আপনি ছোট বেলা চোর ছিলেন।

গবু ঃ সাবধান গোপাল। (হবু ও পচু চোরা হাসবে)

গোপাল ঃ না। বলছিলাম, মুনিঋষি এ তথ্যটি দেয়নি যে আপনি বাল্যকালে গরুর দুধ চুরি করে খেতেন।

গবু ঃ আসল কথা বল। আমার সম্পর্কে ঋষি বাবা কি কথা বলেছে?

গোপাল ঃ বলেছেতো অনেক কিছুই। তবে সার কথা হলো, আপনি যখন চার মাসের শিশু তখনই আপনার বাবা বুঝতে পেরেছিলেন যে, আপনি মায়ের দুধের বদলে গরুর দুধের ভক্ত ছিলেন। এবং তখনই তিনি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেন–

হবু ঃ সিদ্ধান্ত! কিসের সিদ্ধান্ত?

গবু ঃ হ্যাঁ, সিদ্ধান্তের কথা বলো।

গোপাল ঃ সিদ্ধান্ত হলো এই যে, আপনার ভাবসাব ভালো না দেখে–

গবু ঃ ভাবসাব! কি ভাবসাব ছিল আমার?

গোপাল ঃ ভাবসাব মানে হলো, আপনার কান্নার সুর নাকি ছিল অন্য ধরনের। মানে মানুষের মতো না কেঁদে আপনি হাম্বা হাম্বা করতেন। যখনই গরুর দুধের বাটি আপনার সামনে দেয়া হতো তখনই একদম চুপচাপ। শুধু তাই নয়, চতুষ্পদ প্রাণীর মতো আপনি চপ্‌চপ্ করে এক টানে সে দুধ সাবার করতেন।

পচু ঃ অবাক কাণ্ডতো রাজা বাহাদুর!

গবু ঃ তুমি চুপ করো। পরে বলো।

গোপাল ঃ আপনার এ গো প্রীতি দেখে ঠিক করলেন আপনার নাম রাখবেন গরু।

গবু ঃ খবরদার নাফরমান।

হবু ঃ তুমি চুপ করো গবুচন্দ্র। তুমি কি ভুলে গেছ শর্তের কথা?

গবু ঃ আমায় মার্জনা করুন মহারাজা তারপর বলো গোপাল।

গোপাল ঃ বাবা বললেন গরু। আর আপনার মা বললেন গরু হবে কেন-সেতো ছোট তাই তার নাম দাও বাছুর – না গরু – না বাছুর – না গরু – না বাছুর। এমন তর্ক শুরু হলে আপনার দাদা মশায় এসে সাব্যস্তকরলেন, গরুও না বাছুরও না নাম হবে গবু। অর্থাৎ বাছুর বড় হলেই গরু হয়। সবাই যদি গরু গরু বলে তবে শুনতে জানি কেমন লাগবে। তাই গরুর ব'শুন্য রয়ের ফোটা তুলে নাম রাখা হলো গবু। বুঝলেন এবার।

(হবু ও পচু হাসবে, গম্ভীর গবু)

হবু ঃ চমৎকার যুক্তি। গোপাল, আজ থেকে নায়েবকে পয়সা চোর আর মন্ত্রীকে গরু বলে ডাকবো। কেমন হবে বলো (হাসি)।

গোপাল ঃ ভালো হবেনা রাজা বাহাদুর।

হবু ঃ কেন?

গোপাল ঃ আপনি তাদেরকে পয়সা চোর আর গরু বলে ডাকলে রাজ্যে প্রচার হয়ে যাবে সে কথা।

হবু ঃ সবাই প্রাণ খুলে হাসবে নায়েবকে দেখে। বলবে, ঔ দেখ পয়সা চোর যায়। মন্ত্রীকে দেখে বলবে, ঔ দেখ গরু যায়। (হাসি)

গোপাল ঃ সাথে কিন্তু ওটাও বলবে, ঔ দেখ হদ্দ বোকা রাজা যায়। (হাসি)

হবু ঃ হদ্দ বোকা মানে?

গোপাল ঃ আপনার কথাতো বলাই হয়নি।

গবু পচু একসাথে ঃ রাজা বাহাদুরের কথা তাড়াতাড়ি বল গোপাল।

গোপাল ঃ মুনিঋষির মতে, রাজা বাহাদুর যখন ছোট তখন আবিষ্কার হলো রাজা বাহাদুর একদম বোকা। যাকে বলে একেবারে গাধা।

হবু ঃ গো-পা-ল (সবাই ভয় পেয়ে কেঁপে উঠবে)।

গোপাল ঃ আমি কিন্তু শর্ত দিয়েছি।

হবু ঃ ও শর্ত –

গোপাল ঃ তখন ঠিক হলো, রাজা বাহাদুরের নাম রাখা হবে হদ্দ বোকা। কিন্তু মা বাধ সাধলেন। তিনি বললেন, এটা কেমন শোনায়। এক কাজ কর, এমন নাম রাখ যাতে কেউ না বুঝে। তখন ঠিক হলো, হদ্দের 'হ' আর বোকার 'বু' – মানে নাম রাখা হবে হবু। তাই আপনার নাম হলো হবু। (সকলের হাসি)

হবু ঃ কে আছিস , গোপালকে শুলে চড়া।

প্রহরী ১ ঃ আমি আছি। (এসে গোপালকে ধরবে)

গবু ঃ রাজা বাহাদুর, আমরা কিন্তু শর্ত দিয়েছিলাম যে, গোপালকে কোন দণ্ড দেবনা।

হবু ঃ আমি শর্ত ভঙ্গ করলাম। যা তাকে নিয়ে যা । শুলে চড়িয়ে প্রাণদণ্ড কার্যকর কর।

গোপাল ঃ এতদিন জেনেছি রাজা হবুচন্দ্র কখনো ওয়াদা ভঙ্গ করেন না। কিন্তু আজ দেখলাম রাজার অঙ্গিকার ভাঙ্গার দৃশ্য। যাই হউক রাজা বাহাদুর, আপনার আদেশে আমার প্রাণ যদি যায় তবেই আমি ধন্য। তারপরও মৃত্যুর পূর্বে স্বপ্নের শেষ কথাটা বলে যেতে চাই। যদি শেষ কথাটা বলার অনুমতি দেন তবে আমি মরে গিয়েও শান্তি পাব।

হবু ঃ বল তোমার শেষ কথা।

গোপাল ঃ মুনিঋষি চলে যাবার আগে বললেন, এই স্বপ্নের কথা যদি রাজা, মন্ত্রী ও নায়েব জেনে যায় তবে ছয় ঘন্টার মধ্যে গলায় রক্ত উঠে মৃত্যু অনিবার্য।

হবু ঃ কি সর্বনাশের কথা। তবে উপায়? (পচু কাশবে,গবু আতংকিত)

গোপাল ঃ উপায়তো নিশ্চয়ই আছে। থাক, উপায়ের দরকার নেই। আমার যখন প্রাণদণ্ড হবে তখন অন্যের বাঁচা মরা দিয়ে কি করবো আমি। রাজা বাহাদুর, দ্রম্নত আমাকে শুলে চড়ান। আমি আর বাঁচতে চাইনা। আমি মরতে চাই। চিরদিনের জন্য ঘুমাতে চাই। আমায় প্রাণদণ্ড দিন মহারাজ।

হবু ঃ (গলার স্বর নরম করে) কি যে বল গোপাল। আমিত এমনিতেই মস্করা করলাম তোমার সাথে। আমি কখনো শর্ত ভঙ্গ করিনা। এই গোপালকে ছেড়ে দে। এবার উপায়টা বল গোপাল।

পচু ঃ হে ভাই গোপাল, বাঁচার উপায় বলে দাও না দাদা। তোমায় পেট পুরে মোহনভোগ খাওয়াব – আমারত রক্ত বুকে চলে এসেছে।

গবু ঃ হ্যাঁ ভাই, আমার পেটেও মোচর দিয়েছে। কেমন যেন রক্তের গন্ধ পাচ্ছি। আমাদের বাঁচার উপায়টা বলে দাও ভাই।

হবু ঃ আমারওত কাশি আসছে। মুক্তোর মালা বকশীস দিব। উপায়টা বলে দাও গোপাল।

গোপাল ঃ রাজা বাহাদুর যখন বলেছেন তখন উপায়তো বলতেই হবে। মুনিঋষি বলেছেন, অনিবার্য মৃত্যু ঠেকাতে ঋষিকে ভোগ দিতে হবে।

হবু ঃ ভোগ দিব। নিশ্চয়ই দিব।

গবু ঃ তা কি ভোগ দিতে হবে?

পচু ঃ তারাতারি বল গোপাল। রক্ত বোধহয় গলায় উঠে গেল।

গোপাল ঃ খুবই কঠিন ভোগ। সাতটি কাকাতুয়া, পাঁচটি দাড়িওয়ালা পাঠা, আর সোয়া কেজি বাঘের দুধ। আর এসব আজ সন্ধ্যা বাতির আগেই দিতে হবে।

হবু ঃ কোথায় পাব এসব?

গবু ঃ এবার বোধহয় আর বাঁচলাম না।

পচু ঃ গোপাল কি শোনালে এসব। আমি বোধহয় সরেই গেলাম। ওগো হ্যাদার মা তুমি বিধবা হয়ে গেলে গো। রাজা বাহাদুর, মন্ত্রী মশায় আমায় বিদায় দিন। আমি মরে গেলাম গো (বলেই পড়ে যাবে)।

গোপাল ঃ ভয় পাবেন না রাজা বাহাদুর। ঋষি বিকল্প কথাও বলে গেছে। ভোগ না পেলে সহজ পথও দেখিয়ে গেছেন।

হবু গবু পচু ঃ (খুশিতে একসাথে বলে উঠে) সহজ পথ আছে? আমরা তাহলে বাচঁবো?

গোপাল ঃ অবশ্যই বাচঁবেন।

হবু ঃ এইত ভাল লাগছে।

গবু ঃ বড় আরাম পাচ্ছি।

পচু ঃ হ্যাদার মা, তোমাকে আর বিধবা হতে হবে না।

হবু ঃ তো সহজ পথটা কি বল।

গোপাল ঃ ঋষি বলেছেন, যদি ভোগ না পাওয়া যায় তবে জনপ্রতি পাঁচশত স্বর্ণ মুদ্রা করে মোট পনর শত আমার বালিশের নিচে রেখে দিতে হবে। আমি যখন ঘুমাবো মুনিঋষি তখন নিজ দায়িত্বে তা নিয়ে ভোগ কিনে নিবেন।

পচু ঃ পাঁচশ করে পনরশ স্বর্ণ মুদ্রা!

গোপাল ঃ আরো আছে। যদি দর কষাকষি হয় তবে মুদ্রা দ্বিগুণ দিতে হবে।

হবু ঃ সাবধান কথা বাড়িও না।

গবু ঃ স্বর্ণমুদ্রা বড় না জীবন বড়। প্রায়তো মরেই গিয়েছিলাম।

হবু ঃ কথা না বলে পনরশ স্বর্ণমুদ্রা গোপালের হাতে তুলে দাও। গোপাল, তুমি গিয়ে এখনই ঘুমিয়ে পড়। যাও – যাও – (পচু মুদ্রা দিবে। গোপাল খুশিতে তা গ্রহণ করবে। প্রহরীরা চোখাচোখি করবে।)

গোপাল ঃ হবু রাজা কি জয়। গবু মন্ত্রী কি জয়। পচু নায়েব কি জয়। আজ প্রমাণিত হলো আসলেই হবু রাজার কাছে অর্থ কিছুই নয়। মুনিঋষির বাণীই বড়। রাজা মশাই আমি এখন যাই। তারাতারি ভোগ না দিলেতো আবার গলায় রক্ত উঠে যাবে।

হবু ঃ যাও। তারাতারি যাও।

গবু ঃ দ্রুত শুয়ে পড় গিয়ে।

পচু ঃ আর কথা কেন গোপাল। ভোগটা দিয়ে এস।

গোপাল ঃ আমি গেলাম। আদাব – আদাব – আদাব।
(পথ আগলে দাড়াবে প্রহরী)

প্রহরী ২ ঃ সবাইকে বোকা বানালেও আমি কিন্তু সব টের পেয়েছি। সুযোগ সুবিধা না দিলে একেবারে ডাণ্ডিপটাশ করে দিব। মনে থাকে যেন।
গোপাল ঃ আমি জানিত, তোমরা হবু গবু আর পচুর মতো গাধা গরু আর বলদ নও। সময় হলে সাইজ করে দিব।(প্রস্থান)

প্রহরী ২ ঃ মনে থাকে যেন।
(চেচামেচি করতে করতে রাণীর প্রবেশ। সাথে রাজকুমারী)

হবু ঃ একি কাণ্ড! অন্তপুর ছেড়ে তুমি একেবারে রাজ দরবারে?

রাণী ঃ গোস্তাকী মাফ করবেন আলমপনা। সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেছে বলেইত রাজ দরবারে ছুটে এলাম।

হবু ঃ সহ্যের সীমা! কিসের সহ্য?

রাজকুমারী ঃ কেন আব্বা হুজুর। আপনি কি জানেন না যে মা জননী দাঁতের ব্যথায় কাতর হয়ে আছেন দুইদিন ধরে।

রাণী ঃ হ্যাঁ আলমপনা। দাঁতের ব্যথায় আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত। আমি আর সহ্য করতে পারছিনা। শাহী হেকিমের ঔষধেও কাজ হচ্ছে না। যে ব্যথা নিয়ে আমি এখনও

বেঁচে আছি তা যদি অন্য কারো হতো তবে এতক্ষণে বিষ পানে আত্মহত্যা করত জাহাপনা। উ-হ্ ।

হবু ঃ আত্মহত্যা! সে কি কথা! গবু, পচু। তোমরা দাঁড়িয়ে দেখছ কি? একটা ব্যবস্থা কর। আমার রাজ্যের হেকিমদের জড়ো কর। বোর্ড বসিয়ে সেবা দাও রাণীর।

গবু ঃ জাঁহাপনা যদি অভয় দেন তবে একটা কথা বলতে পারি।

হবু ঃ নিশ্চয়ই বলবে গবু।

গবু ঃ রাণী মাতার তো দাঁত মাজার কোন সমস্যা নেই। তাইনা ?

রাজকুমারী ঃ তা থাকবে কেন? আম্মিজানতো দুইবেলা জইতুন দিয়ে দাঁত মাজেন।

গবু ঃ যা সন্দেহ করেছিলাম জাঁহাপনা। রাণীমার আক্কেল দাঁত উঠছে। এবার রাণীমার আক্কেল বুদ্ধি হবে।

পচু ঃ আমিওতো তাই বলতে চেয়েছিরাম। রাণীমার আক্কেল হচ্ছে।

গবু ঃ খামোশ না লায়েক। (চুপসে যাবে পচু)

রাণী ঃ আমি আর সহ্য করতে পারছিনা।

রাজকুমারী ঃ আম্মি একটু শান্ত হও। আমি যে তোমার কান্না সহ্য করতে পারছি না।

হবু ঃ আমিওতো সহ্য করতে পারছিনা (চাখ মুছবে হবু)। আচ্ছা, আমারতো কখনো এমন ব্যথা করেনি গবু। এ ব্যথা কেমন লাগে।

গবু ঃ আমি কেমন করে বলবো। আমারওতো কখনো এমন ব্যথা করেনি হুজুর।

পচু ঃ হাসি।

হবু ঃ তুমি হাসছো কেন নায়েব?

পচু ঃ আমি হাসছি এই জন্য যে, আপনাদের দুইজনের একজনেরও আক্কেল দাঁত উঠেনি। (আবার হাসি)

গবু ঃ মানে?

পচু ঃ মানে খুব সহজ। আক্কেল দাঁত যার উঠেনি সে ব্যাক্কেল। (অট্টহাসি)

গবু ঃ কি বলতে চাও তুমি? তার মানে আমরা ব্যাক্কেল।

পচু ঃ আস্তেবলুন হুজুর। লোকজন জেনে যাবে। যদি তারা জানে আমাদের রাজা ও মন্ত্রীর এখনো আক্কেল দাঁতই উঠেনি তবে কাল থেকে কেউ আর আপনাদের মান্য করবেনা।

হবু ঃ তাই নাকি? কেউ কি একথা শুনেছে? (উদ্বেগের সাথে)

গবু ঃ এই প্রহরীরা, তোমরা কি কেউ কিছু শুনেছ?

(প্রহরীরা সবাই একসাথে না সূচক মাথা নাড়াবে)

হবু ঃ বাঁচা গেলো। তা পচু, তোমার কি আক্কেল দাঁত উঠেছে?

পচু ঃ উঠেছে মানে! এক্কেবারে সবগুলো।

হবু ঃ তো কতদিনের ব্যথায় এসব দাঁত উঠেছিল তোমার?

পচু ঃ সে আর বলবেন না জাহাপনা। চারটি আক্কেল দাঁতের চারটি করে কোনা। সর্বমোট ষোলবার ব্যথা উঠেছিল।

হবু ঃ তার মানে রাণীর ষোলবার এমন ব্যথা হবে।

রাণী ঃ ও - মাগো - আমি তাহলে আর বাঁচবোনা গো।

রাজকুমারী ঃ আম্মিজান – আম্মিজান। (প্রহরী ২ কাঁদবে)

হবু ঃ একি হলো। গবু পচু তোমরা কিছু কর (ব্যাকুলভাবে)।

পচু ঃ আমি কি করবো হুজুর?

রাণী ঃ জাঁহাপনা, আপনি বিচলিত হবেন না। আমি অন্তপুরে যাচ্ছি। যদি পারেন শাহজাদী গুলবাহারের কাছে জরুরী দাওয়া পাঠিয়ে দেবেন।

হবু ঃ তুমি ক্লান্ত রাণী। একা যেতে পারবেনা। প্রহরী, রাণীমাকে হেরেমে পাঠিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা কর। (প্রহরীর সাথে রাণী চলে যাবে গালে হাত চাপা দিয়ে)

হবু ঃ কি করি এখন বলতো গবু। গোপাল যে কোথায় গেলো। (চিন্তিতভাবে)

পচু ঃ গোপালত এখন নাকে তেল দিয়ে ঘুমাচ্ছে।

হবু ঃ আমার বিপদের সময় গোপাল নাকে তেল দিয়ে ঘুমাচ্ছে। প্রহরী – যাও, গোপালকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে এসো। যাও – (প্রহরী ২ ছাড়া সকলের প্রস্থান)

গবু ঃ একি করলেন রাজা বাহাদুর! গোপালত ঘুমিয়ে ভোগ দিবে। নয়ত আমরা –

পচু ঃ মরে যাবো রাজা বাহাদুর।

হবু ঃ তাইতো! আমারতো খেয়ালই ছিলনা।

গবু ঃ হুজুর, আপনার পায়ে পড়ি। আপনি আদেশ প্রত্যাহার করে গোপালকে ঘুমাতে দিন। যাতে ঋষি ভোগ নিতে পারে।

পচু ঃ হ্যাঁ জাঁহাপনা। গোপালকে শান্তিতে ঘুমাতে দিন। আমি বোধহয় মরেই যাচ্ছি। (কাশি)

রাজকুমারী ঃ এসব কি হচ্ছে আব্বাজান! আমিতো কিছুই বুঝতে পারছিনা।

হবু ঃ তোমরা এত ঘাবড়াচ্ছ কেন? বখশিশ নিতে কেউ কি কখনো দেরী করে? অপেক্ষায় থাকে কখন পাবে। যখনই হাতের কাছে এসে যায় তখনই ছোঁ মেরে নিয়ে যায়।

গবু ঃ কিছুই বুঝলাম না জাহাপনা।

পচু ঃ খুলে বলুন জাহাপনা। আপনার অবিচল আচরণে আশার আলো দেখতে পাচ্ছি। দোহায় আপনার, খুলে বলুন জাহাপনা। (পায়ে পড়বে)

হবু ঃ (পা তুলে চেয়ারে বসবে) আসলে তোমাদের এতদিনেও বুদ্ধি হয়নি। গোপাল দরবার ত্যাগ করেছে চার ঘন্টা আগে। তখন ভর দুপুর। গোপাল ভুড়ি ভোজ করে নাক ডাকিয়ে ঘুমায় -তাতো জানোই। তো আরো কমপক্ষে দুই ঘন্টা পূর্বেই গোপাল বালিশের তলায় মুদ্রা রেখে ঘুমিয়ে গেছে। ধরে নাও সে ঘুমাবার এক মিনিটের মধ্যেই মুনিঋষি ভোগ নিয়ে গেছে। কারণ, মুনিঋষিতো দিব্যদৃষ্টি দিয়ে সবই দেখে। তাহলে গোপালের লম্বা ঘুম দিয়ে আমাদের লাভ কি?
গবু পচু একসাথে ঃ হবু রাজা কি জয়। বুদ্ধিমান রাজা দীর্ঘজীবী হোন।
(প্রহরী সহ গোপালের প্রবেশ)

গোপাল ঃ আদাব জাহাপনা।

হবু ঃ একি প্রহরী, চণ্ডীদাস এলোনা ?

প্রহরী ১ ঃ চণ্ডীদাসত আমাদের সনে যায়নি মহারাজ।

পচু ঃ হুজুর, এসব কথা বাদ দিয়ে আগে ভোগের কথা বলুন।

গবু ঃ হ্যাঁ জাঁহাপনা। গোপাল আগে বল, তুমি কি ঘুমিয়েছিলে? ঋষি কি ভোগ নিয়েছে? ঋষি কি বললো?

গোপাল ঃ নিয়েছে মানে –বলতে গেলে ছোঁ মেরেই নিয়ে গেছে। চোখের পাতা লাগার আগেই অনুভব করলাম,অদৃশ্য দু'টি হাত আমার বালিশের তলায় ঢুকল আর বেরুল। আ - র খুব আস্তে একটা কথা শুনতে পেলাম।

হবু গবু পচু একসাথে ঃ কি কথা?

গোপাল ঃ শুনতে পেলাম – হবু, গবু, পচু, আর তুই তিনশ বছর বাঁচবি।

হবু গবু পচু একসাথে ঃ ঋষি বাবা কি জয়।

হবু ঃ বলেছিলাম না গবু, তোমাদের এখনও বুদ্ধি হয়নি। দেখলেতো, আমার কথা কেমন সত্যি হলো।
(হবু, পচু হাসি)

হবু ঃ যা হোক, কি জানি বলছিলাম। ও-হো, চণ্ডীদাস আমার আদেশ অমান্য করেছে। প্রহরীদের আমি আদেশ করেছিলাম গোপালের বাড়ি যেতে। সে আমার আদেশ অমান্য করে রাজ দরবারে দাঁড়িয়ে থেকে দৃষ্ঠতা দেখিয়েছে। তার গর্দান কাটা হোক। প্রহরী, এ নালায়েকের গর্দান কেটে হেরেমের প্রধান ফটকে ঝুলিয়ে দাও।

রাজকুমারী ঃ না – না – না। আব্বা হুজুর, এমন কাজ আপনি করবেন না

হবু ঃ রাজকুমারী, একজন প্রহরীর জন্য তোমার এত উৎকণ্ঠার কারণ কি জানতে পারি?

রাজকুমারী ঃ কারণতো অবশ্যই আছে। আব্বা হুজুর, আমি বলছিলাম কি – মানে –

গোপাল ঃ (সামনে এসে আস্তেআস্তে) রহস্যের গন্ধ পাচ্ছি। শালা চণ্ডীদাসের জন্য যদি ফেঁসে যাই।

হবু ঃ চণ্ডীদাস, আমি এই রাজ দরবারে তোমার গর্দান নেব। কে আছিস, জল্লাদ নিয়ে আয়।

গোপাল ঃ জাঁহাপনা, চণ্ডীদাসের গর্দান এই রাজ দরবারেই হবে। এবং তার মুণ্ডু দিয়ে বল খেলা হবে।

হবু ঃ চমৎকার আইডিয়া।

গোপাল ঃ এর আগে আমি চণ্ডীদাসের সাথে কথা বলার অনুমতি প্রার্থনা করছি জাঁহাপনা।

হবু ঃ অনুমতি দেয়া হলো।

গোপাল ঃ এদিকে আসতো বাবা চণ্ডীদাস।

চণ্ডীদাস ঃ হাটে হাঁড়ি ভেঙ্গে দেব। আমার মুণ্ডু দিয়ে বল খেলার আগে তোমার ভুড়ি দিয়ে আমি ডুগডুগি বাজিয়ে ছাড়ব।

গোপাল ঃ আরে ব্যাটা, তোকে বাঁচাতেইতো আমি ফন্দি এটেছি। এখন ঘটনাটা খুলে বল।

চণ্ডীদাস ঃ ঘটনা অতি সাধারণ। আমি রাজকুমারীকে ভালবাসি। রাজকুমারীও আমাকে ভালবাসে।

গোপাল ঃ (মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ে) এটাকে সাধারণ বলছিস্ তুই! তোর গর্দান আজ যাবেই যাবে।

চণ্ডীদাস ঃ আমার গর্দান যাবেনা। কারণ, আমার গর্দান যাবার আগে তোমার ভুড়ি যাবে। তাই নিজের ভুড়ি বাঁচাতে তুমিই একটা ব্যবস্থা করবে। (হাসি)

গোপাল ঃ চুপ কর হতচ্ছাড়া। দেখি কিছু একটা করতে পারি কিনা। (রাজার কাছে গিয়ে) জাঁহাপনা, আমি রাজকুমারীর সাথে কথা বলার অনুমতি চাই।

হবু ঃ অনুমতি দেয়া হলো।

গোপাল ঃ (রাজকুমারীর কাছে গিয়ে) রাজকুমারী আপনি একি করলেন?

রাজকুমারী ঃ ঠিকই করেছি। বাঈজীশালায় গিয়ে আপনারা যখন নারী নিয়ে রঙ্গ-তামাসা করেন তখন মনে থাকেনা তারাও এই রাজকুমারীদের মতই মানুষ। চণ্ডীদাস

সুদর্শন যুবক। আমি তাকে ভালবাসি। তার জন্য আমি জান দিয়ে দিব। আর জান-ই বা দিব কেন। আপনি তো রয়েছেন। আমার পক্ষ থেকে উপঢৌকনও রয়েছে। সকল ব্যবস্থা আপনিই করুন।

গোপাল ঃ তা যা বলেছেন। কোন চিন্তা করবেন না। আমি একটা বিহিত করে দেব–তবে বলুনতো, রাজ দরবারে আপনার আগমনের কারণ কি?

রাজকুমারী ঃ আম্মিজানের আক্কেল দাঁত উঠছে। ব্যথায় কাতর। দাওয়াই নিতে দরবারে এসেছি।

গোপাল ঃ আক্কেল দাঁত! পেয়েছি। পেয়েছি। কোন চিন্তা করবেন না। চণ্ডীদাসের কিছুই হবেনা। তবে –

রাজকুমারী ঃ বুঝতে পেরেছি। এই নিন হিরার অঙ্গুরী।

গোপাল ঃ (রাজার কছে গিয়ে) বিরাট সমস্যা। আপনাকে একটু এদিকে আসতে হবে হুজুর।

হবু ঃ (একটু দূরে সরে এসে) বল গোপাল, কেন আমায় ডেকেছ।

গোপাল ঃ চণ্ডীদাসের গর্দান নেয়া যাবেনা।

হবু ঃ কেন?

গোপাল ঃ তবে ফাঁস হয়ে যাবে রাণীমার আক্কেল দাঁতের কথা।

হবু ঃ হোক।

গোপাল ঃ না। তাহলেত আপনি খোঁজা হয়ে যাবেন।

হবু ঃ তার মানে?

গোপাল ঃ যদি চণ্ডীদাসের গর্দান নেন তখনই শুরু হবে কানাঘুষা। সবাই সন্দেহ করবে। তারপর বেরোবে রাণীমার রাজ দরবারে আসার কথা। দাঁতের ব্যথার কথা। কিন্তু এটাতো হতে দেয়া যাবেনা। কারণ, রাণীমার আক্কেল দাঁত উঠা বন্ধ করতে হবে আগে ।

হবু ঃ কেন?

গোপাল ঃ রাণীমার যদি আক্কেল দাঁত উঠে যায়, তবেত তিনির আক্কেল জ্ঞান বেড়ে যাবে। আপনার চেয়েও বেশি জ্ঞানী হয়ে যাবেন তিনি। তখনতো আর আপনাকে পাত্তাই দিবেন না রাণীমা। দেখবেন, কোন এক ভোরে আপনাকে ফেলে –

হবু ঃ কি সাংঘাতিক কথা! তবে উপায় ?

গোপাল ঃ উপায়ত একটা আছেই। সবে উঠতে শুরু করেছে আক্কেল দাঁত। এখনই ব্যথা বন্ধ করে দিলে দাঁত উঠা বন্ধ। দেখেননি, প্রসব ব্যথা উঠলে প্রসব হয়। আর যদি ব্যথা না উঠে তাহলে প্রসবও নাই।

হবু ঃ তা - ই কর। এক্ষুণি প্রসব বন্ধ করে দাও। না মানে, দাঁত ব্যথা বন্ধ করে দাও। তাড়াতাড়ি দাওয়াই এনে দাও। ওহ্ , আমি পাগল হয়ে যাব। যা করার তাড়াতাড়ি কর। আমি মন্ত্রীর সাথে কথা বলে এক্ষুণি একটা সিদ্ধান্ত নিব।

গোপাল ঃ তা আপনি চিন্তা করবেন না। আমি সব ব্যবস্থা করে নিব। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন জাঁহাপনা। তবে –

হবু ঃ বুঝেছি। এই নাও মুক্তার মালা।

গোপাল ঃ যা বাবা, বাঁচা গেল। শালার চণ্ডীদাস, যা এবার নাকে তেল দিয়ে প্রেম কর।

হবু ঃ প্রহরী। শাহী এলান জারী কর। আজ থেকে এই রাজ্যে কারো আক্কেল দাঁত উঠতে পারবেনা। যদি কারো উঠে তবে তাকে শুলে চড়িয়ে মারা হবে।
(বাইরে চেঁচামেচি)

হবু ঃ কিসের চেঁচামেচি ? প্রহরী, দেখ কি হলো।

প্রহরী ঃ বিচার প্রার্থী এসেছে হুজুর।

গবু ঃ ভিতরে নিয়ে এসো।

পচু ঃ জাঁহাপনা, রাজকুমারীকে রাজ দরবারে বসিয়েই বিচার কাজ করবেন?
গোপাল ঃ ঠিক বলেছেন। চণ্ডীদাস, রাজকুমারীকে অন্তপুরে পৌঁছে দিয়ে এসো।
(চণ্ডীদাসের সাথে রাজকুমারীর প্রস্থান)

(হ্যাবলার মা কাঁদতে কাঁদতে হ্যাবলার বাবাকে নিয়ে প্রবেশ করে)

হ্যা:মা ঃ হুজুর, সুবিচার করুন। এই হ্যাবলার বাবা প্রতি রাতে মদ খেয়ে এসে আমাকে জুতা দিয়ে পিটায়। আমি আর পারছিনা হুজুর।

হবু ঃ কত্ত বড় সাহস। আমার রাজ্যে জুতা পেটা!

গবু ঃ এটা অন্যায়। পিটাবিত পিটা, হাত দিয়ে না হয় লাঠি দিয়ে। কিন্তু তা না করে এক্কেবারে জুতা দিয়ে। জাঁহাপনা, এর বিচার হওয়া উচিত।

হ্যা:মা ঃ শুধু তাই নয়, সে প্রতিদিন আমায় হুমকি দিয়া বলে আরেকটা বিয়া করবো।

পচু ঃ হুজুর, এটা কোন সমস্যাই নয়। বিয়ে সাদিতো পুরুষই করবে। কিন্তু জুতা পেটা করা খুব খারাপ কাজ।

হবু ঃ এই ব্যাটা, ওর কথা কি ঠিক?

হ্যা: বাবা ঃ হুজুর, একদম মিথ্যা কথা। আমি জুতা পামু কই। আমিত খরম দিয়া পিটাই।
হবু গবু পচু একসাথে ঃ কি ?

হ্যাঃ বাবা ঃ হুজুর, আপনিই বিচার করুন। হের মাথা ভর্তি উকুন। এই উকুন এখন আমার মাথায় বাসা বাধছে। উকুনের জ্বালায় আমি ঘুমাইতে পারিনা। দিনরাত মাথা চুলকাই। আপনিই বলেন হুজুর, এরপরও কি তারে নিয়া ঘর করা যায়?

হবু ঃ জটিল সমস্যা।

গবু ঃ তবু বিধান করতে হবে।

পচু ঃ হুজুর, জুতু-খড়ম দিয়ে মানুষ মারা খুবই খারাপ হুজুর।

গোপাল ঃ হুজুর যাই করুন, বেচারা গরীব মানুষ। তার উপর হাবাগোবা। আর মাল খেলেতো আমাদেরই সুবিধা। কোনদিনও মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়াতে পারবে না। বিদ্রোহও করতে পারবে না। এবারের মতো মাফ চাই-য়ে ছেড়ে দিন। আর বউদের একটু না পেটালে সোজা থাকেনা।

হবু ঃ বিধান দিতে হবে। এই ব্যাটা, আরো বউকে খড়ম দিয়ে মারবি? যদি মারিস্ শুলে চড়াব।

হ্যাঃবাবা ঃ না হুজুর, আর কোনদিন এমন করবোনা। আমার প্রাণ নেবেন না।

হবু ঃ (হ্যাবলার মার দিকে ফিরে) শুনেছত নাকি? যদি ভবিষ্যতে তোমাকে আবারো জুতা বা খড়ম দিয়ে পেটায় দরবারে জানাবে। শালার জান নিয়ে নেব। এবার তোমরা যাও। (উভয়ের প্রস্থান)

প্রহরী, শাহী এলান জারী কর। আজ থেকে কেউ বউকে জুতু বা খড়ম দিয়ে মারতে পারবে না। যদি মারতে হয় তবে লাঠি বা হাত দিয়ে মারবে। (এ-লা-ন)
(যদুর প্রবেশ)

যদু ঃ সুবিচার করুন দয়াবান রাজা। আমাদের প্রতিপালক হিসাবে আপনার কাছে সুবিচার প্রার্থনা করছি।

পচু ঃ জাঁহাপনা, প্রজা মশায়ের ঢং দেখুন। পট্টি দিতে এসেছে। ফরিয়াদ বয়ান করুন।

যদু ঃ হুজুর, আমার চোখে তাকিয়ে দেখুন, রক্তের নহর বইছে। আমি কলাবাদুর হয়ে গেছি।

গবু ঃ কলা-বাদুর মানে!

যদু ঃ মানে হলো হুজুর, সারারাত জেগে থাকি সারাদিন ঘুমাই।

পচু ঃ হুজুর, এই ব্যাটা চোর।
হবু ঃ ঐ ব্যাটা তুই কলাবাদুর, না? পচুর কথা যদি সত্যি হয় তবে তোকে শুলে চড়াবো।
যদু ঃ হুজুর, আমি জীবনেও চুরি করি নাই।

গবু ঃ তাহলে রাত জাগিস্ কেন?

যদু ঃ পাশের বাড়ির কদম আর তার বউ সারারাত অট্টহাসিতে মশগুল থাকে। আমরা এই পাড়ার লোকজন অনেক চেষ্টা কইরাও তাদের হাসি থামাইতে পারছিনা। তাদের অট্টহাসিতে আমাদের ঘুম হারাম হইয়া গেছে। সারারাত ঘুমাইতে না পাইরা সারাদিন বাদুরের মত ঘুমাই। আর এই দিকে কাজকর্ম বন্ধ হইয়া ছেলে-পুলে নিয়া না খাইয়া মরার উপায় হইছে। আপনি বিচার করুন হুজুর, বিচার করুন।

হবু ঃ তাজ্জব সমস্যা !

পচু ঃ সমস্যা যত তাজ্জবই হোক না কেন রাজা বাহাদুর নিশ্চয়ই সমাধান করবেন।

হবু ঃ হ্যাঁ। এলান জারি কর। আজ থেকে আমার রাজ্যে আর কেউ হাসতে পারবেনা। হাসির শব্দ শোনা মাত্রই তাকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মারা হবে। অর্থাৎ- হাসি মানেই ফাঁসি। কি, খুশিত যদু ?

যদু ঃ জ্বী হুজুর, আমি খুব খুশি।

হবু ঃ ব্যাটা হাসি বন্ধ কর। প্রহরী, এলান –

গোপাল ঃ হুজুর, এলানের আগে একটা কথা বলতে চেয়েছিলাম।

হবু ঃ না। কোন কথা নয়। আমাকে কঠোর হতে দাও। আমি সু-শাসক হতে চাই। জনগণকে বোঝাতে চাই যে, আমি তাদেরই একজন। এলান দাও –
(অট্টহাসিতে রাজকুমারীর প্রবেশ)

রাজকুমারী ঃ আব্বাজান –

হবু ঃ কি হয়েছে শাহাজাদী গুলবাহার! তুমি এত প্রফুল্ল আজ। ভাবতেই আমার ভাল লাগছে।
রাজকুমারী ঃ এক অদ্ভুত কাণ্ড ঘটে গেছে আজ আব্বাহুজুর। গোপালভাড়ের দাওয়া খেয়ে আম্মিজানতো একদম সুস্থ।

হবু ঃ তাই নাকি !

রাজকুমারী ঃ শুধু কি তাই ! আম্মিজান কিছুক্ষণ আগে এত্তবড় একটা আস্তসুপারী মুখে পুরে যখন কামড় বসিয়েছে, তখন কি কাণ্ডটাই না ঘটল। দাঁতের চাপ সহ্য করতে না পেরে বাবা সুপারী গুলির মতো ছুটে গেল বাদী রহিমার দিকে। এক্কেবারে গিয়ে তার নাকের ডগায়। বাদীতো ভয়ে অজ্ঞান। উপস্থিত সবাইত হেসে খুন। আপনিই বলেন আব্বাহুজুর, এটাকি অদ্ভুত কাণ্ড না ?

হবু ঃ অদ্ভুত মানে ! তোমার কথা শুনে আমার মাঝেওতো হাসি সংক্রমিত হচ্ছে। (হাসি–বাকীরা কাঁদবে) একি ! তোমরা কাঁদছ কেন? বন্ধ কর রসিকতা।

পচু ঃ জানের মায়ায় কাঁদছি হুজুর। আপনিত এলান দিয়েছেন, কারো হাসির শব্দ পাওয়া মাত্রই তাকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মারবেন। তাই না হেসে কাঁদছি ।

গোপাল ঃ জাঁহাপনা, বেয়াদবী না নিলে একটা কথা বলতে চাই-তা হলো, এলান জারির পর রাজকুমারী ও আপনি হাসিতে লুটিপুটি খেয়েছেন। এই ক্ষেত্রে কি বিধান কার্যকর হবে?

রাজকুমারী ঃ ওরা এসব কি বলছে আব্বাজান (কাঁদবে)।

হবু ঃ কি সাংঘাতিক কথা। না-না, এই বিধান পাল্টাতে হবে। কান্না খুব খারাপ জিনিস্। এটা দুঃখ নিয়ে আসে। তোমরা সবাই হাসবে। বিধান উল্টিয়ে কান্নার বদলে হাসি জুড়ে দাও।

গবু ঃ জাঁহাপনা, এতেও কি কোন বিপত্তি হবার সম্ভাবনা রয়েছে? থাকুক, কান্নাকাটি আমারও ভাল লাগে না। এবার শুধু হাসব আর হাসব।
(নেপথ্যে রাণীর কান্নার শব্দ,রাণীর প্রবেশ)

রাণী ঃ আলমপনা। আজ আমার মন ভাল নেই। কতদিন ধরে মা বাবাকে দেখিনা। কাল রাতে স্বপ্নে দেখেছি মা আমার শোকে একদম তালপাতা হয়ে গেছে (আবার কান্না)।

রাজকুমারী ঃ আম্মিজান, আমি আপনার কান্না সহ্য করতে পারিনা – কান্না।

হবু ঃ তোমাদের কান্না দেখে আমারওতো কান্না আসছে।
(সবাই হসবে)

রাণী ঃ আমার এ শোকের সময় সবাই হাসাহাসি করছে কেন? এটা কি মগের মুল্লুক? যার যা খুশি তা-ই করবে। এই নাফরমানদের বিচার করার আগে পর্যন্ত আমি আপনার মুখ দর্শন করবো না। গুলবাহারকে নিয়ে আমি বাপের বাড়ি চললাম। (গুলবাহারের হাত ধরে টেনে নিয়ে যাবে)

রাজকুমারী ঃ আম্মিজান – আব্বাজান (প্রস্থান)

হবু ঃ শোন রাণী শোন। তুমি যেওনা। শোন। একি হলো আমার। আমার গড়া বিধানে আমিই বিদ্ধ হলাম। গবু , পচু, গোপাল – নতুন বিধান বের কর। বি-ধা-ন।

গবু ঃ কি বিধান বের করব, সেই বিধানইত পাচ্ছিনা হুজুর।

পচু ঃ আমাদের মাথায় যখন কিছু ঢুকছেনা তখন গোপালকে অনুরোধ করা যেতে পারে।

গোপাল ঃ আমার বিধানত আবার কঠিন হয়ে যায়, তাই বলছিলাম –

হবু ঃ কিচ্ছু বলতে হবেনা। তুমি শুধু বিধান বাতলে দাও। আমি জারি করে দেব। তোমার উপর আমার সে বিশ্বাস আছে।

গোপাল ঃ জাঁহাপনা, মাত্র একটা বিধানই আছে, যা এলান করে দিলে এত্ত সমস্যা হবে না।

হবু, গবু, পচু > মাত্র একটা বিধান !

গোপাল ঃ হ্যাঁ জাঁহাপনা। আমি ভেবে দেখলাম, দেশের মানুষ কাজ না করে কথা বলে বেশি। আর তাই আপনার কাছে নালিশও আসে বেশি। বুদ্ধি করে যদি কথা বলাটা বন্ধ করে দেয়া যায় তবেই কেল্লা ফতে।

হবু, গবু, পচু ঃ কথা বন্ধ করে দেব !
গোপাল ঃ ঠিক তেমন না। মানে কমন ভাষাটাকে বন্ধ করা গেলেই হলো।

হবু ঃ খুলে বল গোপাল, আমি কিছুই বুঝতে পারছিনা।

গোপাল ঃ খুব সহজ। ঐ যে আমাদের ভাষা – ইটা, বিটা, কিটা।

হবু ঃ নেটা, নুটা, হিটা।

গবু ঃ ঘুটা, মুটা, টুটা।

পচু ঃ হটা, হাটা, বিটা।

গোপাল ঃ এইতো হলো। আমরা মায়ের ভাষা বাংলাটাকে বন্ধ করে ‘কব্জি ভাষা’ চালু করবো। এতে বেশির ভাগ মানুষই এই ভাষায় কথা বলতে পারবেনা। যার ফলে আর এত্ত দরবার-শালিশও হবে না। এত্ত বিধানও দিতে হবে না।

হবু ঃ চমৎকার ! চমৎকার !

গবু ঃ গোপাল, তোমার বিধানের জন্য রাষ্ট্রীয় পুরস্কার পাওয়া উচিৎ।

পচু ঃ এতদিন পর গোপাল একটা ভাল বুদ্ধি দিয়েছ।

হবু ঃ তাহলে এই সিদ্ধান্ত হলো যে, আজ থেকে আমার রাজ্যে আর কেউ বাংলা ভাষায় কথা বলতে পারবে না। কথা যদি বলতে হয় তবে আমাদের কব্জি ভাষায় কথা বলতে হবে।
(দৌড়ে তিন প্রহরী মঞ্চের সামনে চলে আসবে)

প্রহরী ১ ঃ এবার কি হবে আমাদের। আমরা তো কব্জি ভাষা বুঝিনা।

প্রহরী ৩ ঃ আর বোধহয় আমাদের বাঁচা গেলোনা।

প্রহরী ২ ঃ দিন দিন রাজা মন্ত্রী আর নায়েবসহ গোপালের ভার বেড়েই চলেছে। তাদের খেয়াল খুশিমতো রাজ্য চালাচ্ছে। বাংলার মানুষ তাদের খেয়াল খুশির পুতুল। অবশেষে আমাদের মায়ের ভাষাটাও কেড়ে নিল।

প্রহরী ১ ঃ আমরা আর তাহলে মাকে ডাকতে পারবো না।

প্রহরী ৩ ঃ রাজা আমাদের মুখের ভাষাটাও কেড়ে নিল দুষ্ট গোপালের কথায়।

প্রহরী ২ ঃ কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলব। আমরা প্রজাতন্ত্রের আসল প্রহরী। আমাদেরও কিছু দায়-দায়িত্ব রয়েছে। সাধারণ প্রজাদের জন্য কিছু করার সময় এলো বুঝি। যাক, আপাতত প্রাণ বাঁচানোর জন্য একটা নতুন বুদ্ধি বের করেছি। রাজা যখন কব্জি ভাষায় কথা বলবে বা অন্য কোন প্রশ্ন করবে তখন আমরা বিদ্ঘুটে শব্দ করবো। রাজা বুঝতে না পেরে অবশ্যই বাংলা বলতে বাধ্য হবেন। তখই সব ব্যবস্থা করা যাবে। এখন চল দরবারে যাই।

হবু ঃ তাহলে শাহী এলান জারী করে দেই কেমন?

গোপাল ঃ নিশ্চয়ই।

হবু ঃ এলান দিয়ে দাও। (এলান)

হবু ঃ কচু মচু চচু।

গবু ঃ হারি মারি টারি।

পচু ঃ নিচু মিচু চিচু।

গোপাল ঃ গোল্লা মেল্লা চেল্লা।

হবু গবু পচু ঃ ডাডি মাডি বাডি।

হবু ঃ (প্রহরীদের দিকে চেয়ে) টিং টুং কুং।

প্রহরী ১ ঃ গ – র – র– র –

হবু ঃ ঝিং ঝাং নাং।

প্রহরী ২ ঃ ভট – ভট - ভট – ভটু ভট –

হবু ঃ বাটা মাটা ঘাটা।

প্রহরী ৩ ঃ ভুঁ – ভুঁ – ভুঁ – ভুঁ – ভুঁ –

হবু ঃ কি হচ্ছে এসব গবু পচু গোপাল? এই নালায়েকরা কি আমার কথা বুঝতে পারছে না?

গোপাল ঃ হিং চিং ফট।

হবু ঃ রাখ তোমার ফট। বাংলা বল।

গোপাল ঃ প্রহরীরা, তোমরা এসব কি বলছ?

প্রহরী ১ ঃ আমরা বিশুদ্ধ কব্জি ভাষা বলছি।

প্রহরী ২ ঃ আমাদের কাছে মনে হলো আপনাদের ভাষায় কোন গলদ আছে।

প্রহরী ৩ ঃ আমদেরত কোন ভুল হয় নাই জাঁহাপনা। বরং –
পচু ঃ কত বড় দুঃসাহস। বলে কিনা আমাদের ভাষা ভুল।

(বাইরে গোলযোগ – মিছিল, রাষ্ট্র ভাষা- বাংলা চাই। রাষ্ট্র ভাষা-বাংলা চাই। হবু রাজার কব্‌জি ভাষা- মানিনা, মানিনা)

গবু ঃ বাইরে এত গোলযোগ কেন?

পচু ঃ আমারতো ভয় করছে ক্যাশ বাক্সটা ছিনতাই হয় কিনা।
গোপাল ঃ মনে হয় বাংলা ভাষার দাবীতে প্রজারা বিদ্রোহ করেছে।

হবু ঃ বিদ্রোহ! প্রহরী –গোলন্দাজ বাহিনীকে বল বিদ্রোহ দমন করতে।

গোপাল ঃ ঠিক সিদ্ধান্ত। হবু রাজার নামে নিন্দা। শালাদের তোপের মুখে ফেলে দিন হুজুর। (আতংকিত প্রহরীদের প্রবেশ)

প্রহরী ১ ঃ হুজুর দুঃসংবাদ। বাংলা ভাষার দাবীতে মিছিলরত হাজার হাজার জনগণ হেরেমের দিকে ছুটে আসছে। ইতিমধ্যে গোলন্দাজ বাহিনীর হাতে পাঁচজন শহীদ হয়েছে।

হবু ঃ বল কি এসব ! হেরেমের দিকে ছুটে আসছে।

প্রহরী ২ ঃ শুধু তাই নয়, যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে প্রাসাদ গুড়িয়ে দিতে আসছে।

প্রহরী ৩ ঃ আমাদের সৈন্যদের চল্লিশগুণ বেশি মানুষ আক্রমন করতে আসছে রাজা বাহাদুর।

গবু ঃ হুজুর, একটা বিধান বের করেন অন্তত জনগণের হাতে মার খাবার আগে।

পচু ঃ (বাক্স হাতে নিয়ে) রাজা বাহাদুর, তাড়াতাড়ি বিধান দিন নয়ত ক্যাশ বাক্স নিয়ে আমি পালালাম।

হবু ঃ গোপাল, তোমার একমাত্র বিধান জারি করে আজ বুঝি প্রাণটা দিতে হলো। যদি পার শেষবারের মতো একটা বিধান দাও।

গোপাল ঃ বিধানত আছেই হাতে, মাত্র একটা এলান দিয়ে দিলেই দেখবেন কেমন করে সবাই যার যার মতো কেটে পড়ে।

হবু ঃ তা হলে দ্রন্নত বল বিধানটা কি।
গোপাল ঃ এখনি তাদের দাবী মেনে নিয়ে এলান দিয়ে দিন যে, প্রজাদের দাবীর প্রতি শ্রদ্ধা রেখে ‘কব্‌জি’ ভাষা বাতিল করে বাংলাকেই রাষ্ট্র ভাষা করা হলো।

পচু ঃ ঠিক ঠিক ঠিক।

গবু ঃ হ্যাঁ জাঁহাপনা, পিঠের চামড়া বাঁচাতে হলে এখনই এলান করুন। (এ-লা-ন)

হবু ঃ উহ্। কি একটা ফাড়া গেলো। এতক্ষণে শান্তি লাগছে।
গবু ঃ খুব আরাম লাগছে হুজুর। তবে গোপালের পরামর্শে একটা বিপদেই পড়েছিলাম।

পচু ঃ কিন্তু বাঁচালোতো এই গোপালই।

হবু ঃ ঠিক বলেছ। তা গোপাল, শেষবারের মতো এমন একটা বিধান বের কর যাতে আমাদের কথা কম বলা হবে কিন্তু কাজ করা হবে বেশি।

গোপাল ঃ তৈরী হয়ে আছে হুজুর। গোপালের এই বিধানটাই শেষ।

হবু পচু ঃ তা কি বিধান গোপাল?

গোপাল ঃ এটা হলো স্যাটেলাইটের যুগ। একটা রিমোট আর একটা টিপ। ব্যাস–সব শেষ। এই যে, প্রহরী, এলান জারী, গোলন্দাজ বাহিনী এসব কিছুই লাগবেনা। শুধু একটা টিপ।

হবু ঃ তার মানে?

গোপাল ঃ আমরা একটা স্যাটেলাইট টিভি চালু করবো। এই টিভি শুধু আমাদের মানে হবু রাজার ভাষণ দেখাবে লাইভ মানে সরাসরি। লক্ষ লক্ষ মানুষ দেখবে হবু রাজাকে। চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে সাড়ে তেইশ ঘন্টাই দেখাবে শুধু হবু রাজার মুখ। বাকী আধা ঘন্টা নাচ গান।

গবু পচু > আমাদের দেখাবে না?

গোপাল ঃ আরে, হবু রাজা মানেইত গবু মন্ত্রী, নায়েব পচু আর এই অধম গোপাল ভার।

হবু ঃ তোমার কথা শুনে আমার নাচতে ইচ্ছে করছে গোপাল।

গোপাল ঃ শুধু তাই নয়, এই টিভির নাম হবে রাজা বাহাদুরের নামের অদ্যাক্ষর দিয়ে।

গবু পচু ঃ আমাদের নামের অদ্যাক্ষর কি এর সাথে সংযুক্ত করা যাবে না।

গোপাল ঃ অবশ্যই যাবে। রাজা বাহাদুর যদি রাজী হন।

হবু ঃ আমি রাজি। শুধু গবু আর পচু কেন গোপালের নামের অদ্যাক্ষরও থাকবে এর সাথে।

গবু পচু গোপাল ঃ হবু রাজা কি জয়।

হবু ঃ তাহলে আমাদের টেলিভিশনের নাম কি দাঁড়ালো – হবুর ‘হ’ - গবুর ‘গ’- পচুর ‘চ’ু আর গোপালের ‘গো’। মানে হলো – “হগপগো”। চমৎকার আনকমন নাম। “হগপগো টেলিভিশন”।

গবু ঃ এই টিভির কোন শ্লোগান থাকবেনা ?

গোপাল ঃ অবশ্যই শ্লোগান থাকবে। “হগপগো টেলিভিষণ – কথা বলে হবু গবু পচু আর গোপালের”

পচু ঃ লা-জবাব। তা গোপাল, প্রহরীদের মুক্ত করার ব্যাপারে জানি কি বলছিলে?

গোপাল ঃ স্যাটেলাইটের মাধ্যমেই আমরা পারমানবিক বোমা ফিট করবো। যখনই বিপদ তখনই রাজা বাহাদুর রিমোট টিপবেন, ডাণ্ডি পটাশ। অন্য কোন মানুষের প্রয়োজন নেই- শুধুমাত্র রাজা বাহাদুর ছাড়া।

(প্রহরীদের প্রস্থান)

হবু ঃ আচ্ছা গোপাল, ঐ যে হগপগো টেলিভিষণ হবে – ঐটার আধা ঘন্টার যে নাচ-গান দেখানো হবে, সেই নাচ-গানে কি শাহাজাদী গুলবাহার আর তোমাদের রাণীমা নাচ-গান করতে পারবে না।

গবু ঃ কেন পারবেনা?

পচু ঃ তাহলেত ভালই হলো, হগপগো টেলিভিষণ চব্বিশ ঘন্টা আমাদেরই টেলিভিশন হবে।

হবু ঃ যা বলেছ পচু।

(জনগণ সাথে নিয়ে ১ ২ ৩ প্রহরীর প্রবেশ)

প্রহরী ২ ঃ প্রিয় রাজ্যবাসী, হবু চন্দ্রের রাজ সভার আমরা অতন্দ্র প্রহরী। তার অর্থ এই নয়, আজীবন অন্যায় আবদার মেনে নেব আমরা। প্রজাতন্ত্রের প্রহরী হিসাবে জনগণের পাশে অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে যথাসময়ে সাহায্য, সহযোগিতা ও বিশেষ অবস্থা জারি করাও আমাদের কর্তব্য।

প্রহরী ১ ঃ শুধু তাই নয়, জাতির এই ক্রান্তিলগ্নে হবু রাজার দুঃশাসন প্রতিরোধ ও আপনাদের নাগরিক অধিকার নিশ্চিত করাও আমাদের নৈতিক দায়িত্ব।

প্রহরী ৩ ঃ সবাই মনে করে আমরা হবু রাজা আর গবু মন্ত্রীর চাকর। কিন্তু না, আমরা জনগণের চাকর। চাকরিতে যোগদান করেছি কেবলমাত্র জনগণের সেবা করবো বলে।

প্রহরী ২ ঃ তাই আমরা আপনাদের সমর্থন নিয়ে এই পাগল হবু, ছাগল গবু, ভেড়া গোপাল আর গাধা পচুর দুর্নীতির অবসান ঘটাতে চাই। আপনারা কি বলেন?

জনগণ ঃ জয়। আমরাত হবু রাজার ভয়ে মুখ খুলতে পারিনা। আমরা শান্তিতে বাস করতে চাই। আমরা রাজার অত্যাচারে অতিষ্ট। আপনারা এর একটা বিহিত করলে প্রাণে বেঁচে যাই।

প্রহরী ১ ঃ কেউ নেই জাঁহাপনা। আপনার ডাকে কেউ আর সাড়া দিবেনা।

পচু ঃ এসব কি বলছে ওরা !

প্রহরী ৩ ঃ তুমি চুপ কর।

প্রহরী ২ ঃ জনগণের সাথে ফাঁকি। জনগণের অর্থ আত্মসাৎ আর ক্ষমতার অপব্যবহারের দায়ে আপনাদেরকে বন্দী করা হলো।

প্রহরী ২, প্রহরী ২ হবু গবু পচু ঃ কি? এত্ত বড় সাহস?

প্রহরী ১ প্রহরী ২ প্রহরী ৩ ঃ চুপ।

গোপাল ঃ ঠিক করেছ তোমরা। বাবা চণ্ডীদাসের কথার সাথে আমি একমত। চণ্ডীদাস কি জয়।

প্রহরী ২ ঃ তুমি ভেবেছ পার পেয়ে যাবে – তাইনা? তুমি শয়তানের গুড়ু, তোমারও বাঁচা নেই। দেশের এই ক্রান্তি লগ্নে বিশেষ আইনে তোমাদের বন্দী করা হলো।

হবু ঃ কি করছ এসব? আমাদের বন্দী করে কারাগারে পাঠালেতো সাংবিধানিক শূন্যতা সৃষ্টি হবে।

প্রহরী ১ ঃ সংবিধানের জন্য প্রজা নয়, প্রজার জন্য সংবিধান। আমরা এই বিশেষ সময়ে সুশীল সমাজ থেকে প্রতিনিধি নিয়ে শাসন কাজ চালাবো – যতদিন নতুন রাজা নির্বাচিত না হয়।

প্রহরী ৩ ঃ রাজা মশায়, এটা ভাববেন না যে অন্যান্য রাজ্যের মত আমরা ক্ষমতা দখল করতে এসেছি। আমরা দেশের অতন্দ্র প্রহরী। দেশকে আন্তঃশত্রু ও বহিঃশত্রুর হাত থেকে রক্ষা করাই আমাদের কাজ।

প্রহরী ২ ঃ খুলে ফেলুন মুকুট। পোষাক রেখে দিন সিংহাসনে। যতদিন আপনাদের শুদ্ধতা ফিরে না আসবে ততদিন আর রাজ্য চালানোর কথা মাথায়ও আনবেন না। আজ থেকে শুরু হলো নতুন পথ চলা।

নিজের মেধাবী জীবনের সোনালি ভবিষ্যতের রাঙ্গা প্রভাতকে দুমড়িয়ে মুচড়িয়ে মুখের ভাষা, মায়ের ভাষা রক্ষার জন্য আন্দোলনে ঝাপিয়ে পড়েছিলেন তিনি। তাঁর রয়েছে আরও একাধিক গর্বিত পরিচয়।

ভাষা সৈনিক আব্দুল গফুরের উপর একটি বিশেষ সাক্ষাৎকার*

১৯৪৫ সাল।ফরিদপুর থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় অংশ নিয়ে একজন ছাত্র বাংলা-আসামের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান লাভ করে এলাকাতে হৈ চৈ ফেলে দিয়েছিল।

১৯৪৭ সালে আই এ পাশ করে অত্যন্ত মেধাবী এই ছাত্রটি পরবর্তীতে “বাংলা ভাষা ও সাহিত্য” বিষয়ে অনার্সে ভর্তি হয়েছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। তিন বছরের অনার্স কোর্স শেষ করলেও চূড়ান্ত পরীক্ষা আর দেয়া হয়নি তাঁর। কারণ, তখন তিনি আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েছিলেন। যে আন্দোলনে তিনি জড়িয়ে পড়েছিলেন সেটি কোন প্রথাগত রাজনৈতিক কিংবা স্বাধীনতা আন্দোলন কিংবা কোন ছাত্র দাবী আদায়ের আন্দোলন নয়। বিশ্বে সম্পূর্ণ নতুন এক আন্দোলন ছিল সেটি। সেটি ছিল মুখের ভাষার অধিকার রক্ষার আন্দোলন। বাংলা ভাষা প্রতিষ্ঠার আন্দোলন। বৃটিশদের তাড়ানোর পরপরই আরেকটি অপশক্তি পাকিস্তানী চক্র আমাদের মুখের ভাষা, মায়ের ভাষা বাংলাকে চিরতরে স্তব্ধ করে দিতে চেয়েছিল। তারই বিরুদ্ধে আন্দোলনে তখন জড়িয়ে পড়েছিলেন তিনি।
তিনি ভাষা সৈনিক আব্দুল গফুর।

নিজের মেধাবী জীবনের সোনালি ভবিষ্যতের রাঙ্গা প্রভাতকে দুমড়িয়ে মুচড়িয়ে মুখের ভাষা, মায়ের ভাষা রক্ষার জন্য আন্দোলনে ঝাপিয়ে পড়েছিলেন তিনি। তাঁর রয়েছে আরও একাধিক গর্বিত পরিচয়। তিনি ভাষা আন্দোলনের উদ্‌গাতা প্রতিষ্ঠান

* সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করেছেন নাসীমুল বারী, শিক্ষার্থী, বাংলা বিভাগ, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ।

'তমদ্দুন মজলিশ' এর দীর্ঘকালীন সাধারণ সম্পাদক এবং বর্তমান সভাপতি। ভাষা আন্দোলনের নির্ভিক মুখপত্র 'সৈনিক' পত্রিকার সম্পাদক (প্রথমে সহকারী সম্পাদক)। ভাষা সৈনিক গড়ার নেপথ্য কারিগর আব্দুল গফুর। ভাষা আন্দোলনের জনক প্রিন্সিপ্যাল আবুল কাসেমের ঘনিষ্ঠ সহযোদ্ধাদের একজন তিনি। সৈয়দ নজরুল ইসলাম (বাংলাদেশের প্রথম ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি), অধ্যাপক এ কে এম আহসান, অধ্যাপক শাহেদ আলী, অলি আহাদ, সানাউল্লাহ নূরী, শামসুল আলম, ডক্টর নুরুল হক ভূইঁয়া প্রমুখের সাথে তিনিও ছিলেন ভাষাযুদ্ধের প্রথম সেনানিবাসের একজন। তাঁদের সেদিনকার অকুতোভয় যুদ্ধ আর ঐকান্তিক মনোবলে আজ আমরা বাংলাভাষাকে নিয়ে এত গর্ব করতে পারি। আফ্রিকাসহ বিশ্বের প্রায় সব প্রান্তেই আজ আমরা বাংলা ভাষাকে ছড়িয়ে দিতে পেরেছি। সেদিনের ভাষা আন্দোলনের চূড়ান্ত ফসলেই সৃষ্টি হয়েছে একুশ–একুশে ফেব্রুয়ারি; যা আজ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। এটি গর্ব আমাদের।

"বাংলাভাষা ও সাহিত্য" শিক্ষা ও বিকাশের ক্ষেত্রে যুগান্তকারী ভূমিকা রয়েছে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় "এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ"এর। "বাংলাভাষা ও সাহিত্যে" বাংলাদেশ তথা বিশ্বের বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের মধ্যে এখানেই প্রথম চালু করা হয় পূর্ণাঙ্গ অনার্স ও মাস্টার্স কোর্স। "এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ"এর এই উদ্যোগ আমাদের গর্ব। নতুন করে এই ইউনিভার্সিটি নিয়ে আমাদের আরও একটি গর্বের বিষয় হচ্ছে, এখান থেকে নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হতে যাচ্ছে "বাংলাভাষা ও সাহিত্য" বিষয়ক একটি "সাহিত্য পত্রিকা"। এই পত্রিকাটির প্রথম সংখ্যাতেই একজন ভাষা সৈনিকের সাক্ষাৎকার প্রকাশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। যার দায়িত্ব দেয়া হয় আমাকে। এ জন্য ধন্যবাদ কর্তৃপক্ষকে।

ভাষা সৈনিক আব্দুল গফুরের সাক্ষাৎকার গ্রহণের জন্য যখন আমি নিজেকে প্রস্তুত করছি তখন আমার স্মৃতিপটে ভেসে উঠেছিলেন ভাষা আন্দোলনের জনক প্রিন্সিপ্যাল আবুল কাসেম, তাঁর একান্ত সহযোদ্ধা সৈয়দ নজরুল ইসলাম (বাংলাদেশের প্রথম ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি), অধ্যাপক এ কে এম আহসান, অধ্যাপক শাহেদ আলী, অলি আহাদ, সানাউল্লাহ নূরী, শামসুল আলম, ডক্টর নুরুল হক ভূইঁয়া প্রমুখের ছবি। কিন্তু তাঁরা আজ আর আমাদের মাঝে নেই। চলে গেছেন। অনেক দূরে। আমাদের জন্য গৌরবময় অতীত উপহার দিয়ে। আমরা আজ অঙ্গীকারবদ্ধ, তাঁরা আমাদের যা

দিয়ে গেছেন তাঁদের অনেক ত্যাগের বিনিময়ে, আমরা তার মান বজায় রাখবো আমাদের জীবন দিয়ে।

আব্দুল গফুর বর্তমানে জাতীয় দৈনিক পত্রিকা " ইনকিলাব" এর ফিচার সম্পাদক পদে নিয়োজিত থেকে এখনও বাংলাভাষা ও সাহিত্যের সেবা করে যাচ্ছেন। তাঁর কাছে আমার প্রথম প্রশ্ন ছিল ঃ

ভাষা আন্দোলনে আপনাদের লক্ষ্যমাত্রা কি ছিল ?

আ ঃ গঃ ভাষা আন্দোলনের ঘোষিত লক্ষ্য ছিল তদানীন্তন পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে বাংলা ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠা। এ লক্ষ্যেই সেদিন দাবী তোলা হয়েছিল বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা, পূর্ব পাকিস্তানের অফিস-আদালতের ভাষা এবং শিক্ষার বাহন করা। তবে অঘোষিত লক্ষ্যের মধ্যে অবশ্যই ছিল লাহোর প্রস্তাবের মর্মবাণীর আলোকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় কাঠামো গড়ে তোলা। ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বরে 'তমদ্দুন মজলিশ' কর্তৃক প্রকাশিত ভাষা আন্দোলনের প্রথম পুস্তিকা "পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দূ?" এ লক্ষ্যেই নবগঠিত পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় কাঠামো সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে লাহোর প্রস্তাবের উল্লেখ করা হয়েছিল।

আব্দুল গফুরের জন্ম ১৯২৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। তদানীন্তন ফরিদপুর জেলার পাংশা থানার দাদপুর গ্রামে। আজ তিনি বয়সের ভারে ন্যূজ হলেও মনের দিক থেকে তরুণ। তাঁর কাছে আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন ঃ

বাংলাভাষা আন্দোলনে আপনারা সফল হয়েছেন, কিন্তু বাংলাভাষার সার্বজনীনতা কি সফল হয়েছে?

আ ঃ গঃ বাংলাভাষা আন্দোলন সফল হলেও ভাষা আন্দোলনের সর্বাঙ্গীণ সাফল্য যে আসেনি, এ এক করুণ সত্য। প্রথমত অফিস আদালতের অনেক স্তরে এখনও বাংলা ভাষার প্রচলন হয়নি। দ্বিতীয়ত এখনও বহু স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাভাষা শিক্ষার বাহন নয়। আর্ন্তজাতিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে ইংরেজী ভাষা ব্যবহারে আপত্তি থাকার কথা নয়। বৃহত্তর জনগোষ্ঠির ধর্মীয় ভাষা হিসেবে আরবী ভাষা শিক্ষাদানের একটা গুরুত্ব আছে। কিন্তু এসব কারণে বাংলাকে অফিস আদালতের ভাষা বা শিক্ষার বাহন করতে অসুবিধাটা কোথায়? এ এক সংকীর্ণতা ছাড়া আর কিছুই নয়। তা ছাড়া বাংলাভাষাকে আরো উন্নত ও সমৃদ্ধ করে তুলতে ইংরেজি, আরবিসহ বিভিন্ন বিদেশী ভাষার শ্রেষ্ঠ গবেষণাধর্মী, বিজ্ঞান, ধর্ম, দর্শন, সমাজবিজ্ঞান গ্রন্থসহ সৃজনশীল সাহিত্যগ্রন্থ অনুবাদ করার কোন বিকল্প নেই। এ সত্যটা আমরা খুব একটা গুরুত্ব দিচ্ছি বলে মনে হয় না। এ কারণে ভাষা

আন্দোলনের ঐতিহ্যবাহী দেশে বাংলা ভাষার চর্চা ও সমৃদ্ধি বাঞ্চিত ব্যাপকতা লাভ করতে পারেনি।

১৯৪৮ সালে ভাষা আন্দোলনের প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে তমুদ্দুন মজলিশ "সাপ্তাহিক সৈনিক" নামে পত্রিকা প্রকাশ করে। পত্রিকাটির প্রথম প্রকাশ হয় ১৪ নভেম্বর ১৯৪৮ সালে। সম্পাদক ছিলেন অধ্যাপক শাহেদ আলী। প্রথমদিকে আব্দুল গফুর তাতে সহকারী সম্পাদক হিসেবে যোগদান করেন। সৈনিকের পূর্বে তিনি জিন্দেগী পত্রিকাতেও কাজ করেছেন। তাঁর কাছে আমার তৃতীয় প্রশ্ন ছিল ঃ

"এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ"– বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের মধ্যে প্রথম 'বাংলাভাষা ও সাহিত্যে'র উপর পূর্ণাঙ্গ কোর্স চালু করে। 'বাংলাভাষা ও সাহিত্যে'র সাথে আপনার নিবিড় সম্পর্ক। এ ব্যাপারে আপনার মূল্যায়ন কি ?

আ ঃ গঃ বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের মধ্যে 'বাংলাভাষা ও সাহিত্যে'র উপর পূর্ণাঙ্গ কোর্স চালু করে "এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ" জাতির প্রতি এক ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করেছে। এ জন্যে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অভিনন্দন পাবার দাবীদার। এ উদ্যোগকে সার্থক করে তুলতে এখন তাদের সর্বাঙ্গ সুন্দর সিলেবাস প্রণয়নে হাত দিতে হবে। হিন্দু-মুসলিম উভয় জাতির সংস্কৃতি যার কবিতা ও গানে সমান সার্থকতার সাথে উঠে এসেছে, আমাদের সাহিত্যের শ্রেষ্ঠতম অসাম্প্রদায়িক রূপকার সাহিত্যক্ষেত্রে সাম্য-ভ্রাতৃত্বের আদর্শ ও স্বাধীনতা সংগ্রামের আপোষহীন কণ্ঠস্বর জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামকে অধ্যয়ন না করেও দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে "বাংলাভাষা ও সাহিত্য" বিষয়ে মাস্টার্স ডিগ্রীর সিলেবাস প্রণয়নের লজ্জা থেকে জাতিকে রক্ষা করতে পারে "এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ" এর মাস্টার্স ডিগ্রীর সিলেবাস। এ বিষয়টি জাতির জন্য যেমন ভাল দিক তেমনি অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য অনুকরণীয় হিসেবে কাজ করতে পারে।

১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি গুলিবর্ষণের উপর আব্দুল গফুরের সম্পাদনায় 'সৈনিক' বিশেষ সংখ্যা জনমনে বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিল। সংখ্যাটি বের হয়েছিল ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২। তৎকালীন সরকার এতে ভীষণ ক্ষুব্ধ হয়েছিল। রাতে হামলা চালিয়েছিল ভাষা আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র ও সৈনিক অফিস ১৯' আজিমপুর রোডে। প্রিন্সিপ্যাল আবুল কাশেম ও আব্দুল গফুর পেছনের দেয়াল টপকে পালিয়ে ঢাকা, ময়মনসিংহ ও কুষ্টিয়ায় মাসাধিককাল আত্মগোপন করেছিলেন। সেই অকুতোভয় ভাষা সৈনিক আব্দুল গফুরের কাছে আমার চতুর্থ প্রশ্নঃ

"প্রথম কাতারের ভাষাযোদ্ধা, নাকি লেখক সম্পাদক হিসেবে প্রথম কাতারের ভাষাসেবক"– কোনটাকে অগ্রাধিকার দেবেন আপনি আজ?

আ ঃ গঃ বাংলাভাষা ও সাহিত্যের একজন ভক্ত হিসেবে আমি এ দু'টোর মধ্যে কোন সংঘাত বা অগ্রাধিকার রয়েছে বলে মনে করি না।

তিনি ১৯৫৬ সালে পুনরায় জগন্নাথ কলেজে (বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়) নৈশ বিভাগে বি এ ভর্তি হয়ে ১৯৫৮ সালে পাশ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম এ ক্লাশে ভর্তি হন ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যে। একই সময়ে সহ-সম্পাদক হিসেবে যোগ দেন "মিল্লাত" পত্রিকায়। এ সময় কিছুদিন 'নাজাত' পত্রিকারও সহ-সম্পাদক ছিলেন তিনি। তাঁর কাছে পঞ্চম প্রশ্ন ঃ

বর্তমানে যে বিপুল সাহিত্য (উপন্যাস, গল্প, নাটক) রচিত এবং প্রকাশিত হচ্ছে তা সমাজ গঠনে কতটুকু ভূমিকা রাখছে বলে আপনি মনে করেন।

আ ঃ গঃ শিল্প সাহিত্য যে কোন জাতির জাগরণে বিরাট ভূমিকা পালন করতে পারে। সাহিত্যের মধ্যে আবার কথাসাহিত্যের কদর থাকে ছেলে, বুড়ো, নারী, পুরুষ সবার কাছে। গল্পে সংক্ষিপ্ত পরিসরে জীবনের খণ্ডচিত্র প্রকাশ পায়। আর উপন্যাসের বৃহত্তর ক্যানভাসে সমাজ জীবনের প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠে। সমাজ পরিবর্তনে ও সুস্থ সমাজ গঠনে সাহিত্য বিরাট অবদান রাখতে পারে যদি পাঠক মনে কাঙ্খিত আবেদন সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। এই কাঙ্খিত আবেদন সৃষ্টি নির্ভর করে সমাজ জীবনের বিভিন্ন ত্রুটি-বিচ্যুতি ও স্ব-বিরোধিতার সঠিক সনাক্তকরণে। এবং তার নান্দনিক চিত্রণে সংশ্লিষ্ট লেখকের মুন্সিয়ানার উপর। বর্তমানে আমাদের দেশে প্রচুর গল্প, উপন্যাস, নাটক রচিত ও প্রকাশিত হলেও তা সমাজ গঠনে সঠিক ভূমিকা রাখতে পারছে না প্রধানত সংশ্লিষ্ট সাহিত্যিকদের দৃষ্টিভঙ্গিগত সীমাবদ্ধতার কারণে।

আমাদের দেশে প্রতিভাশালী কথা সাহিত্যিক নেই তা নয়। কিন্তু সামাজিক অঙ্গীকার ও মহৎ জীবনবোধের অভাবে প্রতিভাশালী কথা সাহিত্যিকদের সৃষ্টি সম্ভারও সুস্থ সমাজ গঠনে ভূমিকা পালনে কিভাবে ব্যর্থ হয়, তার একান্ত প্রমাণ রয়েছে আমাদের দেশে। "জীবনের জন্য শিল্প ও সমাজ পরিবর্তনের জন্য শিল্প"– এ দর্শনের পরিবর্তে আমাদের প্রতিভাশালী কথাসাহিত্যিকগণ চালিত হচ্ছেন 'আর্টস ফর আর্টস' তথা আনন্দের জন্য শিল্প ও সাহিত্য এই দর্শনের দ্বারা। ফলে তারা সস্তা পাঠক প্রিয়তা পাচ্ছেন প্রচুর, অর্থও আয় করছেন প্রচুর, কিন্তু সমাজ পরিবর্তনে কোন ভূমিকাই রাখতে পারছেন না অধিকাংশ কথাশিল্পী। অল্প কয়েকজন ব্যতিক্রম বাদ দিলে আমাদের অধিকাংশ কথাসাহিত্যিকদের গল্প-উপন্যাসে শহুরে মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত সমাজের চিত্রই ফুটে উঠে। এদের গল্প-উপন্যাসে গ্রামীণ সমাজের কৃষক, তাতী, জেলে, ক্ষেতমজুর এবং শহরের নিম্ন-মধ্যবিত্ত ও বিত্তহীন বস্তিবাসী, ফুটপাত বাসীদের জীবনের হাসি-কান্না, আনন্দ-বেদনার চিত্র অনিবার্য্য ভাবেই অনুপস্থিত থাকে। অথচ এরাই দেশের জনসংখ্যার পঁচাশি ভাগ। এই যে সমাজের বৃহত্তর জনগোষ্ঠির আনন্দ-বেদনা, বোধ-বিশ্বাস ও জীবন সংগ্রাম বিবর্জিত সাহিত্য তার

পক্ষে সুস্থ সমাজ গঠন বা সমাজ পরিবর্তনের লক্ষ্যে পাঠক মনে কাঙ্খিত আবেদন সৃষ্টিতে সক্ষম হবার কথা নয়।

আমাদের কথাশিল্পীদের সৃষ্ট সাহিত্যে আমাদের ২১৪ বছরের গৌরবজনক স্বাধীনতা সংগ্রাম খুব কমই চিত্রিত হয়েছে। এর কারণ সঠিক ইতিহাস চেতনার অভাব। যেন পলাশীর পর একাত্তুরের আগে আর কোন ঘটনাই ঘটেনি এদেশে। একাত্তুরের মুক্তিযুদ্ধ অবশ্যই অনেক বড় মানের চূড়ান্ত ঘটনা। কিন্তু একাত্তুর যে ভূখণ্ডটিকে স্বাধীন বাংলাদেশে পরিচিত করে তুলেছে, সে ভূখণ্ডটি কি এভাবেই ছিল ১৯৫৭ সালে? নিশ্চয়ই না। কিভাবে, কবে, কোন ঘটনার মাধ্যমে অখণ্ড ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করে পূর্ববঙ্গকে প্রদেশে পরিণত করা হয়েছিল, তার জন্যও প্রচুর সংগ্রাম করতে হয়েছিল আমাদের পূর্বসূরীদের। সে সংগ্রামের কথা আমাদের কথাসাহিত্যে নেই। অথচ ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, পলাশীর পর দীর্ঘ একুশ বছর প্রধানত মুসলমানরাই সশস্ত্র সংগ্রাম চালায় ইংরেজদের হাত থেকে স্বাধীনতা ফিরে পাবার লক্ষ্যে। ১৮৫৭ থেকে ১৯১১ পর্যন্ত এই ৬৮ বছর মাত্র আমাদের পূর্বসূরীরা ইংরেজ সরকারের সাথে সহযোগিতা করেছিল জ্ঞান-বিজ্ঞানে নিজেদেরকে পারদর্শী করে তোলার প্রয়োজনে। ১৯০৫ সালে প্রশাসনিক কারণে বঙ্গভঙ্গের ফলে পূর্ববঙ্গ ও আসাম নামের স্বতন্ত্র প্রদেশ সৃষ্ট হওয়ায় দীর্ঘ অবহেলিত পূর্ববঙ্গের উন্নতির কিঞ্চিত সম্ভাবনা দেখা দেয়ায় পূর্ববঙ্গের কলকাতামুখী জমিদাররা জমিদারীতে তাদের প্রভাব হ্রাসের আশংকায় ১৪৮ বছর পর সর্বপ্রথম ইংরেজদের বিরুদ্ধে বঙ্গমাতা ব্যবচ্ছেদের নামে আন্দোলন শুরু করে দেয়। তাদের বিশৃংখল সংগ্রামে মাত্র ৬ বছরের মাথায় বৃটিশ সরকার বঙ্গভঙ্গ রদ সম্পন্ন করলে "জনগণ মন অধিনায়ক জয় হে ভাগ্য বিধাতা" বলে সম্রাট পঞ্চম জর্জের স্তুতিবাদে উন্মত্ত হয়ে উঠে প্রতিবেশী সম্প্রদায়ের লোকেরা। বঙ্গভঙ্গের ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে তাদের মায়াকান্না যে আসলে ছিল কুম্ভিরাশ্রম তার প্রমাণ মিলল তিন দশক পরে ১৯৪৭ সালে, যখন তাদের উত্তরসূরীরা ঘোষণা করল ভারত ভাগ না হলেও বাংলা ভাগ হতেই হবে।

বঙ্গভঙ্গ রদের পর একটি পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা, বেঙ্গল এক্টের বিরোধিতা প্রভৃতি ঘটনার পরই ১৯৪০ সালের ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের মাধ্যমে প্রথমবারের মতো বাংলাদেশের আজকের স্বাধীনতার রূপরেখা আমরা লাভ করি। এই লাহোর প্রস্তাবের একাংশ সাতচল্লিশে নিয়মতান্ত্রিক পথে বাকী অংশ একাত্তুরের স্বাধীনতা সংগ্রামের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের রয়েছে সুদীর্ঘ গৌরবময় ইতিহাস।

আমাদের কথাসাহিত্যে আমাদের স্বাধীনতা সংগামের সে ইতিহাস কমই চিত্রিত হয়েছে। শুধু তাই নয়, স্বাধীনতার পর ফারাক্কা বাঁধ, বঙ্গভূমি চক্রান্ত, নব্য ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি রূপী সাম্রাজ্যবাদী মদদপুষ্ট এন জি ও নেটওয়ার্ক, প্রাকৃতিক সম্পদ

তেল-গ্যাসের উপর বিদেশী নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্যবাদী চক্রান্তের মাধ্যমে আমাদের স্বাধীন রাষ্ট্রস্বত্তাকে যে পঙ্গু অর্থহীন করে তোলার চক্রান্ত সুপরিকল্পিতভাবে এগিয়ে চলেছে তার চিত্র কতটা ফুটে উঠেছে আমাদের কথাসাহিত্যে? কথাসাহিত্যের পাশাপাশি আমাদের নাটক ও চলচ্চিত্রেও স্বাধীনতা সংগ্রামের সঠিক চিত্র যেমন অনুপস্থিত, তেমনি অনুপস্থিত স্বাধীন রাষ্ট্রস্বত্তা পঙ্গু ও অর্থহীন করে তোলার সুপরিকল্পিত চক্রান্তের চিত্র।

'ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যে' ভর্তি হয়েও বছরখানেক পড়াশুনা করার পর আব্দুল গফুরের আর এ বিষয়ে পড়াশুনা শেষ করা হয় নি। পরে ১৯৬২ সালে সমাজ কল্যাণে এম এ পাশ করেন। তাঁর কাছে ষষ্ঠ প্রশ্ন ঃ

ভাষা আন্দোলন বলতে বর্তমান প্রজন্ম পাঠ্যপুস্তক থেকে শুরু করে সর্বত্রই জেনে আসছে ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারিকে। এটি তো ভাষা আন্দোলনের পূর্ণাঙ্গ এবং প্রকৃত রূপ নয়–চূড়ান্ত ফল মাত্র। নতুন প্রজন্মকে ভাষা আন্দোলনের সঠিক ইতিহাস জানানোর দায়িত্ব কার? তাতে আপনাদের ভূমিকা কি ?

আ ঃ গঃ; ভাষা আন্দোলনের সূচনা সাতচল্লিশে, আটচল্লিশের ১১ই মার্চ তার প্রথম বিস্ফোরণ আর চূড়ান্ত বিস্ফোরণ ঘটে বায়ান্নর একুশে ফেব্রুয়ারি। ভাষা আন্দোলনের সঠিক ইতিহাস নতুন প্রজন্মকে জানানোর দায়িত্ব বাংলাদেশ সরকারের সাংস্কৃতিক মন্ত্রণালয়ের, বিশেষত বাংলা একাডেমীর। মন্ত্রণালয় যদি তার দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতার পরিচয় দেয়, দুঃখ প্রকাশ ছাড়া আমাদের আর কিইবা করার রয়েছে। আমরা আমাদের সীমিত সামর্থের মধ্যে ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস তুলে ধরার চেষ্টা করছি।

এম এ পাশ করে 'সোস্যাল ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজার' হিসেবে চট্টগ্রামে একবছর চাকুরী করেন আব্দুল গফুর। ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজেও অধ্যাপনা করেছেন কিছুদিন। এরপর ঢাকার আবুজর গিফারী কলেজের সমাজকল্যাণ বিভাগের প্রধান অধ্যাপক হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন তিনি। তাঁকে সপ্তম প্রশ্ন করি ঃ

এ শতকে বাংলাভাষা ও সাহিত্যের উত্তরণের প্রধান মৌলিক দিক কোনটি আপনার দৃষ্টিতে?

আ ঃ গঃ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে তুলতে সাধকের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। শিল্প সাহিত্যের সমস্তসৃষ্টি, ইতিহাস, গবেষণা, অন্যান্য ভাষার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থাদির বাংলা অনুবাদ, স্বাধীনতা সংগ্রামের সঠিক ইতিহাস, গণমানুষের জীবন সংগ্রামভিত্তিক গল্প-উপন্যাস, কাব্য, নাটক, সংগীত, চলচ্চিত্র সৃষ্টি মোটকথা শিল্প-সাহিত্যের প্রতিটি শাখায় জীবনমুখী সৃষ্টি, মননশীল প্রবন্ধ, জাতীয় বীরদের

জীবনচরিত রচনা, শিশুতোষ সাহিত্য, শিক্ষার সকল স্তরে, সকল বিভাগে মাতৃভাষায় পাঠদানের উপযোগী উচ্চমানের পাঠ্যপুস্তক রচনা এবং সৃজনশীল শিল্প-সাহিত্য সৃষ্টির ব্যাপারে উৎসাহদানের লক্ষ্যে পুরস্কার দানের সুচিন্তিত পদক্ষেপ নিতে হবে। মনে রাখতে হবে, সমাজের কাছে আমাদের প্রত্যেকের অশেষ ঋণ রয়েছে। যাদের মধ্যে বিধাতা শিল্প-সাহিত্যের প্রতিভা দিয়েছেন। সমাজকে এগিয়ে নেয়ার লক্ষ্যে তাদের শিল্প-সাহিত্য সৃষ্টির সাধনার মাধ্যমে সমাজের প্রতি কাজ পরিশোধের পথে অগ্রসর হ'তে হবে।

অতঃপর তিনি ইসলামিক ফাউণ্ডেশনে উর্ধতন কর্মকর্তা হিসেবে চাকুরী করেন দীর্ঘ সময়। অবসর গ্রহণ শেষেও এ ভাষাকর্মী বসে থাকেন নি। জড়িয়ে পড়েন সংবাদপত্রের সাথে আবার নতুন করে। বর্তমানে তিনি জাতীয় দৈনিক পত্রিকা ইনকিলাবের ফিচার সম্পাদক। তাঁকে আমি অষ্টম প্রশ্ন করি ঃ

আপনি প্রথম কাতারের একজন ভাষা সৈনিক ; অথচ এ প্রজন্মের অনেকেই আপনাকে চেনেনা। কেন আপনারা নিজেদেরকে দূরে সরিয়ে রেখেছেন? – এ প্রজন্মকে এ ব্যাপারে কিছু বলুন।

আ ঃ গঃ ভাষা আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলাম বিবেকের তাগিদে, খ্যাতি লাভের জন্য নয়। নিজেকে আমি দূরে সরিয়েও রাখিনি আবার আগ বাড়িয়ে খ্যাতি লাভের আকাঙ্খায় আত্মপ্রচার চালানোর পক্ষপাতিও আমি নই। মানুষ হিসেবে জীবনে বহু ভুল-ভ্রান্তি করেছি, জীবন সায়াহ্নে এসে সবার কাছে শুধু একটু দোয়াই চাই, অতীতের সকল ভুল-ত্রুটির জন্য আল্লাহর ক্ষমা লাভে যেন ধন্য হই এবং বাকী জীবনটা যাতে সঠিক পথে চলতে পারি।

ভাষা আন্দোলনের উদগাতা প্রতিষ্ঠান 'তমদ্দুন মজলিশ' এর সাথে শুরু থেকেই জড়িত ছিলেন অধ্যাপক আব্দুল গফুর। এবং তিনি এর বর্তমান সভাপতি। আগেই বলেছি বয়সের ভারে ন্যুব্জ হলেও মনের দিক থেকে এখনও তিনি তরুণ। তাঁর সাথে কথা বললে মনে হয়, তিনি যেন ১৯৪৮ সালের তারুণ্যের একজন হলেও এখনও সে সময়ের আবেগ এসে ভর করে তার মনে। এ যেন সময়ের মোহে আটকে থাকা ইচ্ছাগুলো। তাঁর কাছে আমার শেষ প্রশ্ন ছিল ঃ

এ প্রজন্মের বাংলাভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষার্থীদের প্রতি আপনার পরামর্শ ও উপদেশ কি?

আ ঃ গঃ এ প্রজন্মের বাংলাভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষার্থীদের প্রতি আমার আহ্বান তোমরা কখনো তোমাদের পঠন-পাঠন সিলেবাসের সংকীর্ণ গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ রাখবে না। পরীক্ষায় ভাল রেজাল্টের জন্য সিলেবাসের বিষয়বস্তুকে অবশ্যই বিশেষভাবে

গুরুত্ব দিতে হবে। ডিগ্রীর জন্য সিলেবাস অনুসরণের বাইরে বৃহত্তর জীবনে সিলেবাসের প্রয়োজনও মোটেও কম নয়। তাছাড়া, বাংলাভাষা ও সাহিত্যে ব্যুৎপত্তি অর্জনের জন্য বিভিন্ন বিদেশী ভাষার বিশেষতঃ ইংরেজি ভাষার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থাদি পাঠেরও বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে এবং সে বিষয়ে গুরুত্ব দিবে।

ওরা জানতে পারে ঢাকার উত্তরায় অবস্থিত "এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ"-এ রয়েছে তাদের স্বপ্ন পুরণের সুযোগ। বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের মধ্যে একমাত্র এখানেই রয়েছে বাংলাভাষা ও সাহিত্যের উপর পূর্ণাঙ্গ কোর্স। যা তারা চাকরী করেও সম্পন্ন করতে পারবে। কারণ, সাপ্তাহিক ছুটির দু'দিনই শুধু এখানে ক্লাশ হয় বাংলা বিভাগের।

এম আর সুমন*

আমাদের এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ

মফস্বল শহরের মধ্যবিত্ত দুই পরিবারের ছাত্র অপু ও দীপু। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাশ করেছে নিজ শহরের একটি কলেজ থেকে। বাড়িতে থেকেই পড়াশুনা করেছে ওরা। অপু ও দীপু দু'জনেরই ইচ্ছে এবার কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী হবে ওরা। ওরা দু'জনেই স্কুল জীবন থেকেই বিভিন্ন পত্রিকা ও সাময়িকীতে লেখালেখি করে। লেখার হাত ভাল ওদের। তাছাড়া, বাংলাভাষা ও সাহিত্যের উপরও বিশেষ আকর্ষণ রয়েছে ওদের। ওদের দু'জনেরই ইচ্ছে এর উপরই উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করবে ওরা। কিন্তু পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মিত শিক্ষার্থী হওয়া কোনক্রমেই ওদের পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ, পারিবারিক আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে দু'জনকেই একটি এন জি ও তে চাকরী করতে হচ্ছে। মোটামুটি সব বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে খোঁজ নিয়ে জানতে পারে যে, বাংলাভাষা ও সাহিত্যের উপর কোথাও অনার্স-মাস্টার্সসহ পূর্ণাঙ্গ কোর্স চালু নেই। মন ভেঙ্গে যায় ওদের। রাগ হয় ভীষণ বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের উপর। ওরা ভেবে পায় না, বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলো কেন আমাদের এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিকে বাদ দিয়েছে। ওদের ধারণা, একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম লক্ষ্য হবে সে দেশের মূলবিষয় অর্থাৎ ভাষা ও সংস্কৃতি সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর উচ্চশিক্ষা গ্রহণের সুযোগ তৈরী করা। তারপর এর পাশাপাশি অন্যসব

* শিক্ষার্থী, বাংলা বিভাগ, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ।

বিভিন্ন বিষয় চালু করা। অবশেষে হঠাৎ একদিন মুখে হাসি ফুটে ওদের। ঢাকায় অবস্থানরত এক বড় ভাইয়ের মাধ্যমে ওরা জানতে পারে ঢাকার উত্তরায় অবস্থিত "এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ"-এ রয়েছে তাদের স্বপ্ন পুরণের সুযোগ। বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের মধ্যে একমাত্র এখানেই রয়েছে বাংলাভাষা ও সাহিত্যের উপর পূর্ণাঙ্গ কোর্স। যা তারা চাকরী করেও সম্পন্ন করতে পারবে। কারণ, সাপ্তাহিক ছুটির দু'দিনই শুধু এখানে ক্লাশ হয় বাংলা বিভাগের। এখানে বাজারমুখী বিভিন্ন বিষয়ের পাশাপাশি শিক্ষা ও সংস্কৃতি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ের উপরও পূর্ণাঙ্গ কোর্স চালু রয়েছে। এবং এসব বিষয়েরও ক্লাশ হয় সাপ্তাহিক ছুটির দু'দিন। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের এমন সাহসিকতাপূর্ণ পদক্ষেপে মন ভরে যায় ওদের।

দু'বন্ধু ছুটে আসে "এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ"এর ক্যাম্পাসে খোঁজ খবর নেয়ার উদ্দেশ্যে। ক্যাম্পাসের বিশ্ববিদ্যালয়সুলভ পরিবেশ দেখে মুগ্ধ হয় তারা। যেখানে ঢাকা শহরের অন্য বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় সমূহ অভিজাত মার্কেটের মধ্যে অবস্থিত যা বাইরে থেকে বুঝা যায়না এটি কি মার্কেট নাকি বিশ্ববিদ্যালয়। একই ভবনে শিক্ষা এবং একাডেমিক কার্যক্রম দুই-ই সম্পন্ন হয়ে থাকে। এ ক্ষেত্রে এশিয়ান ইউনিভার্সিটি ব্যতিক্রম। এখানে প্রত্যেক বিভাগের ক্লাশ আলাদা আলাদা ভবনে এবং একাডেমিক কাজকর্মও সম্পূর্ণ আলাদা ভবনে সম্পন্ন হয়ে থাকে। মাননীয় উপাচার্যের অফিসও সম্পূর্ণ আলাদা ভবনে অবস্থিত। শিক্ষার খরচও তুলনামূলকভাবে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ে খুবই কম। স্বপ্ন পুরণের বাসনা নিয়ে দু'বন্ধু ভর্তি হয় এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশে।

মানসম্মত শিক্ষা ও নৈতিকতাবোধ সম্পন্ন চরিত্র গঠনের উদ্দেশ্যে এবং দেশের অধিকাংশ জনগোষ্ঠিকে উচ্চশিক্ষার আওতায় আনার লক্ষ্যে ১৯৯৬ সালের ৪ই জানুয়ারী বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের অনুমোদনক্রমে যাত্রা শুরু করে "এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ"। এবং একই বছরের সেপ্টেম্বর মাসে মাত্র ২৯৫ জন শিক্ষার্থী নিয়ে এর শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করা হয়। গত বছরে (২০০৮ সাল) এ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার একযুগ পূর্তি উৎসব পালন করা হয়। আর মাত্র এই একযুগের ব্যবধানে যার শিক্ষার্থী সংখ্যা প্রায় পনের হাজারের অধিক। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এখানে বাজারমুখী (বিবিএ, এমবিএ ইত্যাদি) বিষয়ের পাশাপাশি আমাদের শিক্ষা ও সংস্কৃতি (বাংলা, সমাজবিজ্ঞান ইত্যাদি) সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ের উপরও পড়ানো হয়ে থাকে। যা বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের মধ্যে এক ব্যতিক্রম দৃষ্টান্ত। সুযোগ রয়েছে চাকুরীজীবী, ব্রেক অব স্টাডি এবং গৃহ-সংসারের কাজকর্ম করেও উচ্চশিক্ষা গ্রহণের।

দেশের ৫১টি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট শিক্ষার্থীর প্রায় এক-দশমাংশ অধ্যয়ন করছে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে। এখানে টিউশন ফি কম হওয়ায় এবং তা মধ্যবিত্তদের নাগালের ভিতরে থাকায় মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তানদের উচ্চশিক্ষা লাভের আদর্শ প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিগণিত আজ "এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ"। এখান থেকে পড়াশোনা শেষ করে এ পর্যন্ত বহু শিক্ষার্থী দেশে এবং বিদেশে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাফল্যের সাথে কৃতিত্ব স্থাপন করে দেশ ও জাতির কল্যাণে নিয়োজিত রয়েছে।

এশিয়ান ইউনিভার্সিটির বর্তমানে উপাচার্যের দায়িত্বে রয়েছেন ড. আবুল হাসান মুহাম্মদ সাদেক। তিনি মালয়েশিয়ার ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটির সাবেক ডীন ছিলেন। শিক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য তিনি কেমব্রীজের

ইন্টারন্যাশনাল বায়োগ্রাফিক সেন্টার কর্তৃক “ওহঃবৎহধঃরড়হধষ সধহ ড়ভ ঃযব ুবধৎ ২০০০-২০০১চ সম্মাননায় ভূষিত হয়েছিলেন। মানসম্মত ও নৈতিকতাবোধ সম্পন্ন শিক্ষা প্রদানের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সর্বদা সচেষ্ট। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ শিক্ষকই পূর্ণকালীন এবং নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকগণ বেশিরভাগই দেশ ও বিদেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে উচ্চতর ডিগ্রীধারী এবং মেধাস্থান অধিকারী। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী ক্যাম্পাস নির্মাণ করা হবে বলে ইতোমধ্যেই ব্যাপক আশার বাণী ছড়িয়ে পড়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী ক্যাম্পাস নির্মাণ সম্পর্কে মাননীয় উপাচার্যের অভিমত জানতে চাইলে তিনি বলেন, এই উদ্দেশ্যে আশুলিয়া মডেল টাউন এলাকায় ইতোমধ্যে ১৫ একর জমি ক্রয় করা হয়েছে। এই জমিতে প্রয়োজনীয় একাডেমিক, প্রশাসনিক এবং আবাসিক ভবন নির্মাণের জন্য মাস্টার প্ল্যান প্রণয়নের কাজ প্রক্রিয়াধীন। এখানে শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের আবাসিক সু-ব্যবস্থা থাকবে।

রাজনীতি ও সেশনজটমুক্ত এই বিশ্ববিদ্যালয়ে বছরে তিনটি সেমিস্টারে শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়ে থাকে। স্প্রিং সেমিস্টার (জানুয়ারী–এপ্রিল), সামার সেমিস্টার (মে–আগস্ট) এবং ফল সেমিস্টার (সেপ্টেম্বর–ডিসেম্বর)। আন্ডার গ্রেজুয়েট পর্যায়ে যে বিষয়গুলো এখানে পড়ানো হয় সে বিষয়গুলো হচ্ছে, বি বি এ, বি এস সি (ইঞ্জিঃ) ইন কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ার, বি এস সি (অনার্স) ইন কম্পিউটার সায়েন্স, বি এ (অনার্স) ইন ইংরেজী, বি এ (অনার্স) ইন বাংলা, বিএ (অনার্স) ইন ইসলামিক স্টাডিজ, বি এ (অনার্স) ইন ইসলামের ইতিহাস ও সভ্যতা, বি এস এস (অনার্স) ইন অর্থনীতি, বি এস এস (অনার্স) ইন সমাজ বিজ্ঞান, নৃবিজ্ঞান, বি এড। গ্র্যাজুয়েট পর্যায়ে রয়েছে এম বি এ, এম এ ইন বাংলা, এম এ ইন ইসলামিক স্টাডিজ, এম এ ইন ইসলামের ইতিহাস ও সভ্যতা, এম এ ইন ইংরেজী, এম এস এস ইন অর্থনীতি,এম এস এস ইন সমাজ বিজ্ঞান ও নৃবিজ্ঞান, এম এস এস ইন সরকার ও রাজনীতি, এম এস এস ইন তথ্যবিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা এবং এম এড।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত এবং বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক স্বীকৃত। ফলে এখান থেকে অর্জিত ডিগ্রী সকল সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে চাকুরীর ক্ষেত্রে স্বীকৃত এবং উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য। সুইজারল্যান্ডভিত্তিক আন্তর্জাতিক সংস্থা অচওঈঝ কর্তৃক পূর্ণভাবে স্বীকৃত আমাদের এই বিশ্ববিদ্যালয়। বিদেশেও স্বীকৃত এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী। সুতরাং এখান থেকে ডিগ্রী নিয়ে অনেক শিক্ষার্থী বিদেশে উচ্চ শিক্ষা নিচ্ছে এবং চাকুরী করছে। বিশ্বের নামকরা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সমঝোতা চুক্তিও রয়েছে এই

বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে। তন্মধ্যে আছে যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া, মালয়েশিয়া, জর্দান, ইরান ইত্যাদি।

এশিয়ান ইউনিভার্সিটিতে মেধাবী ও গরীব শিক্ষার্থীদের পুরস্কার ও আর্থিক সহায়তা প্রদানের নানান সুবিধা রয়েছে। যেমন, চ্যান্সেলর পুরস্কার; ভাইস চ্যান্সেলর পুরস্কার; ভাইস চ্যান্সেলর লিসট পুরস্কার; ডিনস লিসট পুরস্কার; গরীব ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের বেতন মওকুপের ব্যবস্থা; শিক্ষা সহযোগী কার্যক্রমে বিজয়ীদের জন্য বৃত্তি এবং বেতন মওকুপের ব্যবস্থাপনা; বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রতিযোগিতা মূলকভাবে কয়েকটি বৃত্তি এবং আর্থিক সুবিধার ব্যবস্থাও রয়েছে এখানে।

এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশের রয়েছে একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ পাঠাগার। যেখানে গ্রন্থের সংখ্যা প্রায় লক্ষাধিক। মূল ভবনের ষষ্ঠতলায় এটি অবস্থিত। এখান থেকে পাঠ্যক্রম সম্মত বই সরবরাহ করা হয়ে থাকে শিক্ষার্থীদের। এছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি বিভাগের রয়েছে আলাদা আলাদা নিজস্ব পাঠাগার। তবে কেন্দ্রীয় পাঠাগার সম্পর্কে বলা যায়, বাংলাদেশের বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের মধ্যে এটি সর্ববৃহৎ পাঠাগার।

মাননীয় উপাচার্যের কাছে জানতে চেয়েছিলাম, কেন্দ্রীয় পাঠাগার নিয়ে ভবিষ্যতে তাঁর নতুন কোন পরিকল্পনা আছে কিনা। জবাবে তিনি জানালেন, স্থায়ী ক্যাম্পাস নির্মাণ হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় পাঠাগারটি সম্পূর্ণ আলাদা ভবনে স্থাপন করা হবে। উত্তরায় জমি থাকলে অনেক আগেই এটি আলাদা ভবনে স্থাপন করা হতো। তিনি আরো জানান, আশুলিয়ায় স্থায়ী ক্যাম্পাস নির্মাণের সময় সাথে সাথেই পাঠাগার ভবন নির্মাণ করা হবে।

বিজ্ঞান অনুষদের শিক্ষার্থীদের জন্য এখানে রয়েছে অত্যন্ত উন্নত এবং আধুনিক মানসম্পন্ন কম্পিউটার ল্যাব। মাথাপিছু একটি কম্পিউটার ব্যবহারের সুবিধা রয়েছে এই ল্যাবে। সকাল ৯টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত প্রত্যেক শিক্ষার্থীদের জন্য রয়েছে ই-মেইল, ইন্টারনেট ব্যবহারের সুবিধা। শীততাপ নিয়ন্ত্রিত প্রত্যেকটি ক্লাশরুম ছাড়াও এখানে শিক্ষাক্ষেত্রের সর্বত্র অত্যন্ত উন্নতমানের শিক্ষাপ্রযুক্তি ব্যবহৃত হয়। এসব ছাড়াও শিক্ষা সংক্রান্ত আরো অনেক সুযোগ-সুবিধা রয়েছে এখানে শিক্ষার্থীদের জন্য।

মাননীয় উপাচার্যের কাছে জানতে চেয়েছিলাম, বিশ্ববিদ্যালয়কে তিনি আর কতদূর পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে যেতে চান অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে তাঁর স্বপ্ন আর কতদূর? জবাবে তিনি জানান, তাঁর স্বপ্নের এই প্রতিষ্ঠানটিকে তিনি উন্নতির চরমশিখরে নিয়ে যেতে চান। শিক্ষাক্ষেত্রের সবগুলো দরোজা তিনি এখানে খুলে

দিতে চান। অর্থাৎ দেশের শিক্ষার্থীরা যেন তাদের পছন্দের যে কোন বিষয়ের উপর এখান থেকে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। তিনি চান এই প্রতিষ্ঠানটিকে বাংলাদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ "সেন্টার অব এ্যাক্সিল্যান্স" হিসেবে দেখতে। বলেন, সেই লক্ষ্যে আমাদের শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী সকলে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। আশা করি অবশ্যই আমরা সফল হবো। মহান আল্লাহ আমাদের সহায়তা করবেন।

বাংলা আমাদের মাতৃভাষা হলেও বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কাছে এটির কোন মূল্য নেই। এক্ষেত্রে এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশের ভূমিকা শুধু প্রশংসনীয়ই নয়, অত্যন্ত্য সাহসিকতাপূর্ণও। বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে এখানেই সর্বপ্রথম চালু করা হয় বাংলাভাষা ও সাহিত্যের উপর অনার্স ও মাস্টার্সসহ পূর্ণাঙ্গ কোর্স। আর্থিক দিক দিয়ে বিভাগটি অত্যন্ত অলাভজনক হওয়া সত্ত্বেও মাননীয় উপাচার্যের মাতৃভাষার প্রতি অতিরিক্ত শ্রদ্ধাবোধ থাকার কারণে ১৯৯৬ সালে বিশ্ববিদ্যালয় যাত্রার শুরুর সময়েই এটি চালু করা হয়। বর্তমানে বাংলা বিভাগের শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় এক হাজার। শুধুমাত্র সাপ্তাহিক ছুটির দিনে অর্থাৎ শুক্রবার ও শনিবার এই দু'দিন এই বিভাগটির ক্লাশ করার সুযোগ থাকায় এটি এখন বাংলাভাষা ও সাহিত্য অনুরাগীদের কাছে উচ্চশিক্ষার প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। এছাড়াও ব্রেক অব স্টাডি, চাকুরীজীবী এবং সংসারের ঝামেলায় পড়ে যারা উচ্চশিক্ষা লাভের ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তা অর্জন থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন তারাও এখান থেকে সে সুযোগটি গ্রহণ করছেন অত্যন্ত্য তৃপ্তি সহকারে। একাডেমিক কার্যক্রমের পাশাপাশি বাংলা বিভাগে নিয়মিতভাবে বিভিন্ন বিষয়ের উপর সেমিনার, কর্মশালা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পালন করা হয়ে থাকে। বাংলা বিভাগের শিক্ষার্থীদেরকে যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে প্রতি সেমিস্টারে ভাষার উপর দক্ষতা উৎকর্ষের জন্য বানান ও উচ্চারণের উপর কর্মশালাসহ পিকনিক, নবীন বরণ, বিদায় অনুষ্ঠান ইত্যাদির আয়োজন করা হয়ে থাকে। এখানেও রয়েছে বিভাগের নিজস্ব পাঠাগার। শিক্ষকবৃন্দের অধিকাংশই উচ্চতর ডিগ্রীপ্রাপ্ত।

সবশেষে বলা যায়, আমাদের এশিয়ান ইউনিভার্সিটি, আমাদের গৌরব, আমাদের অহংকার।

প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
প্রকাশকাল ঃ ফেব্রুয়ারি ২০০৮,
পৃষ্ঠা ৫৩১, মূল্য-২৮৪

হিদায়াতুল কুরআন–১ম খণ্ড*

ড. আবুল হাসান মুহাম্মদ সাদেক

“হিদায়াতুল কুরআন” বাংলা ভাষায় রচিত একটি উল্লেখযাগ্য তাফসীর গ্রন্থ। একাধিক খণ্ডে প্রকাশিতব্য গ্রন্থটির প্রকাশিত প্রথম খন্ডটির উপর বিশ্লেষণমূলক আলোচনা করা হলো। তাফসীরটি রচনা করেছেন এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ এর ভাইস চ্যান্সেলর ড. আবুল হাসান মুহাম্মদ সাদেক। লেখক শুধু ইসলামী গ্রন্থই রচনা করেননি; বরং অর্থনীতি বিষয়ক অনেক গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থও তিনি ইংরেজীতে লিখেছেন। দেশে ও বিদেশে বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি অধ্যাপনা করেছেন। তিনি মালয়েশিয়ার ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটির সাবেক ডীন ছিলেন। শিক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য তিনি কেমব্রীজের ইন্টারন্যাশনাল বায়োগ্রাফিক সেন্টার কর্তৃক “ওহঃবৎহধঃরড়হধষ সধহ ড়ভ ঃযব ুবধৎ ২০০০-২০০১চ সম্মাননায় ভূষিত হয়েছেন ২০০০/২০০১ সালে। কোরআনের অন্তরঙ্গ বঙ্গাঁনুবাদ এবং আয়াতের প্রেক্ষাপটসহ বাস্তব জীবনের আলোকে কোরআনের মর্মদর্শন ও শিক্ষাকে তিনি যেভাবে তাঁর এ তাফসিরে উপস্থাপন করেছেন, তাতে বিশ্ববাসী একটি তাৎপর্যপূর্ণ তাফসির পেলো।

“হিদায়াতুল কুরআন” তাফসিরের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো কুরআনের প্রতিটি আয়াতের মর্ম ও শিক্ষাকে বাস্তব জীবনের উপযোগী করে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা। এখানে প্রতিটি আয়াতের প্রথমে সহজ বঙ্গানুবাদ তারপর ‘টীকা’ শিরোনামে সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা ও তাফসীর এবং শেষে ‘মর্ম ও শিক্ষা’ মূল শিরোনামে আয়াতগুলোর উপর গভীর পর্যবেক্ষণমূলক সহজ বর্ণনা প্রদান করা হয়েছে। প্রফেসর ড. আবুল হাসান মুহাম্মদ সাদেক গভীর অধ্যয়ন ও অর্ন্তদৃষ্টির মাধ্যমে তাঁর এ তাফসিরটি প্রণয়ন

---

* গ্রন্থালোচনা করেছেন ড. রহমান হাবিব। লেখক, গবেষক, প্রাবন্ধিক। সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ,ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

করেছেন। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত এ তাফসিরটির প্রথম খন্ডে সূরা ফাতিহা ও সূরা বাকারার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ও অনুবাদ সন্নিবেশিত হয়েছে। প্রথম খন্ডকে ভিত্তি করেই আমি আমার ক্ষুদ্র আলোচনা প্রচেষ্টা এখানে সম্পন্ন করেছি।

“সূরা ফাতিহা” হলো পবিত্র কুরআন শরীফের উপক্রমনিকা। এ সূরাকে কোরআনের জননী বলা হয়। সমস্ত কোরআনের সারমর্ম ও মূলশিক্ষা ও উদ্দেশ্যের দর্শন এই সূরায় রয়েছে। এই সূরায় জগত ও সৃষ্টির মহান পরিকল্পক যে আল্লাহ তায়ালা তা বিশেষভাবে স্পষ্টায়িত করা হয়েছে। আল্লাহ প্রাণীজগত, উদ্ভিদজগৎ, পৃথিবী ও সৌরজগত সবকিছুর স্রষ্টা ও প্রতিপালক। তিনি পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু। তাঁর দয়ার উপর নির্ভর করেই সমস্ত সৃষ্টি বিরাজমান রয়েছে। পুনরুত্থানের পর বিচার দিবসের তিনি মালিক। আমরা শুধু আল্লাহরই ইবাদত করি এবং তাঁরই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি। যাদের প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট ও যারা হিদায়াত প্রাপ্ত, তাদের পথে আমাদেরকে পরিচালিত করার জন্য এই সূরায় আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি।

আল কোরআনেই (২:১৮৫) বলা হয়েছে যে, কোরআন হলো মানুষের জন্য হিদায়াত। হিদায়াত পাওয়ার কতিপয় শর্ত রয়েছে। হিদায়াত তো স্বতস্ফূর্ত কোন বিষয় নয়। হিদায়াতের জন্য আল্লাহ, ফেরেশতাগণ, নবী-রাসূলগণ, তকদীর, পরকাল, ও পুনরুত্থানের প্রতি গভীরতম বিশ্বাস থাকতে হবে। আল্লাহ নির্দেশিত সৎ পথে চলা এবং আল্লাহর নিষিদ্ধ পথ ও কর্ম থেকে বিরত থাকার নাম হলো তাকওয়া যা খোদাভীতি। আল্লাহর প্রতি ভয় ও ভালোবাসার নিদর্শন বান্দার থাকতে হবে। সৎ পথ লাভ বা হিদায়াত প্রাপ্ত হবার জন্য মন থেকে আল্লাহর কাছে চাইতে হবে। অনেক নাস্তিক লোক আছেন, যারা কোরআন হাদীস সম্পর্কে অধ্যয়ন করেছে; কিন্তু হিদায়াতের কোন মানসিক ইচ্ছা তাদের মনের মধ্যে কার্যকর থাকেনি বলে কোরআন ও হাদীস দ্বারা তাঁরা সৎপথ লাভ সমর্থ হয়নি।

হিদায়াত লাভের জন্য কোরআনের নিম্নোক্ত আয়াতটি মান্য করা অতীব জরুরী। আয়াতটি হলো: “যে ব্যক্তি রাসূলের (সাঃ) আনুগত্য করলো, সে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহরই আনুগত্য করলো” (কোরআন-৪:৮০)। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) হলেন সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ নবী। ইহুদী ও খ্রিষ্টানদের নবী ছিলেন যথাক্রমে মূসা (আঃ)। মুসলমানদের নবী হলেন হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)। বিশ্বনবী (সাঃ) এর উম্মত বা অনুসারীদের সংখ্যা পৃথিবীর মধ্যে অনেক বেশি। নবী (সাঃ) কে ভালবাসলে এবং রাসুল (সাঃ) কে অনুসরণ করলে আল্লাহরই আনুগত্য করা হয় বলে কোরআনে উল্লেখিত আছে। সেজন্য নবী (সাঃ)কে ভালবাসার এবং রাসুল (সাঃ) এর আনুগত্য করাই হলো মুসলমানদের হিদায়াত লাভের প্রধান শর্ত।

পৃথিবীর অনেক জাতির ইতিহাস কোরআন শরীফে উল্লেখিত আছে। আদ, সামুদ, বনী ইসরাঈল–বিভিন্ন জাতির মধ্যে অন্যতম। অনেক জাতি ছিল পথভ্রষ্ট এবং কিছু কিছু জাতি ছিল হিদায়াতপাপ্ত। সূরা ফাতিহায় পৃথিবীর ইতিহাস পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে আল্লাহ ঘোষণা করেছেন, যারা পথভ্রষ্ট তাদের পথে নয়, বরং যারা হিদায়াতপ্রাপ্ত তাদের পথে আমাদেরকে পরিচালিত করার জন্য।

সূরা বাকারায় অদৃশ্যে বিশ্বাস (আয়াত-৩) কে তাকওয়ার প্রথম শর্ত বলা হয়েছে। হিদায়াতের জন্য প্রয়োজন হলো তাকওয়া। হিদায়াত পাবার জন্য তাকওয়ার দ্বিতীয় শর্ত হলো নামায কায়েম করা। কোরআনে রয়েছে, "নিঃসন্দেহে নামায (মানুষকে) অশ্লীল ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে" (আল-কুরআন: ২৯:৪৫)। প্রকৃতির অবৈধ ও অন্যায় আধিপত্য থেকে রক্ষা পাবার জন্য নামায পড়তে হবে। যাদের নামায তাদেরকে প্রকৃতির পাপ থেকে রক্ষা করতে পারেনা তাদের নামায পরিপূর্ণভাবে আদায় হয় না ও আল্লাহর দরবারে পূর্ণ গ্রহণযোগ্য হয় না বলা যায়।

আল্লাহর পথে এবং দরিদ্রদের উদ্দেশ্যে অর্থ ও সম্পদ ব্যয় করা হিদায়াত লাভের জন্য তাকওয়ার তৃতীয় শর্ত। যারা আল্লাহর রাসূল (সাঃ)সহ ইসলামের মৌলিক আকিদায় বিশ্বাস করে, তাদের দ্বারা মানুষের অর্থনীতি স্বেচ্ছাচারীভাবে পরিচালিত হতে পারে না। ভোগ-বিলাস, অবৈধ নারী-সংসর্গ, মদ্যপান ও অশ্লীল কাজে তারা তাদের অর্থ ব্যয় করতে পারবেনা। মানবতার কল্যাণ ও দরিদ্র মানুষের সেবার জন্য অর্থ ব্যয় করা ঈমানদারদের জন্য অবশ্য কর্তব্য।

ইসলামী জীবন-দর্শনকে যারা অস্বীকার করে তারা হলো কাফির। যারা মুখে বলে, তারা ইসলামের অনুশাসন ও আল্লাহর রাসূল (সাঃ) কে বিশ্বাস করে, অথচ আসলে বিশ্বাস করে না তারা হলো মুনাফিক। কাফির ও মুনাফিকরা হিদায়াত পাবে না। সমাজবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ইতিহাস, নৃতত্ত্ব, পদার্থ, রসায়ন, দর্শন, অর্থনীতি–প্রভৃতি বিষয়ে কারো ব্যাপক জ্ঞান থাকলে তিনি যদি আল্লাহ, ফিরিস্তা, নবী-রাসূল, তকদীর, প্রেরিত আসমানী কিতাব, পরকাল ও মৃত্যুর পরে জীবিত হওয়া সম্পর্কে দৃঢ় বিশ্বাস রাখেন–তবেই তার জন্য হিদায়াত লাভ সম্ভব হবে এবং যদি তিনি মন থেকে সত্য পথ লাভের আকাঙ্খা পোষণ করেন, নইলে তার সমস্ত জ্ঞান সাধনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। প্রকৃত জ্ঞানী ব্যক্তিরা কিন্তু অনুধ্যানের (ওহঃঁরঃরড়হ) মাধ্যমে অদৃশ্য বিষয়াবলী যে সত্য তা অবশ্যই বিশ্বাস করতে সমর্থ হবেন।

মুনাফিকরা কাফেরদের চেয়েও মারাত্মক নেতিবাচক ভূমিকা সমাজে পালন করে। এই হিপোক্রেটদের কথা ও কর্মে কোন মিল নেই। অধিকন্তু তারা সমাজ, রাষ্ট্র ও সংসারে শুধু ফ্যাসাদ বা বিশৃঙ্খলাই সৃষ্টি করেনা; বরং তাদের প্রচারকে তারা সংস্কার হিসেবে প্রতিপন্ন করতে চায়, যাতে সমাজের মানুষরা তাদের দ্বারা আরও বিভ্রান্ত

হয়। ইসলাম সোজা, সরল হিদায়াতের পথ পছন্দ করে। আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আত্মসমর্পণ করতে বলে। প্রতারণা, ধোকাবাজি, মিথ্যা ও হালকাভাবকে অপছন্দ করে। অথচ মুনাফিকদের বিশ্বাস ও কর্ম উভয়ই হালকা শুধু নয় প্রবল প্রতারণাব্যঞ্জক। সেজন্য মুনাফিকদের স্থান জাহান্নামের সর্বনিম্নস্তরে।

যারা চেতনাহীন, অমনোযোগী ও অজ্ঞ এমন লোকদের সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে: "তাদের হৃদয় মন আছে, কিন্তু তা ব্যবহার করে তারা বুঝতে চায় না; তাদের চোখ আছে, কিন্তু তা ব্যবহার করে তারা দেখে না; তাদের কান আছে, কিন্তু তা দ্বারা তারা শুনে না। এরা হলো পশুর মতো, বরং তার চেয়েও নিকৃষ্ট। এরাই গাফেল বা চেতনাহীন"(কুরআন ৭:১৭৯)। আসলে সূরা ফাতিহায় যাদেরকে পথভ্রষ্ট বলা হয়েছে, এরাই সেই বিভ্রান্ত পথযাত্রী।

মানুষকে দুনিয়াতে আল্লাহ তাঁর খলিফা বা প্রতিনিধি (সূরা বাকারা, আয়াত:৩০) হিসেবে পাঠিয়েছেন। আল্লাহর অস্তিত্বে পরিপূর্ণভাবে বিশ্বাস করে নবী রাসূলদের পথকে অনুসরণ করে আল্লাহর নির্দেশিত সৎ, সুন্দর ও কল্যাণময় জীবন ব্যবস্থাকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করা হলো প্রতিনিধিদের কাজ। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)এর পর অন্য কোন নবী পৃথিবীতে আসবেন না। সেজন্য নবী (সাঃ)এর উম্মতগণ কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহর খলিফার দায়িত্ব পালন করে যাবেন। এই দায়িত্ব আসলে নবীদেরই দায়িত্ব। এজন্য নবী (সাঃ)এর উম্মতদের বলা হয়েছে সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত বা সম্প্রদায়। নবী করীম (সাঃ) জ্ঞানকে অর্জন করা ফরয ঘোষণা করেছেন। সমাজ-রাষ্ট্র-অর্থনীতি ও বিশ্বব্যবস্থাকে পরিচালিত করার জন্যে জ্ঞান প্রয়োজন বলেই নবী (সাঃ) ইসলামের জ্ঞানের প্রতি এত গুরুত্বারোপ করেছেন। তাহলেই খলিফার পূর্ণ দায়িত্ব পালন করা সম্ভব হবে। ইসলাম অর্থ শুধু ব্যক্তিগতভাবে নামায ও নফল এবাদত করাই নয়। সামাজিক কর্তব্যও পালন করতে হবে। রোযা ফরয এবাদত। রোযার মাধ্যমে ক্ষুধার্ত থাকার মাধ্যমে এটিকে বুঝতে হবে যে, ক্ষুধার্ত-দরিদ্র ও নিঃস্ব মানুষরা কত কষ্টে জীবন যাপন করে তা অনুধাবন করা। অবৈধ কামপ্রবৃত্তি থেকে মুক্ত হয়ে সার্বক্ষণিক স্রষ্টার ধ্যানে পবিত্র অবস্থান থাকাও রোযার শিক্ষা। যাকাতের শিক্ষা হলো বঞ্চিত ও অভাবী মানুষদের স্বাচ্ছন্দ্য ও অভাবমুক্ত জীবন যাপনের জন্য ধনী মুসলমানরা তাদের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ এবং সম্ভব হলে অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করে তাদের জীবনকে স্বচ্ছলতায় নিয়ে আসবে। সেজন্য, যাকাত হলো সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে জনদায়িত্ব পালন ও ইসলামের এবাদতের অন্তর্ভূক্ত।

অপরাধ মানুষের হয়ে যেতে পারে। কুরআনে মানুষকে পরিশুদ্ধ করার জন্য প্রণোদিত করা হয়েছে। অপরাধ অবশ্যই ক্ষমার মাধ্যমে নিরসন করতে হবে। এক আল্লাহতে বিশ্বাস এবং হযরত মুহাম্মদ (সঃ) আল্লাহর রাসূল, এই কালেমায় অবশ্যই বিশ্বাস করতে হবে। এক আল্লাহকে সৃষ্টিকর্তা হিসেবে না মেনে আল্লাহর

সাথে কাউকে শরিক করলে সে শিরককারী হবে। শিরক আল্লাহ মাফ করবেন না। তবে তওবা করে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তিত হলে আল্লাহ তা মাফ করবেন। অন্য কোন অপরাধ আল্লাহ ক্ষমা করবেন না। "ক্ষমা পেতে আরো সহায়ক হয় যদি কোন অপরাধ হয়ে গেলে বেশি বেশি পূণ্য করা হয়"(আল কুরআন-১১:১১৪)।

আল্লাহর সান্নিধ্য পেতে হলে ধৈর্য্য প্রয়োজন। নিষিদ্ধ জিনিস থেকে প্রকৃতিকে রক্ষার জন্য ধৈর্য্য দরকার। আল্লাহর আদেশ পরিপূর্ণভাবে পান করার জন্য শারীরিক, মানসিক ও আর্থিক ধৈর্য্যধারণ করেই আল্লাহ ও রাসূল (সঃ) এর প্রেমের পথে অগ্রসর হতে হয়।

স্মর্তব্য, বিনা রক্তপাতে মক্কাবিজয় মহানবী (সঃ)এর জীবনে এক অনন্য ঐতিহাসিক ঘটনা। মক্কা বিজয়ের পর নবী (সঃ) কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য আট রাকাআত নামায আদায় করেছেন এবং কাফির মুশরিকদের জন্য সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেছিলেন। এতে নবী (সঃ) বিজয়েও যে বিনয়ী ছিলেন, সেটিই স্পষ্ট হয়। প্রকৃত মুসলমান বিজয়েও বিনয়ী থাকেন। কুরআনে বলা হয়েছে, একটি মানুষকে কেউ অন্যায় ভাবে হত্যা করলে যেন সমস্ত মানুষ ও মানবতাকেই সে হত্যা করে ফেললো (কুরআন-৫:৩২)। হত্যার বিরুদ্ধে মানবতার পক্ষে কুরআনের এই বক্তব্য খুবই গভীরভাবে উপস্থাপিত। সেজন্য ইসলামে যে জঙ্গিপনা ও হত্যা চর্চা নেই তা স্পষ্ট করে বলা দরকার। "অপরাধী, অকৃতজ্ঞ ও অহংকারীদের আল্লাহ যেমন শাস্তি দেন, তেমনি তিনি নেক্কার, কৃতজ্ঞ ও বিনয়ীদের নিয়ামত বৃদ্ধি করেন" (আল-কুরআন-২:৫৮; ৭:১৬১; ১৪:৭)।

রাসূল (সঃ) এবং মুসলমানদের দায়িত্ব হলো মানুষদের সত্যপথে আসার জন্য আহব্বান করা। সত্যপথে নিয়ে আসা তাদের দায়িত্ব নয়। ধর্মে কোন জোর-জবরদস্তি নেই-এটি সূরা বাকারায় রয়েছে। যিনি যত বেশি আকাঙ্খা পোষণ করবেন স্রষ্টার প্রেমে নিমজ্জিত হবার, তিনি ততটুকুই হিদায়াত প্রাপ্ত হবেন। দুনিয়ার কাজে সফল হতে হলে পরিশ্রম, জ্ঞান ও কর্মপ্রয়াস চালাতে হবে। কোন অবিশ্বাসীও চেষ্টা করলে বৈষয়িক ও জৈবনিক কাজে সফল হতে পারে। তবে দুনিয়ার নেতৃত্ব পেতে হলে নেতৃত্বের গুণাবলী, ত্যাগ, উপকরণাদি সংক্রান্ত প্রচেষ্টা, ঐক্যবদ্ধ চেষ্টার প্রয়াস চালাতে হবে (আল-কুরআন-২:১৭৭; ২:১৪; ৮:৬০; ৩:১০৩)।

প্রকৃত খোদাপ্রেমিকরা এমন হবেন যে, "তাদের জীবন-মৃত্যু সব কিছুই আল্লাহর জন্য হয়ে যায়। যেন এমন হয়ে যায় যে, আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট এবং সেও আল্লাহকে পেয়ে সন্তুষ্ট" (আল-কুরআন ৬:১৬২; ৫:১১৯)। আল্লাহর প্রতি পূর্ণ সমর্পণশীল এবং নবী (সঃ)এর প্রতি পূর্ণ আনুগত্যশীল ব্যক্তির পক্ষেই আল্লাহর প্রেমে ও ধ্যানে পরিপূর্ণভাবে মগ্ন হওয়া সম্ভব।

কুরআনে বলা হয়েছে, “মুসলমানদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট, যদি তারা প্রকৃত মোমিন হয় এবং যথাযোগ্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে” (আল-কুরআন-৩:১০৩; ৮:৬০)। আল্লাহর প্রতি পূর্ণবিশ্বাস রেখে যিনি সৎ, পাপমুক্ত ও নৈতিক জীবন যাপন করেন, তার পক্ষে দুনিয়া ও আখেরাতে সাফল্য অবশ্যম্ভাবী। সাম্রাজ্যবাদী বা শাসকশ্রেণী বা কর্তাব্যক্তিদের রক্তচক্ষুকে ভয় করে অন্যায় করা যাবে না। সততা, সত্যনিষ্ঠা, নৈতিকতা রক্ষা করা এবং আল্লাহকে ভয় করে ধর্মবিরোধীদের প্রচেষ্টাকে যৌক্তিক ও মানবিকভাবে প্রতিহত করতে হবে (আল-কুরআন-বাকারা-১৫০)। কুরআনে বলা হয়েছে, যারা তাদের দীনকে বিভক্ত করেছে এবং দলে দলে ভাগ হয়ে গেছে, তাদের সাথে তোমার কোন সম্পর্ক নেই”(আল-কুরআন-৬:১৫৯)। সেজন্য এটি স্পষ্ট যে, ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় ঐক্য অবশ্যকাম্য। সত্য অনুসন্ধান করতে গিয়ে ইজতিহাদ বা গবেষণা করা খুব জরুরী। সেজন্য ইসলামে গভীর জ্ঞানচর্চার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। যাতে সুক্ষ্মভাবে কুরআন, হাদীস বুঝে ব্যক্তিক ও সামাজিক-রাজনৈতিক জীবনে ইসলামের বিধানকে মানবতামূলকভাবে ব্যবহার করা যায়।

কুরআনে বলা হয়েছে, হযরত মুহাম্মদ (সঃ)এর চরিত্র হলো সর্বসুন্দর ও সর্বোত্তম। নবী (সঃ) পৃথিবীতে প্রেরিত হয়েছেন উত্তম চরিত্রের পূর্ণতা দানের জন্য। সৎ, চরিত্রবান ব্যক্তিদের ইবাদত স্রষ্টার কাছে অধিক প্রিয়। কারণ, চরিত্রবান থাকাও তো একটি ইবাদত। মানুষ ব্যক্তিক ও নৈতিক চরিত্রের অধিকারী হলে সমাজ সংসার সুন্দর হয়ে উঠবে।

স্বামী ও স্ত্রীকে একে অপরের ভূষণ বলে কুরআন সাব্যস্ত করায় নারীর প্রতি পুরুষের ভালবাসা ও দায়িত্ববোধের প্রগারতার কথাই ব্যক্ত হয়েছে। পাশ্চাত্য সমাজ বৈবাহিক জীবনে আবদ্ধ হয়ে নৈতিকতাপূর্ণ জীবন যাপন করলে তাদের দাম্পত্য জীবন কল্যাণময় ও শান্তিময় হয়ে উঠবে।

সূরা বাকারার ২০৮ নম্বর আয়াতে ইসলামের মধ্যে পরিপূর্ণভাবে প্রবেশ করার কথা নির্দেশিত হয়েছে। সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি, বিচার ব্যবস্থা, রাষ্ট্রব্যবস্থা, পারিবারিক ব্যবস্থা ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও ইসলামের জ্ঞান ও বিধানগত ব্যবস্থায় পরিপূর্ণভাবে অনুপ্রবেশের কথাই এই আয়াতে ব্যক্ত হয়েছে।

কর্মব্যস্ততার কারণে আসরের নামায যাতে আমাদের বাদ পড়ে না যায় সেজন্যই এত গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। আল্লাহর প্রতি সতত ইবাদতশীল থাকার জন্য আমাদের প্রচেষ্টা থাকা দরকার। কুরআনে বলা হয়েছে, মানুষ ও জ্বীনকে শুধুই আল্লাহর ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। সেজন্য নামাযের মাধ্যমে ব্যক্তিগত ইবাদত, জিকিরের ও তাহাজ্জুদের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক ইবাদত, যাকাতের মাধ্যমে সামাজিক

ও মানবিক দায়িত্ব এবং রোযার মাধ্যমে কু-প্রবৃত্তি হতে মুক্ত হয়ে সার্বক্ষণিক স্রষ্টার প্রেমে আমাদের মগ্ন থাকতে হবে।

অপ্রিয় জিনিসকে আল্লাহর পথে ব্যয় করলে সে প্রকৃত মুমিন নয়। জনদারিদ্র দূর করার জন্য এবং মানবতার কল্যাণের জন্য ও আল্লাহর রাস্তায় প্রিয় জিনিস ব্যয় করতে হবে। নিম্নের আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহর প্রতি প্রকৃত প্রেম প্রকাশের পথ অভিব্যক্ত। আয়াতটি হলো-"তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত কল্যাণ লাভ করতে পারবে না যতক্ষণ না তোমাদের প্রিয় জিনিস আল্লাহর পথে ব্যয় করো" (কুরআন-৩:৯২)।

সহীহ বুখারী শরীফের হাদীসে হযরত মুহাম্মদ (সঃ) বলেছেন, আল্লাহ যার মঙ্গল চান তাকে তিনি ধর্মের গভীর জ্ঞান দান করেন। প্রকৃত জ্ঞানী হলেই আল্লাহর হক (হক্কুল্লাহ) ও বান্দার হক (হক্কুল এবাদ) আদায় করে মানুষ স্রষ্টাপ্রেম হাসিল করতে সমর্থ হবে।

স্মর্তব্য যে, যে ব্যক্তি আল্লাহর যত আনুগত্য থাকবে এবং যত বেশি রাসূল (সঃ)কে অনুসরণ করে পাপমুক্ত, সৎ ও ইবাদতময় জীবন যাপন করবে, সে ততটুকুই আল্লাহর কাছ থেকে ক্ষমা ও দয়ার আচরণ আশা করতে পারে। মনের চেতনায় যাতে পাপের বোধ ইচ্ছাকৃতভাবে কখনো কাজ না করে, সে ব্যাপারে সচেতন থাকতে হবে। অচেতনভাবে মনের মধ্যে পাপচিন্তা আসতে পারে–সে ব্যাপারেও সর্তক থাকতে হবে। তাহলেই পরিপূর্ণ পাপমুক্ত থেকে সৎ ও মানবিক জীবন যাপন করে ইসলামের চর্চার মধ্য দিয়ে ব্যক্তিক ও সামাজিক-রাষ্ট্রিক উভয় দিক থেকেই একজন মানুষ সফলতা পেতে পারবে। যে সাফল্য আসলে ইহকাল ও পরকাল উভয়ের জন্যই প্রয়োজ্য হবে।

সবশেষে বলা যায়, গবেষক ড. আবুল হাসান মোহাম্মদ সাদেক এই তাফসীর গ্রন্থটিতে সূরা ফাতিহা ও সূরা বাকারার অন্তর্নিহিত মর্মশিক্ষা অত্যন্ত সহজ ও সাবলীল ভাষায় পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন। যা ভিন্ন ভিন্ন শিরোনামে প্রকাশিত। সর্বোপরি মানুষের নৈতিকতাবোধ সম্পন্ন চরিত্র গঠনের জন্য এই তাফসীর গ্রন্থটি পাঠ অবশ্য অপরিহার্য। শুধু তাই নয়, এ পর্যন্ত প্রকাশিত তাফসির জগতে "হিদায়াতুল কুরআন" গ্রন্থটি পাঠক এবং গবেষক উভয়ের জন্য একটি অমূল্য সম্পদ।

সাহিত্য পত্রিকা

পরবর্তী সংখ্যার জন্য
লেখা আহ্বান

প্রবন্ধ, নিবন্ধ, ফিচার, গল্প, উপন্যাস, কবিতা, নাটক, রম্যরচনা, স্মৃতিকথা, গ্রন্থালোচনাসহ সাহিত্য সংশ্লিষ্ট যে কোন ধরনের লেখা আমন্ত্রিত। টাইপ করা দু'কপি লেখা কম্পিউটার কপিসহ (সিডি বা ই-মেইলে) পাঠাবার অনুরোধ রইলো। তা সম্ভব না হলে এমনিতে পাঠাতে পারেন।

- ⌘ প্রকাশিত লেখার জন্য সম্মানী প্রদান করা হয়।
- ⌘ লেখার সাথে ফোন নং সহ পূর্ণ ঠিকানা যুক্ত করতে হবে।
- ⌘ লেখা পাঠাবার শেষ তারিখ ১৫ ই মে, ২০০৯।
- ⌘ প্রতি সংখ্যায় গদ্য এবং পদ্য সাহিত্যে দু'জন শ্রেষ্ঠ লেখককে পুরস্কার প্রদান করা হবে।
- ⌘ পরবর্তী সংখ্যার প্রকাশকাল ঃ জুলাই-ডিসেম্বর ২০০৯।

লেখা পাঠাবার ঠিকানা ঃ
সম্পাদক
সাহিত্য পত্রিকা
এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ
বাড়ী ১৪, সড়ক ২৮, সেক্টর ৭,
উত্তরা মডেল টাউন, ঢাকা-১২৩০।
ঊ-সধরষ : ংযধযরঃঃড়ঢ়ধঃৎরশধ@ধঁন-নফ.ড়ৎম
ডবনংরঃব: িি.ধঁন-নফ.ড়ৎম/ংযধযরঃঃড়ঢ়ধঃৎরশধ./যঃসষ